রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

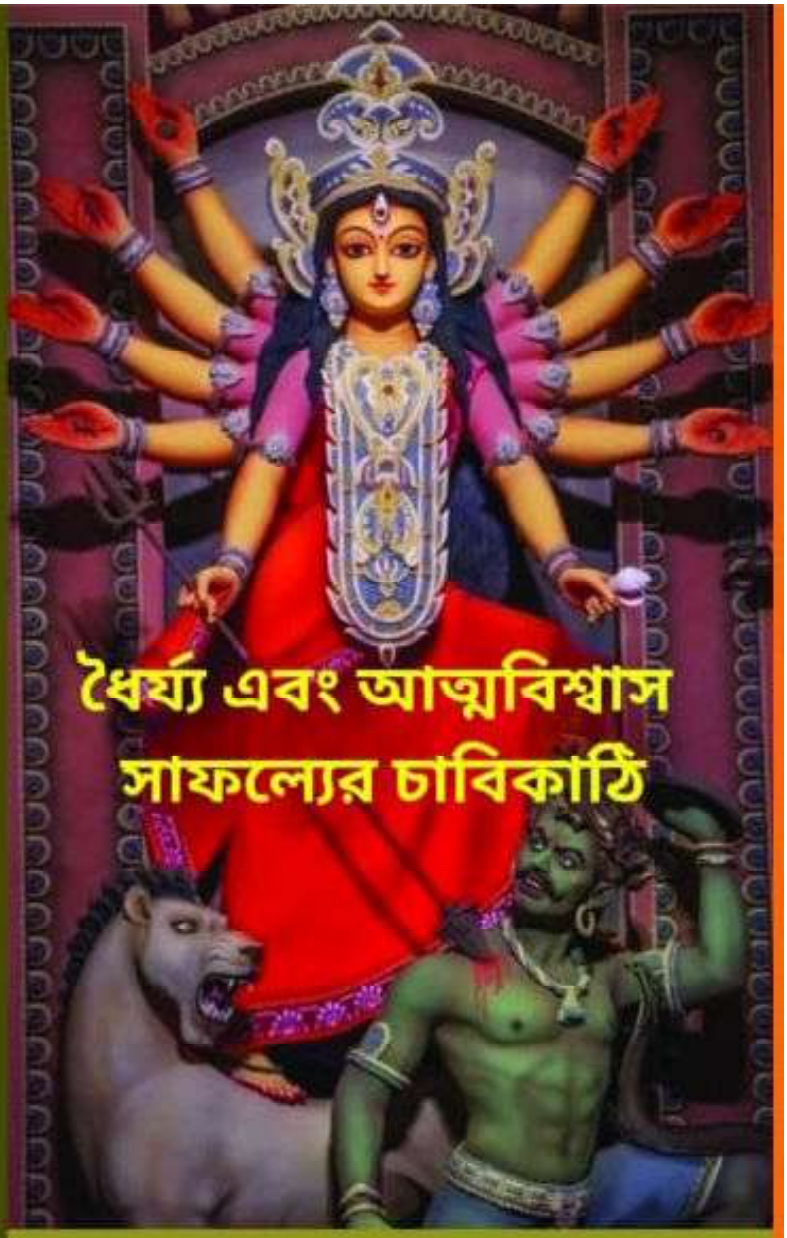

ধৈর্য্য এবং আত্মবিশ্বাস
সাফল্যের চাবিকাঠি

সম্পাদক

মানস কুমার ঠাকুর

চতুর্থ বর্ষ

শারদ সংখ্যা

২০২৪

NMDC
The Earth is our Workplace.
We Preserve and Protect it.
(Going Green since 1958)
More than 6 decades of Responsible Mining and Sustainability
> One of the best performing Public Sector Enterprises of India
> The single largest producer of iron ore in the country
> Sole producer of Diamonds in India
> All Projects are accredited with IMS Standards comprising of ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018, and SA 8000 2014
> Internal Safety Audits conducted routinely for ensuring Safety in Mines and Plants
> Bringing socio-economic transformation through innovative and impactful CSR initiatives in the less developed regions of the country
NMDC re-dedicates itself with a fresh zeal and renewed enthusiasm, energy and strategy to achieve greater heights in delivering value for all its stakeholders.
NMDC Limited
Responsible Mining

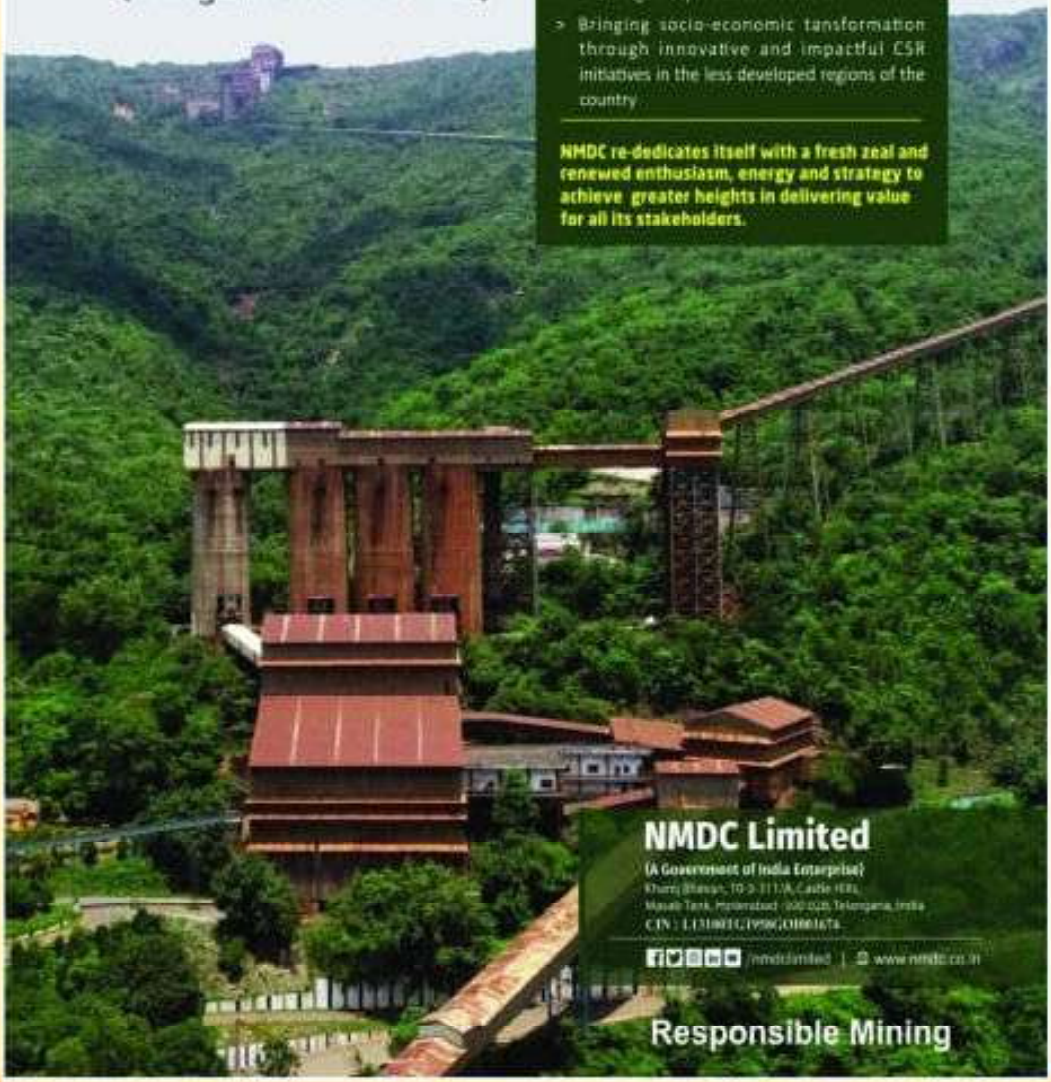

চতুর্থ বর্ষ শারদ সংখ্যা ২০২৪

রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

প্রধান সম্পাদক
মানস কুমার ঠাকুর

নির্বাহী সম্পাদক
সৈকত হালদার

সহ-সম্পাদক
ঈপ্সিতা সেন

সহযোগী
মধুমিতা দাস

অক্ষরবিন্যাস
দেবাশিস নায়েক

প্রচ্ছদের ছবি
মধুমিতা

পরিচালনা
মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন
www.manasiresearch.org

মুদ্রক
প্রিন্ট এ ডিজাইন
৪৩, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯

দাম - ১৫০ টাকা

সূচিপত্র

ধর্মকথা—	৫-৭
রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব—	৮
সচেতনতা—	৯-১১
বিশেষ রচন—	১২
নিবন্ধ—	১৪-১৭
বিশেষ আকর্ষণ—	১৮-২৫
শতবর্ষে স্মরণে—	২৬-৩৮
বিজয়িনী—	৩৯-৪১
স্বাস্থ্যকথা—	৪২-৪৪
স্বাধীনতার ইতিবৃত্তান্ত—	৪৫-৪৮
বিশেষ আকর্ষণ—	৪৯-৫২
খানাপিনা—	৫৩-৫৪
কবিতা—	৫৫-৬২
মতামত—	৬৩
গল্প—	৬৪-৭৪
মনের কথা—	৭৫
সমাজসেবা—	৭৬-৭৭
উদ্যোগ—	৭৮-৭৯
অভিমত—	৮০
মুক্তিচিন্তা—	৮১
পরামর্শ—	৮২
মনেমনে—	৮৩-৮৬
মুখোমুখি—	৮৭-৮৯
সঙ্গীত—	৯০-৯১
নাচের জগৎ—	৯২-৯৪
সিনেমা—	৯৫-১০০
মঞ্চ—	১০১-১০২
খেলা—	১০৩-১০৪

সম্পাদকীয় —

উমার আগমনে এই ঘোর অন্ধকার কাটবে

বছর ঘুরে ফের উমা আসছেন বাপের বাড়ি। পুরো একটা বছরের প্রতীক্ষা। গত বছর দশমীর দিন ভারাক্রান্ত মনে মাকে বিদায় জানিয়ে বলা হয়েছিল 'আবার এসো মা'। সেই থেকে প্রহর গোনা শুরু। অবশেষে অপেক্ষার অবসান। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই বছর সব কেমন যেন বদলে গেছে। দেবী দুর্গার পুজোর সমস্ত উপাচার, আয়োজন সাড়া, প্রস্তুতিও প্রায় শেষ। কিন্তু চারিদিকে এক আশ্চর্য রকমের শূন্যতা, হাহাকার, বিষাদময় পরিবেশ। অন্যান্যবার উমার আগমনে ঝলমলিয়ে ওঠা শহরটা এবার যেন ধূসর চাদর মুড়ে রয়েছে। মহালয়ার ভোরে 'আলোর বেণু' বেজে উঠলেও সেই সুরও কেমন যেন কাটা ছিল। এক মেয়ে যখন বছর ঘুরে বাপের বাড়িতে পা রাখতে চলেছে, তখন আরেক মেয়ে বাবা-মায়ের কোল খালি করে পাড়ি দিয়েছে কোন এক অচিন দেশে। তাঁর রক্তাক্ত শরীর, ক্ষতবিক্ষত মন এই শহরের মানুষের মনকে অস্থির করে তুলেছে। তাই মন ভালো নেই শহরের, মন ভালো নেই উমার বাপেরবাড়ির লোকদের। তবুও সপরিবারে মেয়ে আসছে বলে কথা। তাই তাঁর আগমন উপলক্ষে শুধুই পুজোর আয়োজন চলছে।

বলা হয় বই হল মন ভালো রাখার ওষুধ। আর সেটা যদি হয় পুজো সংখ্যা তাহলে তো কথাই নেই। এবছর অনেক কিছু ব্যতিক্রমী হলেও রূপকথা কিন্তু এবারও তার পুজো সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এই চতুর্থ বর্ষে রূপকথা পুজো সংখ্যা মন ভালো করার কিছু উপাদান সাজিয়েছে। এবারে থাকছে ধর্মকথা, বিশেষ রচনা, শতবর্ষে বিশিষ্টদের স্মরণ, মনের কথা, কলকাতার কচুরি, অনলাইন গেম, অনেক গল্প, কবিতা আরো নানা বিষয়। পাঠকদের মন ভালো করতে পারলেই আমাদের প্রয়াস সফল।

রূপকথা পরিবারের সকল সদস্যের তরফ থেকে পাঠকদের জানাই শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা। পুজো ভালো কাটুক বলার চেয়েও এবছর সবাই বলতে চাই মেয়েটা বিচার পাক। আমরাও আশা রাখি উমার আগমনে এই ঘোর অন্ধকার কাটবে। আসবে নতুন আশার আলো।

শারদীয়ার প্রীতি-শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন

ধর্মকথা—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদচিহ্ন

কলকাতা শহরের বিভিন্ন বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব গিয়েছিলেন। তারপর কেটে গিয়েছে যুগের পর যুগ। সেইসব বাড়ি ঘিরে এখনো রয়েছে ঠাকুরের নানান স্মৃতি। এক অদ্ভুত মোহময়তা। কলকাতায় তেমনই কিছু বাড়ির কথা জানাচ্ছেন--- **মৌমিতা মিত্র**।

কলুটোলার ধর বাড়ি

সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনকে একপাশে রেখে ডান দিকে কিছুটা গেলে চোখে পড়বে দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট মিশেছে ফিয়ার্স লেনে। এই রাস্তার ওপর তিনতলা বিশিষ্ট ধর বাড়ি। মূল বাড়ি এখন দু'ভাগে বিভক্ত। পেছনের অংশের ঠাকুরদালানে বসত সভা। এই বাড়ির দোরগোড়ায় ফলকের ওপর লেখা ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের পদধুলিধন্য স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র ধরের বাড়ি। আনুমানিক সালের চৈতন্য সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন রামকৃষ্ণ। পরে এটা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা নামে পরিচিত হয়। জানা যায় ঠাকুরের সঙ্গে যান তাঁর ভাগ্নে হৃদয়। সেদিন সভায় পণ্ডিত শ্রীবৈষ্ণবচরণজী শ্রীচৈতন্য আসনে বসে একমনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করছেন। শ্রোতারা একমনে শুনছেন। ঠাকুর এলেন। চুপচাপ এসে ভিড়ে জায়গা করে নিয়ে পাঠ শুনতে লাগলেন। আর শুনতে শুনতে তিনি আত্মহারা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে গিয়ে আসনের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। সমাধিস্থ ঠাকুরের মধ্যে প্রাণের কোনো সঞ্চার নেই, শুধু মুখে অপূর্ব হাসি। মহাপ্রভুর মতো দু'হাত তুলে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। সবাই অভিভূত। কিছুক্ষণ পর হরিধ্বনি ঠাকুরের চেতনা ফেরালো। ঠাকুর নাচতে শুরু করলেন, সমাধি হচ্ছেন। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটার পর ঠাকুর ফিরে গেলেন দক্ষিণেশ্বর। এই বাড়ির ঠিকানা : ৩২/এ ফিয়ার্স লেন, কলকাতা-৭৩

রানি রাসমণির বাড়ি

রাসমণি ছিলেন অষ্টসখীর একজন। তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। জানবাজারে এসেছিলেন কুলবধূ হয়ে। তারপর ধীরে ধীরে এই বাড়িই হয়ে ওঠে তাঁর কাছারি ও ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুর মাঝে মাঝে দরকারে ও অদরকারে এখানে আসতেন। রানি মায়ের জামাই ছিলেন মথুরামোহন বিশ্বাস। তাঁর আন্তরিক আগ্রহে ঠাকুর এখানে আসতেন, থাকতেন। এই বিষয়ে ঠাকুরের নিজের কথা রয়েছে কথামৃতের চতুর্থ ভাগের দশম খণ্ডে। লেখা আছে, 'সেজবাবু আর সেজগিন্নি যে ঘরে শুতো, সেই ঘরে আমিও শুতাম। তারা ঠিক ছেলেটির মতন যত্ন করত। তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। সেজবাবু বলত, বাবা, তুমি আমাদের কোনো কথাবার্তা শুনতে পাও, আমি বলতাম, পাই'। এই বাড়ির ঠিকানা : ১৩ রানি রাসমণি রোড, কলকাতা-৮৭

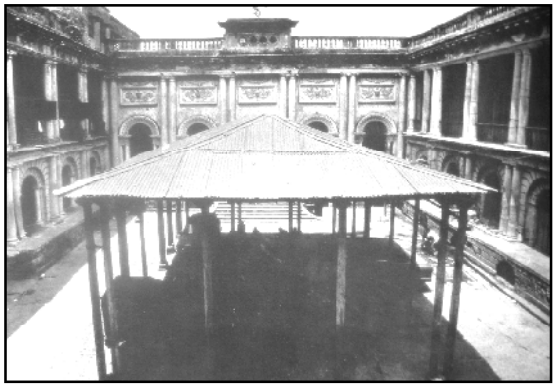

শোভাবাজার রাজবাড়ি

জয়পুরিয়া কলেজ একদিকে রেখে কিছুটা এগিয়ে গেলে বাম হাতে প্রাসাদের সিংহদুয়ার। অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকলে দেখা যায় এই বাড়ির ঠাকুরদালান।

এখানে এসেছিলেন পরমহংস দেব। সাল, তারিখ জানা যায় না। যতদূর জানা যায় রাজবাড়ির কুল দেবতা রাধা গোবিন্দজীকে প্রণাম করতে এখানে ঠাকুর আসেন। ঠিকানা : শোভাবাজার রাজবাড়ি, ৩৩/ এইচ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা ৫।

অধরলাল সেনের বাড়ি

ঠাকুরের পরম শিষ্য ছিলেন অধরলাল। ধনী পরিবারের কৃতী সন্তান। শেষ জীবনে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। ঠাকুর তাঁকে জিভ অষ্টনাম দিয়েছিলেন। তারপর থেকে পরমহংস ছাড়া কেউ তাঁর মনে জায়গা পায়নি। তাঁর বাড়িতে ঠাকুর মোট নয় বার আসেন। ওপরের দোতলায় সময় কাটাতেন। এই বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে অনেকবার এসেছেন গিরিশ ঘোষ, লাল্টু মহারাজ। ঠিকানা : অধরালয়, ৯৭ বেনিয়াতোলাস্ট্রিট, কলকাতা-৫

কাশীপুর উদ্যানবাটি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভিড় সহ্য হচ্ছিল না। শ্যামপুকুর বাড়িতে দিনরাত কেউ না কেউ আসছেন। তাই তাঁকে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে নিয়ে আসা হয়। এখানে খোলামেলা জায়গা। জীবনের শেষ ক'দিন ঠাকুর এখানেই ছিলেন।

ওই সময় রানি কাত্যায়নীর জামাই গোপালচন্দ্র ঘোষ এই বাড়ির স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ৮০ টাকা দিয়ে প্রথমে ৬ মাস ও পরে ৩ মাসের জন্য বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়। ব্যয়ভারের দায়িত্ব নেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। এখানে ঠাকুর ১৮৮৫ সালের ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৮৮৬ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত টানা ৮ মাস ছিলেন। এখানেই ঠাকুর তাঁর একাদশ অশ্বারোহী ত্যাগীভক্তকে গেরুয়া দান করেন। নরেনকে দেন লোকশিক্ষার ভার। এখানেই ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি ভক্তদের 'কল্পতরু' রূপে দেখা দেন। এই বাড়িতে ১৮৮৬ সালের ১৫ আগস্ট রাত ১২টা ২ মিনিটে ঠাকুরের মহাসমাধি হয়। পুরোনো বাড়ি আর নেই। সেখানে নতুন নকশায় তৈরি হয়েছে নতুন ভিটে। প্রতি বছর ১ জানুয়ারি এখানে কল্পতরু উৎসব হয়। লাখ লাখ ভক্তের সমাগম হয়। ঠিকানা : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ৯০, কাশীপুর রোড, কলকাতা -২

কাশীশ্বর মিত্রর বাড়ি

কাশীশ্বর মিত্রর বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের বিংশ সাংবৎসরিক উৎসব হত। একবার আমন্ত্রিত হয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। কবির বয়স তখন বাইশ কী তেইশ বছর। জীবনে ওই একটিবার ২জনের দেখা হয়। নীচের বড়ো ঘরে আলোচনা সভা বসে। ঠাকুরকে পিয়ানো বাজিয়ে ২টি গান শোনান কবি। যার একটি ছিল, 'আমার মাথা নত করে দাও গো তোমার চরণধূলার পরে'। গান শুনে ঠাকুরের ভাব

আসে। শেষে সবার সঙ্গে ডাল, লুচি ও মিষ্টি খেয়ে ঠাকুর ফিরে যান। দ্য স্টেটসম্যান কাগজে সেদিনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। এখানে ঠাকুরের জন্মতিথি ছাড়াও প্রতি শুক্রবার ও মাসের দ্বিতীয় রবিবার অনুষ্ঠান হয়। দরজা খোলা সকলের জন্য। **ঠিকানা : ২৩৪ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা -৪**

হর কুটির

পাথুরিয়াঘাটায় যদুলাল মল্লিকের বাড়িটাকে একদিকে রেখে কিছুটা এগিয়ে গেলে রাস্তার ওপর থামওয়ালা খোলাৎ ঘোষের মহল। এখানেও ঠাকুর এসেছিলেন। কিন্তু এই বাড়ি নয়, আর একটু এগিয়ে গেলে ডান দিকে অন্ধকার এক গলি। ঢুকে পড়লে ভেতরে বড়ো বাড়ির একদিকে ঠাকুর দালান। এটা সাধক হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসতবাড়ি। অবহেলিত এই

বসতবাড়ির ধুলোতেও রয়েছে ঠাকুরের পদস্পর্শ। হয়তো প্রচারের আলো থেকে দূরে বলে সেভাবে এখানে কেউ আসেন না। **ঠিকানা : ৫৩, পাথুরিয়াঘাটা, কলকাতা -৬**

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব —

রাজনীতিতে অতুল্য ঘোষ ছিলেন সৌজন্যের প্রতীক

গৌতম তালুকদার, সম্পাদক, বিধান শিশু উদ্যান

বিধান শিশু উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা অতুল্য ঘোষ ছিলেন আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় 'দাদু'। তিনি ছিলেন এক মহান ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। খুব অল্প বয়সে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফলে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেননি। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য সহ অনেক বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজনবিদিত। শিশু উদ্যানের ব্যবস্থা করেছিলেন নিয়মিত পড়াশোনার। নিজে পড়াতেন ইংরেজি আর পলিটিক্যাল সায়েন্স। এমএ ক্লাস পর্যন্ত। চল্লিশ পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের সর্বভারতীয় স্তরে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এই মানুষটি ক্ষমতার উচ্চ আসন থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে শিশুদের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন। তাই অতুল্য ঘোষ অমর হয়ে থাকবেন বিধান শিশু উদ্যানের মাধ্যমে। দেশের জন্য তাঁর ত্যাগ থেকে শুরু করে অতি সাধারণ জীবনজাপন যা আজ সকলের কাছে উদাহরণ হতে পারে। তিনি জীবদ্দশাতে তো বটেই, মৃত্যুর পরও রাজনৈতিক বিরোধীদের সমীহ আদায় করে নিয়েছেন এবং নিয়ে চলেছেন। এখনো রাজনৈতিক সৌজন্যের কথা উঠলে কেউ অতুল্য ঘোষের নামটি এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। এর চাইতে বড় কিছু পাওয়া আর হতে পারে না। অতুল্য ঘোষ-আমাদের দাদু'র সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে যতই চেষ্টা করি আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে কখনও সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারব না। তিনি ছিলেন সৌজন্যের প্রতীক। রাজনীতিতে বিরোধীরা বিরোধিতার নামে অতি কদর্য ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করেছেন। তিনি কিন্তু কখনো কোনো প্রত্যাঘাত করেননি। মনে মনে কষ্ট পেতেন। তিনি বলতেন, 'একজন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে না পারা ব্যক্তিকে যখন ল্যাংড়া, নুলো বলে ব্যঙ্গ করা হয় বা একজন দৃষ্টিহীন মানুষকে যখন কানা বলে ব্যঙ্গ করা হয় তখন সেই মানুষটির হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হয় অনেক চোখওয়ালা মানুষও তা দেখতে পান না।' বিধান শিশু উদ্যানে অতুল্য ঘোষের জন্মদিন ২৮ আগষ্ট দিনটিকে আমরা 'সৌজন্য দিবস' হিসেবে পালন করি। সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আসুন সবাই মিলে আমরা এই দাবিকে সমর্থন করি। আজ চতুর্দিকে রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে কদর্য ভাষার ব্যবহার এবং রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা বন্ধ হোক। ২৮ আগস্টকে 'সৌজন্য দিবস' হিসেবে পালন করে আমরা মনে করতে চাই অতুল্য

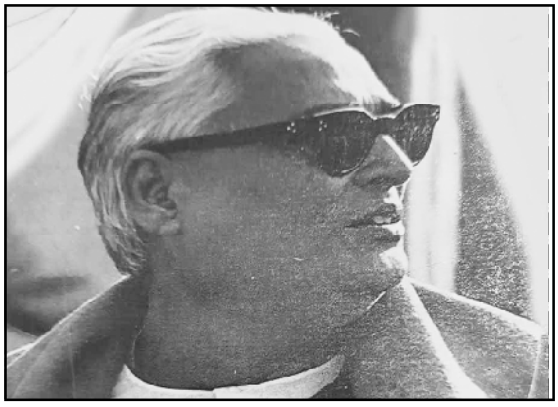

ঘোষ নামে একজন মানুষ এই বাংলায় জন্মেছিলেন, যিনি পনেরো বছর লোকসভার সদস্য ছিলেন, পাঁচ বছর সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু কখনো ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। অত্যন্ত সরল সাদামাটা জীবনযাপন করেছিলেন। বছরে দুটি ফতুয়া আর দুটি ধুতি ছাড়া তাঁর অতিরিক্ত পোশাকের প্রয়োজন পড়েনি। অতুল্য ঘোষকে নিয়ে দু-চারটি কথা লিখব ভাবছি গত কয়েকদিন ধরেই। কিন্তু শুরুটা আর করে উঠতে পারছি না। যাইহোক একটু আধটু লেখার চেষ্টা করলাম। যে বৃহৎ ক্যানভাসে অতুল্য ঘোষেকে চিত্রিত করে মানুষটিকে কিছুটা তুলে ধরা যেত সে ক্ষমতা আমার নেই। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। অতুল্য ঘোষ চলে যাওয়ার পর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শ্রীমতী সারদা মুখার্জি (অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল) যা বলেছিলেন তার একটি ছোট্ট অংশ তুলে ধরলাম, 'In more ways than one, Atulya Ghosh personified the indomitable and fearless spirit of the early Congress crusaders whose long and relentless struggle against the British Raj brought freedom to India. The loss of his eye and the spinal injury he suffered during the non-cooperation Movement became permanent physical handicaps. Yet, neither these nor the long years imprisonment could affect his zest for life or his pace of work.

সচেতনতা—

কাজের ক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য হ্যাম রেডিও

অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস, সম্পাদক, ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব

আচ্ছা আপনি কি জানেন? শুধু আর জি কর হাসপাতাল নয় এই রাজ্যের সিংহভাগ হাসপাতালেই সব জায়গায় ফোনের টাওয়ার নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। ধরুন কোনও মহিলা ডাক্তার, নার্স বা অন্য কোনও মহিলা কর্মী হাসপাতালের কোনো ঘরে রাতে বিপদে পড়লে তাঁকে তো ওই হাসপাতালের নিরাপত্তায় থাকা নিরাপত্তারক্ষীর কাছে খবর দিতে হবে। ফোন তো তখন ট... ট...ট.... করেই চলেছে অথবা বলছে আপনার করা ফোনটি আউট অফ রিচ। মানে ফোনের টাওয়ার নেটওয়ার্ক পাচ্ছে না। হয় যিনি ফোন করছেন তিনি, অথবা যাঁকে করছেন তিনি মোবাইল শ্যাডো জোনে আছেন। তবে? কীভাবে বার্তা পাঠানো যাবে ? আর দুষ্কৃতীরা যখন আক্রমণ করবে আক্রান্ত ওই মহিলাকে ফোনে যোগাযোগের সময় দেবে কি? তবে তো তিলোত্তমা ওর বাড়িতে খবরটি জানাতে পারত। আমরা হ্যাম রেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও স্বাস্থ্য দফতরের কাছে একটি লিখিত প্রস্তাব অনুমোদন করার জন্য আবেদন করেছি। আমরা হ্যাম রেডিওতে যে ধরনের হ্যান্ড সেট ব্যবহার করি, যা মোবাইল ফোনের থেকেও ছোটো তাতে সাইডে একটি পানিক বাটন আছে, যা আপনার পকেটের মধ্যেই রাখা অবস্থায় একবার চাপ দিলেই আপনার বিপদে পড়ার জরুরি সঙ্কেত দ্রুত ২ কিলোমিটার রেডিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যদি ওই রেডিও থেকে জরুরি সংকেত কেউ পাঠায় মানে স্থানীয় থানা পর্যন্ত ওই জরুরি সংকেত পাওয়া যাবে। যাঁরা এসএসকেএম, মেডিক্যাল কলেজ বা আর জি কর হাসপাতালে কাজ করেন তাঁদের ওই টাওয়ারের সমস্যা যে নেই কেউই এটা বলবেন না। আমরা নিজেরাও ভুক্তভোগী। এটা শুধু হাসপাতালের সমস্যার ব্যাপার নয়। দেশে জাতীয় নির্বাচনে, বিধানসভা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আমরাই ওই মোবাইল ফোনের শ্যাডো জোনের সমাধানে যোগাযোগের ত্রাতা হয়ে এক ইতিহাস রচনা

করেছিলাম। এই ধারণা থেকেই অভিজ্ঞতা নিয়ে বলছি, হাসপাতালের মহিলা ডাক্তার, নার্স, সুপার বা নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে যদি আমাদের হ্যাম রেডিওর মতো একটা ছোট ডিভাইস থাকে তবে তাতে থাকা একটা সুইচ একবার টিপে দিলেই কেল্লা ফতে। নিমেষেই ওই জরুরি আলার্ম হাসপাতালের প্রতিটি কোণে পৌঁছে যাবে। মোবাইল শ্যাডো জোনের কোনো রকমের ব্যাঘাত ঘটবে না। যদি ডাক্তার, নার্সদের হ্যাম রেডিও'র লাইসেন্স না থাকে তবে? তার ব্যবস্থাও আছে। উপায় হল, ভারত সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রক থেকে বাণিজ্যিক লাইসেন্স নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ? আমরাই দিতে প্রস্তুত। মক ড্রিল করা যেতে পারে। হ্যাম রেডিওই আপনার বিপদে ত্রাতা হতে পারে। রেডিওটি পাওয়া যাবে ভারত সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রকের ডি পি এল লাইসেন্স হোল্ডারের কাছে। কোনো নিয়ন্ত্রকের মানে কন্ট্রোল রুমের দরকার নেই। সবাই নিজে থেকেই নিজের বার্তা বা জরুরি সঙ্কেত আদান প্রদানে সক্ষম হবে। শুধুমাত্র চাই সরকারের সবুজ সংকেত, ব্যাস। ইতিমধ্যেই আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। কিছু ডাক্তার, সুপার এই নয়া ধারণাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এখন শুধুই রাজ্য সরকারের সবুজ সংকেত প্রয়োজন। তবে সঠিক শিক্ষা ও আইন মেনে রেডিও ব্যবহার করা উচিত। রাজারহাট বা সেক্টর ফাইভে কর্মরত মহিলাদেরও নজরে আসবে। আমরা আশাবাদী এই বিষয়টা নারী সমাজের কাছে খুবই সময় উপযোগী ব্যবস্থা হবে।

শুধু শ্লীলতাহানি নয়, মহিলাকে যৌনতার ইঙ্গিতেও হতে পারে হাজতবাস

লিখছেন অভিজ্ঞ পুলিশ রিপোর্টার উজ্জ্বল দত্ত

আর জি কর মেডিক্যাল হাসপাতালে তরুণী ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় উত্তাল হয়েছে সারা দেশ। নাড়িয়ে দিয়েছ বিশ্বের মানুষকেও। বুকে আগুন নিয়ে যে মহিলারা প্রতিবাদে পথে নামছেন তা কি শুধুই ওই নির্যাতিতার জন্য? নাকি এসবই সহ্যের সীমা পার করে যাওয়ার আর্ত চিৎকার?

এই কাহিনি শুধুমাত্র কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালের অভিশপ্ত সেমিনার রুমের নয়। কামদুনি, কালিয়াচক, হাঁসখালি, কোথাও বা পাট খেত, ট্রেন, বাস, অফিস বা নিজের বাড়িতেও মেয়েরা প্রতিনয়ত নিজের আব্রু খোয়াচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে তা সংবাদের শিরোনামে আসে কিছু কাহিনি না শোনাই থেকে যায়। শুধু ধর্ষণ বা গণধর্ষণ নয়, ভিড় বাসে একটা অস্বস্তিকর স্পর্শ বা 'টাচ', পরিচিত লোকের আচমকা বদলে যাওয়া 'দৃষ্টিভঙ্গি' সব কিছুকেই মানিয়ে নিতে নিতে আজ দেওয়ালে যেন তাদের পিঠ ঠেকে গেছে। বিচারের আশাও করে না অনেকেই। অনেকে আবার জানেই না যে ঠিক কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ জানানো যায়, কীভাবে অভিযোগ জানাতে হয়! আর সেই না জানাতেই ঢাকা পড়ে যায় প্রতিদিনের এমন অনেক ঘটনা। অনেকেই জানেন না, ভারতীয় সংবিধান ও আইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে রয়েছে নারী সুরক্ষা। নারীর শরীরে এতটুকু স্পর্শও যদি অস্বস্তি দেয়, সেই ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ জানানো যেতে পারে। এমনকী মহিলাদের যৌনতার প্রস্তাব দেওয়াও অপরাধ।

পথেঘাটে প্রায় সময়ই মহিলাদের নানা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, এমনকী প্রতিবেশীর ব্যবহারও অচেনা ঠেকে। মহিলারা বুঝে উঠতে পারেন না, কোনটা অপরাধ, কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ জানানো সম্ভব। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিধি অনুযায়ী, কোনো মহিলাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনতার প্রস্তাব দেওয়া অথবা তাঁর সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করাও অপরাধ।

নীচের যে কোনো একটি ঘটনা ঘটলে যৌন হেনস্থার অভিযোগ জানানো যায়---

১. অবাঞ্ছিতভাবে কোনো মহিলার শরীর স্পর্শ করা অথবা

শারীরিক সম্পর্কের প্রস্তাব দেওয়া।

২. কোনো জিনিস দেওয়া বা কোনও কাজ করে দেওয়ার বিনিময়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার প্রস্তাব।

৩. কোনও মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে পর্নোগ্রাফি দেখানো।

৪. মহিলার সম্পর্কে কোনও অশ্লীল (যৌনতা সম্পর্কিত) মন্তব্য করা।

এই সবকটি ক্ষেত্রে দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের ৩ বছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানা হতে পারে। শুধু এগুলোই নয়, কোনো মহিলাকে পোশাক খুলতে বাধ্য করা, ব্যক্তিগত মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করা বা গোপনে নজর রাখাও অপরাধ। এই বিষয়ে কোনো মহিলা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ সেই অভিযোগ নিতে বাধ্য।

ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি বা মহিলাদের ওপর অত্যাচারের যে কোনো ঘটনায় অভিযোগ নিতেই হবে পুলিশকে। কোনও অবস্থাতেই অভিযোগকারিনীকে ফেরানো যায় না।

সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী, একজন মহিলার সঙ্গে যেখানেই অত্যাচারের ঘটনা (ধর্ষণ, যৌন হেনস্থা, শ্লীলতাহানি) ঘটুক না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী থানায় বা যে কোনো থানায় অভিযোগ জানাতে পারেন। পুলিশ কোনো নির্যাতিতাকে ফেরালে আগে ওই পুলিশ কর্মীর চাকরি টার্মিনেট বা সাসপেন্ড করার নিদান লেখা আছে সংবিধানে। ঘটনা এক জায়গায়

ঘটেছে, আর অভিযোগ আর এক জায়গায়! এই অজুহাতও দেখাতে পারবে না পুলিশ। স্পষ্ট নির্দেশ আছে সুপ্রিম কোর্টের। থানার যে একটা 'জুরিসডিকশন হয় অর্থাৎ একটি থানার আওতায় একটা নির্দিষ্ট এলাকা থাকে, সেটা সবার জানার কথা নয়। তাই অভিযোগ জানাতে এলেই তা গ্রহণ করতে হবে। যাকে আইনি ভাষায় বলা হয়, জিরো এফআইআর। 'এত দেরিতে অভিযোগ জানাতে এলেন কেন?' পুলিশের এই যুক্তিও টিকবে না।

ধরা যাক, ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার। নির্যাতিতা মহিলা নানা পরিস্থিতিতে অভিযোগ জানাতে ২-৩ দিন দেরি করে ফেললেন। অনেক সময় পুলিশের তরফে শুনতে হয়, 'এত দেরিতে এলেন কেন? এতদিন কী করছিলেন?' কিন্তু এই যুক্তিতে অভিযোগ ফেরাতে পারবে না পুলিশ। অভিযোগ গ্রহণ করতেই হবে। হতে পারে দেরিতে পুলিশের কাছে যাওয়ার জন্য ঘটনার অনেক তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পুলিশ তেমনটা বলছে। তবে এটাও মাথায় রাখা দরকার অনেক সময় নির্যাতনের অভিযোগ জানাতে দ্বিধাবোধ করেন মহিলারা। সমাজ কী চোখে দেখবে! সেই আশঙ্কাও একজন মহিলার মধ্যে থাকাটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে পরিচিত কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো সবসময় সহজ হয় না। তাই অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ জানাতে দেরি হয়।

এফআইআর করার সময় কী কী নিয়ম মানতে হয় পুলিশকে ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের এসওপি অনুযায়ী, থানায় ধর্ষণের অভিযোগ জানাতে গেলে কোনও মহিলা পুলিশ অফিসারকে সেই এফআইআর গ্রহণ করতে হবে। যদি এফআইআর গ্রহণ করতে দেরি হয়, তাহলে তার কারণ কী, সেটা এফআইআরে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। অভিযোগকারীর যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষাতেই এফআইআর লিখতে হবে। জেলার 'লিগাল সার্ভিস অথরিটি'তে এফআইআর-এর একটি কপি পাঠিয়ে দিতে হবে।

অভিযোগকারীর সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার কীরকম ব্যবহার করবেন তারও কিছু বিধিনিয়ম রয়েছে। যথাযোগ্য সম্মান দিতে হবে অভিযোগকারীকে, তিনি অস্বস্তিতে পড়তে পারেন এমন কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। তাঁর পরিচয় যাতে কোনওভাবেই সামনে না আসে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে পুলিশকে। যদি অভিযোগকারীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের কেউ না থাকে, তাহলে পুলিশকেই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অভিযোগকারী যদি মানসিক ভারসাম্যহীন বা বিশেষভাবে সক্ষম হন, তাহলে অভিযোগ শোনার সময় কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হয় পুলিশকে। অভিযোগকারীর বাড়িতে বসে বা তাঁর পছন্দের কোনও জায়গায় বসে পুলিশকে অভিযোগ শুনতে হবে। পুরো বয়ানের ভিডিয়ো রেকর্ড করতে হবে। নির্যাতিতা যদি শিশু হয়, তবে তার পরিবারের অনুমতিতেই এফআইআর গ্রহণ করতে হবে। যদি পরিবারের কেউ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত না থাকে, সে ক্ষেত্রে কোনও এনজিওকে খবর দেবে পুলিশ। সেখানের কোনও সদস্যের সামনে অভিযোগ নিতে হবে।

মহিলা অফিসারের উপস্থিতি জরুরি

ধর্ষণের অভিযোগের ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসার মহিলা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর যদি তদন্তকারী টিম থাকে, তাহলে টিমের সদস্য হিসেবে কোনও মহিলা অফিসার থাকতেই হবে। ধর্ষণের অভিযোগের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোগকারীর বয়স ১৮ বছরের বেশি হলে, তাঁর অনুমতি নিয়ে তবেই মেডিক্যাল পরীক্ষা করা যায়। আর নির্যাতিতা যদি নাবালিকা হয়, তাহলে তার মা, বাবা বা কোনও অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে। অভিযোগ দায়ের হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মেডিক্যাল পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। থানায় যাওয়া সম্ভব না হলে '১০০'- নম্বরে ফোন করতে হবে। এছাড়া ১০৯১ নম্বরে ফোন করে জাতীয় মহিলা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সুতরাং, যে কোনও রকম নির্যাতনের ঘটনায় আইনি সহায়তা পাওয়া নির্যাতিতার অধিকার। তা থেকে বঞ্চিত করতে পারে না পুলিশ-প্রশাসন। আইন তো আজ নতুন করে তৈরি হয়নি। স্বাধীন ভারতে এইসব আইন বরাবরই কার্যকর। তারপরও এফআইআর না নেওয়ার ভুরি ভুরি অভিযোগ ওঠে! পুলিশ ধর্ষণের অভিযোগ না নিলে জেলার পুলিশসুপার বা জেলা দায়রা বিচারকের কাছে আবেদন জানানো যায়। সেক্ষেত্রে ওই পুলিশকর্মীকে অভিযুক্ত করে শাস্তি দেওয়ার কথা লেখা আছে সংবিধানে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে তো ছেড়েই দিন, শহরেও বিচারের আশায় পুলিশ-প্রশাসনের দরজায় মাথা কুটে মরতে হয়েছে নির্যাতিতাকে, এমন উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। আইন আছে তবু বিচার মেলে না! নিয়ম আছে, তার কার্যকারিতা নেই! আজও শুধু একরাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলেই সেই নির্যাতিতাকে ফিরে যেতে হয়। তাই নিজেদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আজ নারীরা পথে নেমেছেন।

বিশেষ রচনা—

আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ

রমাপদ পাহাড়ি

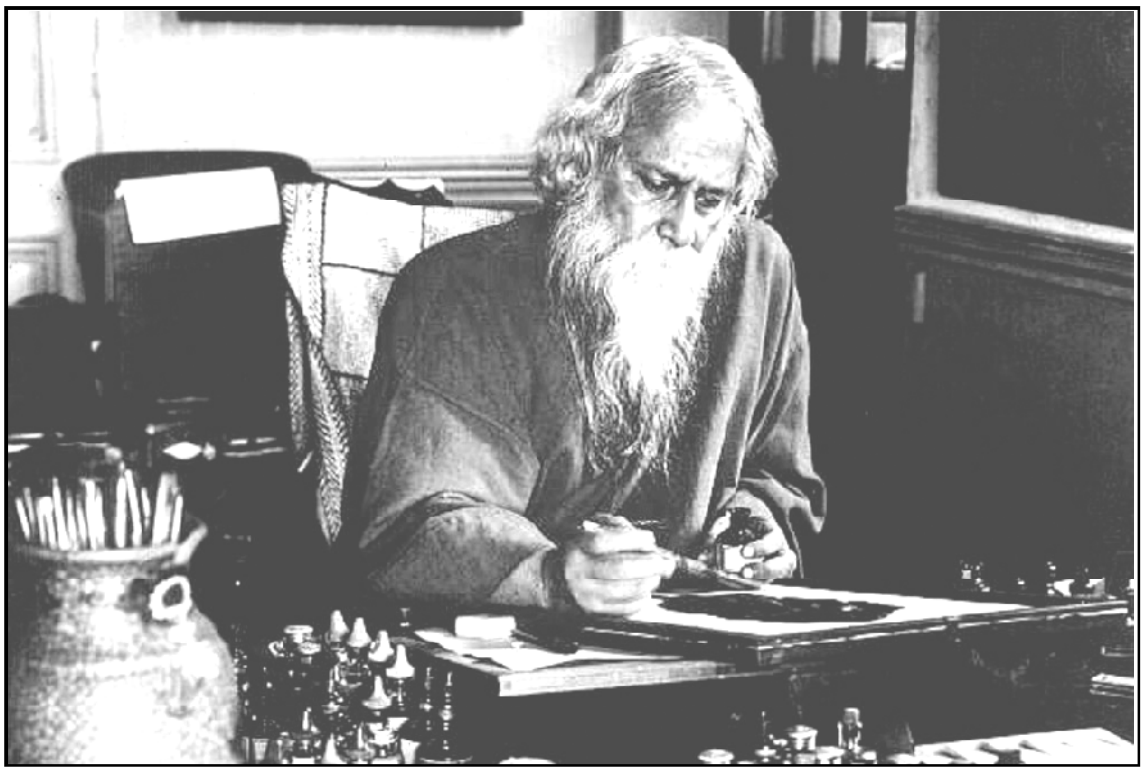

আর নয় জীবন। নয় স্বপ্ন। নয় প্রত্যাশা। নয় কোনো আকাঙ্ক্ষা। যাত্রা শুরু হোক নিরুদ্দেশের দেশে। বিপুলা এ পৃথিবীতে কী আমার অস্তিত্ব! কোথায় আমার ঠিকানা! জীবনের প্রতিটি পাতা একেবারে বির্বণ। নির্মম শূন্য। 'এই জীবন লইয়া কী করিব?' অতএব এবার লক্ষ্য একটাই। আত্মহত্যা।

যিনি আমাদের জীবনের চলার পথের পাথেয়, আমাদের যাবতীয় দুঃখ-সুখের সহোদর, আমাদের বিষাদের রাতের তারা, সেই তিনি কিনা আত্মহননের কথা ভেবেছিলেন! ভাবতে অবাক লাগলেও সত্যি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ভেবেছিলেন আত্মহত্যার কথা।

মৃত্যুকে যিনি মনে করেন, 'শ্যাম সমান'। যিনি মৃত্যুমিছিলেও নিজেকে রাখতে পেরেছিলেন স্থিতধী, সেই তাঁকেও একসময় বিষণ্ণতা পেয়ে বসেছিল। ১৮৮৪ সালের ১৯ এপ্রিল। চারদিকে তখন গ্রীষ্ম ডানা ছড়াচ্ছে। ভোরের হাওয়াটুকু যেন শীতল নয়। বসন্ত বুড়িয়ে গেলেও কোকিল ডেকে চলেছে কুহু কুহু। এর মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টায় ঘুমের ওষুধ খেলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের এই নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। তারপর মৃত্যুর সঙ্গে দু'দিন যুদ্ধ করে ২১ এপ্রিল ভোরের আলো ফোটার আগে সবকিছু ছেড়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

কেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রাণের সখা, প্রেরণাদাত্রী কাদম্বরীদেবী? কাদম্বরীর অবাক-মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথ সদ্য পা রেখেছেন ২৪ বছরে। নীল উজাগর মৃত্যু সম্পর্কে কবির মনে সেই পড়েছিল স্থায়ী ছাপ। ঘুরে গিয়েছিল কবির জীবনের মোড়। এমনটাই মনে করেন জগদীশ ভট্টাচার্যের মতো গুণিজন। মৃত্যু মিছিলে এরপর একে একে জুড়ে যায় স্ত্রী বিয়োগ, কন্যার মৃত্যু, প্রিয় পুত্র শমীন্দ্রনাথের বিদায় সহ আরো শতেক প্রয়াণ। রবীন্দ্রনাথের গোটা জীবন জুড়ে এভাবে তৈরি হয়েছে বিষাদসিন্ধু।

জীবন শুকিয়ে যাওয়ার মতো এত অজস্র ঘটনা, এত মৃত্যুশোক কবির হৃদমাজারের আনন্দকে সেভাবে কখনো শুষ্ক ধূলিতে পরিণত করতে পারেনি। তিনি যেন মৃত্যুঞ্জয়ী, অবাক জগতের বাসিন্দা। বিচলিত না হওয়ার এই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদ থেকে। আত্মস্থ করেছিলেন প্রাচীন গ্রন্থের

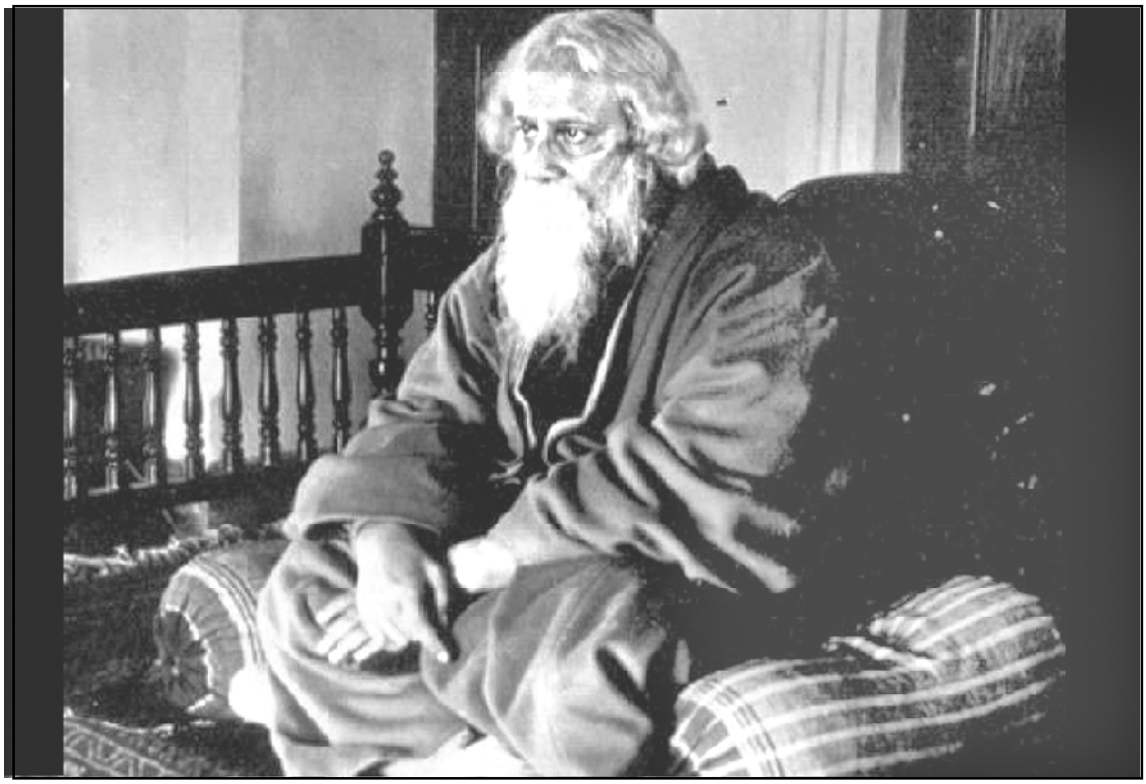

বীজমন্ত্র। হয়ে উঠেছিলেন অতিমাত্রায় সহনশীল। সার বুঝেছিলেন, পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থেকে যায়। তবু যেন তিনি একটিবার, ক্ষণিকের তরে টলে গিয়েছিলেন। টলে গিয়েছিল আত্মস্থ শিক্ষা। গভীর বিষাদ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। শিকড় ছড়িয়েছিল অন্তর্মহলে। ভেবেছিলেন আত্মহননের কথা।

১৯১৪ সাল। গ্রীষ্মকাল। রামগড়ে বাস করছেন কবি। মন বেশ প্রসন্ন। এক মালির ছেলের কাঁপুনি রোগ ছিল। কবি নিজে তাকে ওষুধ দিয়েছেন। রোগও গেছে সেরে। এই সময়েই আচমকা তাঁর মনের আকাশে উঁকি দিল কালো মেঘ। পেয়ে বসল অবসাদ। বিষাদে জর্জরিত হলেন তিনি। বিশ্ব পরিস্থিতি হোক বা অন্তর্দ্বন্দ্ব,কবির মন বিষাদময়। এর কিছুদিন পরই বাঁধবে প্রথম মহাযুদ্ধ। বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে কবি আঘাত পেয়েছিলেন। প্রার্থনা করেছিলেন এই বিশ্বপাপকে দূর করার। অন্যদিকে, তাঁর সাহিত্যে নতুন বাঁক এসেছে। নবরূপে সৃষ্টিক্ষেত্রে বীজ বপন করেছেন। লিখে ফেললেন স্ত্রীর পত্র'র মতো মাইলস্টোন গল্প। চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে'র মতো লেখার জন্য শুনতে হচ্ছে বিস্তর নিন্দেমন্দ। তির ছুড়ছেন কাছের দূরের অনেক নামজাদা কবি-লেখক। নিরন্তর কানে আসছেরূঢ় বাক্য।

বিষাদের ভার বাড়তে আরো কিছু বাকি ছিল। এই কুক্ষণে শুরু হল ব্যক্তিগত বিপর্যয়। আগেই সুরুলে প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে বাড়ি ও জমি কিনেছিলেন কবি। চলে এসেছিলেন শিলাইদহের পাট চুকিয়ে। কিন্তু সইল না। ম্যালেরিয়ার জন্য সে জায়গা ছাড়তে হল। সুরুলের স্বপ্ন অধরা থেকে গেল। গ্রাম সংস্কার থেকে কৃষিকার্য, সে সব ক্রমশ আকাশকুসুম বলে মনে হতে থাকল। এই পর্বে অর্থাৎ রামগড় থেকে ফেরার পর যেন আরো বেশিমাত্রায় বিষণ্ণতার পাকদণ্ডীতে পড়লেন কবি। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে 'মরবার ইচ্ছা' পর্যন্ত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। নিজের চিন্তাভাবনা, নিজের কাজকর্মকে আগাগোড়া তাঁর ব্যর্থ মনে হয়েছিল। ছেলেকে জানিয়েছিলেন, 'নিজের ওপর ও সংসারের ওপর আমার গভীর অশ্রদ্ধা ঘনিয়ে আসছিল'। নিজের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি বলেই ব্যথিত ছিলেন কবি। সম্ভবত কর্মজীবনের ব্যর্থতা তাঁকে গ্রাস করেছিল। আর তাই আত্মহননের কথা ভেবেছিলেন। সে সময় কবি নোবেল পেয়েছেন, সারা বিশ্বে সম্মানিত। মাতৃবিয়োগ, নতুন বৌঠানের চলে যাওয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যুও যাকে টলাতে পারেনি, কর্মজীবনের ব্যর্থতাই সম্ভবত তাঁকে নিজের ধ্যান থেকে বিচ্যুত করেছিল। শোকের আগুনে জ্বলেপুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে উঠেছিলেন কবি। বিষাদকে কখনো জীবনের উপরে স্থান দেননি। তবু মাঝে মাঝে বিষাদে আত্মহত্যার কথা ভাবেন কবি।

নিবন্ধ—

৭ মনীষীর রঙ্গরসিকতা

মানুষের জীবনে মনীষীদের এক অপার প্রভাব ও গুরুত্ব রয়েছে। তাঁদের জীবনকথা, মতাদর্শ, ভাবনা, মূল্যবোধ, লক্ষ্য আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। তবে এই মনীষীদের জীবনও কিন্তু রঙ্গরসিকতায় ভরা। মনীষীদের এই রসিকতা থেকেও অনেক কিছু জানার ও শেখার রয়েছে। তাঁদের জীবনের মজার কিছু ঘটনা এই বিশেষ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল।

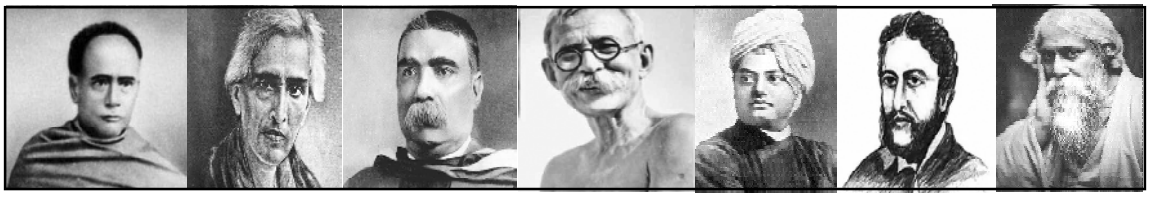

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
রথ দেখা কলা বেচা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন স্কুল ইন্সপেক্টর। এই কাজে তাঁকে নানা স্কুল পরিদর্শন করতে যেতে হত। একবার একটি স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে ক্লাসে ঢুকে তাঁর চোখ ছানাবড়া। দেখেন, শিক্ষকমশাইয়ের টেবিলে এক লম্বা বেত রাখা। শাসনের নামে ছাত্র প্রহার বিদ্যাসাগরের একদম অপছন্দ ছিল। তাই টেবিলে বেত দেখে তিনি মনে মনে বেজায় বিরক্ত হন। শিক্ষককে ডেকে তিনি জানতে চান, বেত দিয়ে কী কাজ হয় শুনি? কাঁচুমাচু মুখে শিক্ষক বলেন, ছাত্রদের ম্যাপ দেখানোর জন্য বেতটি এনেছি। গম্ভীর মুখে বিদ্যাসাগর বলেন, বুঝেছি, বুঝেছি, রথ দেখা আর কলা বেচা দুইকাজ হবে। বেত দিয়ে ম্যাপ দেখানো হবে, আবার ছাত্রদের প্রহার করাও যাবে। কী, তাই তো? বিদ্যাসাগরের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে যান ওই শিক্ষক। সত্যিটা প্রকাশ পেয়ে গেছে যে! ওইদিন থেকে তিনি বেত ত্যাগ করেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চরিত্রহীন

সেই সময় সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের খুব নাম। তাঁর শ্রীকান্ত, দেবদাস সাহিত্যের সুনাম চারদিকে। ঠিক ওই সময় তাঁরই নামে আরো এক লেখকের আবির্ভাব হয়। এই শরৎচন্দ্র হলেন চাঁদমুখ, হিরের ফুল ইত্যাদি বইয়ের লেখক। একইসঙ্গে গল্পলহরি পত্রিকার সম্পাদক। সম্ভবত এই দুই শরৎচন্দ্রের নামের বিভ্রাট দেখা দেয়। তবে পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হত না কোনটা কার লেখা। এই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা তাঁর এক বাল্যবন্ধুর। বেশ অনেকদিন পর সাক্ষাৎ। শরৎচন্দ্র বন্ধুকে বলেন, কী হে চিনতে পারছনা বুঝি? আমার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বন্ধুটিও বেজায় রসিক। তিনি মজা করে পালটা বলেন, আজকের বাংলা সাহিত্যের যুগে তো দু'জন শরতের উদয় হয়েছে। আপনি কোন জন?

বন্ধুর রসিকতা বিলক্ষণ বুঝলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, চরিত্রহীন।

উত্তর শুনে বন্ধুও হো হো করে হেসে ফেললেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
মনোমালিন্য

একদিন সকালে স্যার আশুতোষ ঘরে বসে তৃপ্তি করে এক থালা সন্দেশ খাচ্ছেন। এমন সময় এক ভক্ত তাঁর সামনে দাঁড়ালে তাঁকে অনুরোধ করেন, ওহে সন্দেশ খাও। ভক্ত একটা সন্দেশ মুখে দিয়ে খেতে খেতে কথায় কথায় বলেন, স্যার, শুনলাম আপনার সঙ্গে নাকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনোমালিন্য হয়েছে? এটা কি ঠিক কথা?

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সন্দেশ খেতে খেতে বলেন, আমি আমার ছেলেদের নামের মধ্যে প্রসাদ জুড়েছি আর উনি নিজের ছেলেদের নামের মধ্যে আমার তোষ ঢুকিয়েছেন। এতেই মনে হয় দু'জনের মনোমালিন্য হয়েছে। এই উত্তর শুনে ভক্তটি হেসে উঠে আরো একটা সন্দেশ খেতে শুরু করলেন।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
পদস্থ

দাদাঠাকুর একবার বেতার কেন্দ্রের এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ পেয়ে যান। তার পরনে চিরপরিচিত এক পোশাক, ধুতি ও চাদর। তাঁকে এভাবে আসতে দেখে এক কর্মকর্তা হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে বলেন, দাদাঠাকুর, আপনি আমাদের কাছে যেমনভাবে খুশি আসুন, তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু এঁরা সব পদস্থ লোক, এঁদের সামনে এইভাবে এলে কী ভাববে বলুন তো? দাদাঠাকুর সব শুনে সরস ভঙ্গিতে বলেন, বটে, তা এঁরা আবার পদস্থ কোথায় হে? এঁরা তো সবাই দেখছি জুতস্থ! পদস্থ বলতে তো দেখছি শুধুই আমি! এই কথা শুনে সেই কর্মকর্তা চুপ করে যান।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বজাতির প্রতি প্রেম

স্বামীজী একদিন জমিয়ে গল্পগুজব করছিলেন মিস্টার গুডউইন ও মিস্টার স্টাডির সঙ্গে। ধর্মের আলোচনা নয়, নিছক আড্ডা। কথা প্রসঙ্গে গুডউইন আচমকা বলে উঠলেন, জানেন তো, কোনো মানুষ যখন গাধাকে প্রহার করে আমার খুব রাগ হয়।

গুডউইনের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী বলেন, ঠিকই বলেছেন মশাই, গাধাকে মারতে দেখলে আপনার আসলে স্বজাতির প্রতি প্রেম উথলে ওঠে। তাই তো আপনার এত রাগ হয়। নয় কী?

স্বামীজীর কথা শুনে মিস্টার স্টাডি হো হো করে হেসে উঠলেন। রাঙা হয়ে উঠল গুডউইনের মুখ।

মাইকেল মধুসূদন

খাঁটি বাঙাল

ঢাকা শহরে বেড়াতে গিয়েছেন মধুসূদন। তাঁর আসার খবর পেয়ে একদল যুবক তাঁকে সাহিত্যসভায় আমন্ত্রণ জানান। সেই সভায় তাঁরা মধু কবির উদ্দেশ্য বলেন, হে কবিবর, আপনার বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা আমরা যেমন গর্বিত, তেমনি আপনি ইংরেজ হয়েছেন শুনে আমরা খুব দুঃখিত। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ করা মাত্র আমাদের সেই ভ্রম দূর হল।

নব্য যুবকদের কথা শুনে মধুকবি হেসে বলেন, "আমার সম্পর্কে আপনাদের আর যাই ভ্রম হোক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রম হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হওয়ার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে একখানি আরশি রাখিয়া দিয়াছি। আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যখন বলবৎ হয়, তখন আরশিতে নিজের মুখ দেখে নিই। আমি শুধুমাত্র বাঙালি নহি, আমি খাঁটি বাঙাল হে। আমার বাড়ি যশোর"। মধুসূদনের রসিকতা শুনে নব্য যুবকদের সভায় হাসির রোল উঠল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাড়িশ্বর

রবীন্দ্রনাথ এক আসরে গিয়েছেন নিমন্ত্রিত হয়ে। তিনি যখন পৌঁছোন তখন ধ্রুপদ গানের শিল্পী গোপেশ্বর ব্যানার্জি গাইছিলেন। তাঁর গান শুনে কবি মুগ্ধ। গোপেশ্বরের গাওয়া শেষ হলে উদ্যোক্তারা কবির কাছে এসে অনুরোধ করেন, গুরুদেব এবার আপনাকে গাইতে হবে।

সেদিনের অনুষ্ঠানে কবি শ্রোতা হিসাবে ছিলেন। সকলের অনুরোধে তিনি হাসতে হাসতে বলেন, বুঝেছি বুঝেছি গোপেশ্বরের পর এবার দাড়িশ্বরের পালা। তাই তো? কবির মুখে এই কথা শুনে সভায় সকলে হেসে ওঠেন।

নিবন্ধ—

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন থেকে মার্ক টোয়েনের হাসির কথা

বিপাশা বেরা

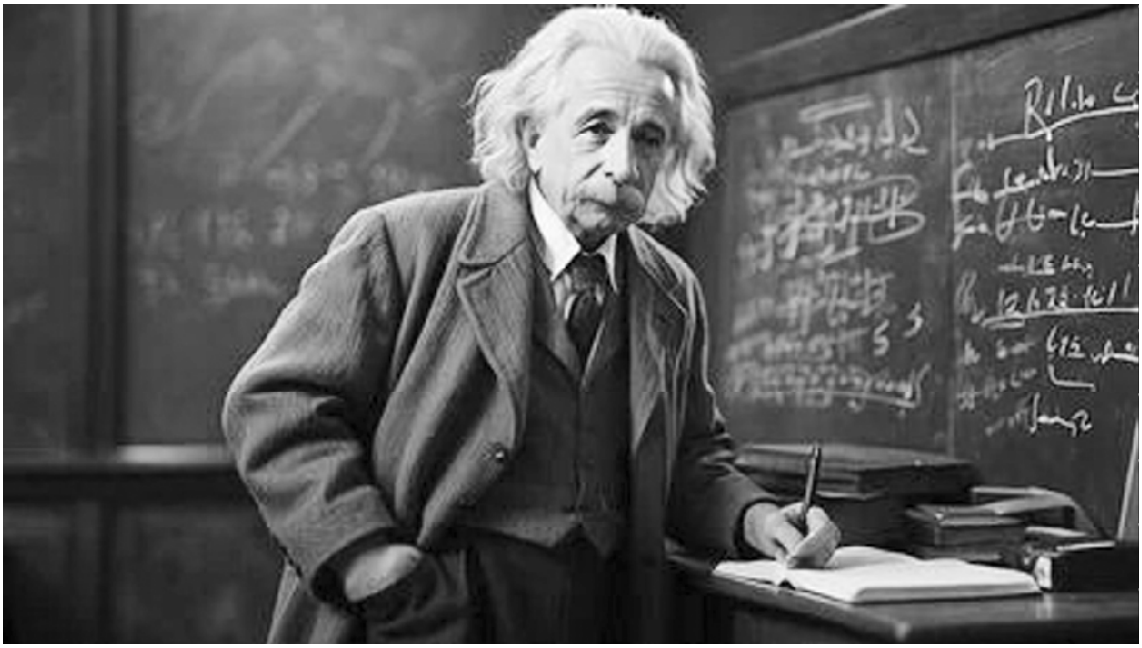

আইনস্টাইন

ঘটনা ১

আইনস্টাইনের আমেরিকা ভ্রমনের সময় ঘটে এক মজার ঘটনা। সেইসময় আইনস্টাইনের 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' খুব কম বিজ্ঞানিইবুঝতে পেরেছিলেন। সেইসময় তাকে একবার সস্ত্রীক আমেরিকা ভ্রমনের আমন্ত্রন জানানো হয়। আইস্টাইন জাহাজে করে আমেরিকা যাওয়ার জন্য রওনা হলেন। জাহাজ থেকে নামার সাথে সাথেই তাকে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরে নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে। এক সাংবাদিক মজার একটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটা ছিল "আচ্ছা, বলুন তো মেয়েরা আপনাকে এত পছন্দ করে কেন?" আইনস্টাইন মৃদু হেসে উত্তর দিলেন , "আপনি জানেন কিনা জানি না তবে মেয়েরা সবসময় লেটেস্ট ফ্যাশন পছন্দ করে আর এই বছরের ফ্যাশন হল 'থেওরি অফ রিলেটিভিটি', আমাকেও ওটার অংশ হতে হয়েছে কিনা।"

ঘটনা ২:

আরেকবার, ১৯২১ সালে ফিলিস্তিন ভ্রমনের একটি ঘটনা। ফিলিস্তিন শহরে 'যুব সংঘ' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের একটি সেমিনারে যোগ দিতে গিয়েছে আইস্টাইন। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ২২ বছরের এক তরুণী। সমাজের নানা বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করছিলেন আইস্টাইন। প্রশ্নের এক পর্যায়ে আইস্টাইন তার কাছে জানতে চাইলেন, "আচ্ছা এখানে নারী পুরুষের সম্পর্ক কেমন?" এই প্রশ্ন শুনে ওই তরুণী খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন। তিনি বললেন, "দেখুন অধ্যাপক, এখানে কিন্তু একজন পুরুষের একটিই স্ত্রী।" আইনস্টাইন উত্তরটা শুনে একটু হেসে তরুণীর হাত ধরে বললেন , "না না, আমার প্রশ্নটা ওভাবে নিয়ো না। আমরা পদার্থ বিজ্ঞানিরা 'সম্পর্ক' কথাটা দিয়ে সহজ কিছু বুঝাই। আমি আসলে জানতে চেয়েছি, এখানে কতজন নারী আর কতজন পুরুষ।" সত্যিই বিজ্ঞানি হবার সাথে সাথে ওনার হাস্যরসবোধও ছিল সবার জন্য উপভোগ্য।

জওহরাল নেহেরু

জওহরাল নেহেরু যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন ক্রুশেভ এসেছিলেন ভারত সফরে। নেহেরু ক্রুশেভকে নিয়ে পার্টি অফিসে সংবর্ধনায় যোগ দান করতে বের হলেন। রাস্তায় এক ব্যাক্তিকে দাড়িয়ে শৌচাগারের কাজ করছে দেখে ক্রুশেভ মন্তব্য করলেন, ইন্ডিয়ানরা দেখি একেবারেই অসভ্য, রাস্তায়

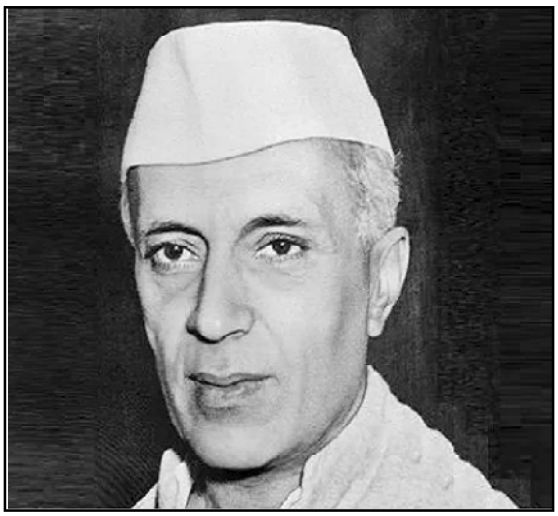

দাড়িয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছে। নেহেরু এতে দারুন লজ্জা পেলেন ও অপমানিত বোধ করলেন। প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু সেইবার আর সুযোগ হল না।

কিছুদিন পর নেহেরু গেল মস্কো সফরে। ক্রুশেভ তাকে নিয়ে 'মস্কো বেল' দেখতে বের হলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে নেহেরু, ক্রুশেভের ভারত সফরকালের অপমানের উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলেন। এবারো রাস্তায় দাড়িয়ে একজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছিল আর তা দেখে নেহেরু ক্রুশেভের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিলো। ক্রুশেভ খুব বিরক্ত হয়ে গেলেন আর লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? লোকটি বিনীতভাবে উত্তর দিলো, "স্যার, আমি ইন্ডিয়ান এম্বেসির একজন কর্মচারী!"

মোহাম্মাদ আলি

ঘটনা ১

নিউইয়র্কে সফরকালে, এক পার্টিতে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মাদ আলির সাথে ভায়োলিনবাদক আইজ্যাক স্টানের সাথে পরিচয় হয়। ভায়োলিনবাদক স্টান মন্তব্য করেন, "বলতে পারেন আমরা দু জনই একই কাজ করি। আমরা দুজনই হাতদিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি।" আলি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, 'তবে আপনিই বেশি ভালো আছেন, আপনার গায়ে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই।'

ঘটনা ২

আবার একবার বিমানে ভ্রমনের সময়, বিমান উড়বার আগের মুহূর্তে আলিকে সিট বেল্ট বাঁধার কথা মনে করিয়ে দিলেন বিমানবালা। আলি উত্তর দিলেন, "সুপারম্যানের সিট বেল্ট বাঁধার প্রয়োজন হয় না।" আলির কথা শুনে বিমান বালাও চটপট উত্তর দিলেন, 'সত্যিকার সুপার ম্যানদের বিমানে উঠারও প্রয়োজন হয় না।'

মার্ক টোয়েন

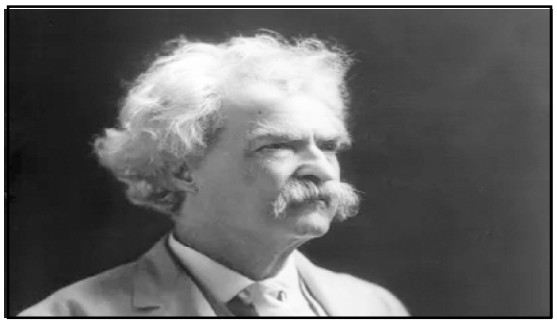

অনেক বছর আগের কথা। সে সময় আমেরিকান ট্রেনগুলো বেশ ধীরগতিতে চলত। লেট করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সকাল ৮টার ট্রেন রাত ৮টায় আসবে কি না সে বিষয়ে সবাই থাকত সন্দিহান।এমনইএক সময়ে বিখ্যাত রম্যসাহিত্যিক মার্ক টোয়েন একবার কোথাও যাওয়ার জন্য ট্রেনে চেপে বসে ছিলেন।কিছুক্ষণ পর কামরায় উঠল টিকিট চেকার। মার্ক টোয়েন গম্ভীর মুখে চেকারের দিকে একটা 'হাফ টিকিট' বাড়িয়ে দিলেন। বুড়ো মানুষের হাতে 'হাফ টিকিট' দেখে টিকিট চেকার অবাক! তাঁর প্রশ্ন, 'কী মশাই, আপনি হাফ টিকিট কেটেছেন কেন? গোঁফ, মাথার চুল সবই তো সাদা। আপনি কি জানেন না চৌদ্দ বছরের বেশি হলে আর হাফ টিকিট চলে না?' মার্ক টোয়েনের সোজা জবাব, "যখন ট্রেনে চড়েছিলাম, তখন তো বয়স চৌদ্দই ছিল। কে জানত, ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছতে এত লেট করবে!"

টমাস আলভা অ্যাডিসন

টমাস আলভা অ্যাডিসনের গ্রামোফোন আবিষ্কার উপলক্ষে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।এক তরুণী তাঁর বক্তৃতায় অ্যাডিসনকে অযথাই আক্রমন করে বসল, "কী এক ঘোড়ার ডিমের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, সারাক্ষণ কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করতেই থাকে। আর তাই নিয়ে এত মাতামাতি! ইতিহাস আপনাকে ক্ষমা করবে না।"তরুণী বলেই যাচ্ছে, থামার কোনো লক্ষণ নেই।অ্যাডিসন চুপ করে শুনে গেলেন। পরে বক্তৃতা দিতে উঠে তিনি বললেন, 'ম্যাডাম, আপনি ভুল করছেন। আসলে সারাক্ষণ কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন ঈশ্বর। আমি যেটা আবিষ্কার করেছি সেটি ইচ্ছেমতো থামানো যায়।"

বিশেষ আকর্ষণ—

মা

আমার মা পরম রতন

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

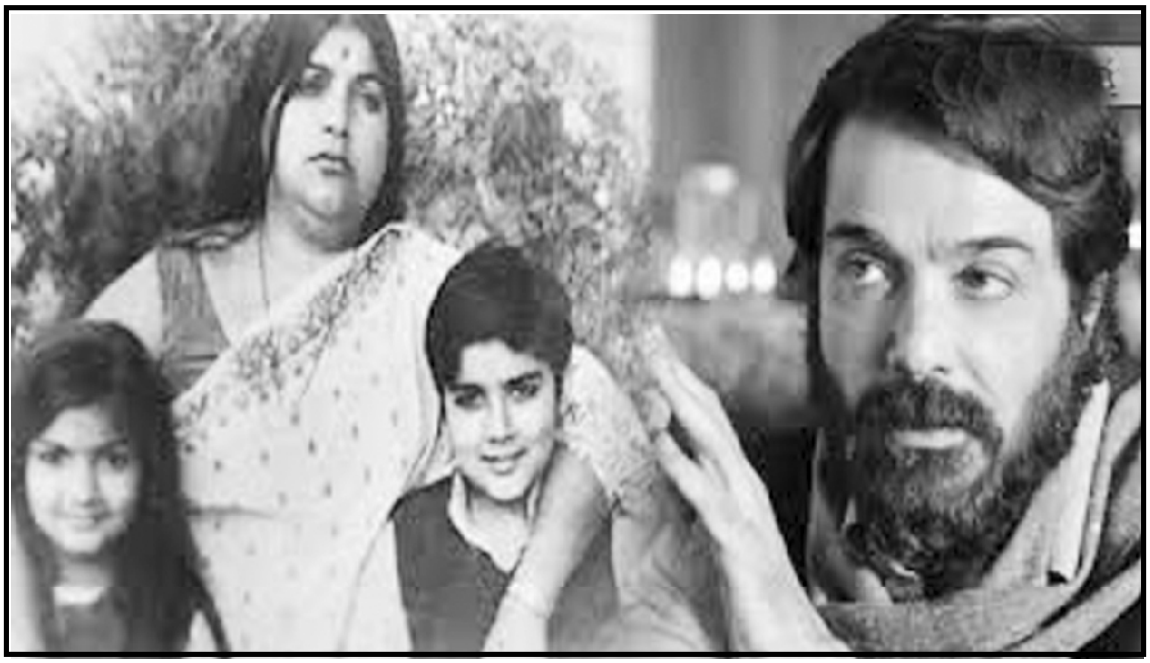

আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি যদি কারোর প্রভাব থাকে, তিনি আমার মা রত্না চট্টোপাধ্যায়। শুধু প্রভাব নয়, আমার জীবনের খোলনলচে বদলে দেওয়ার, আমার জীবনের প্রতিটি ইট গেঁথে দেওয়ার পেছনেও আমার মা। জীবনের পুরোটা জুড়ে রয়েছেন যিনি, দু-চার কথায় তাঁকে নিয়ে বলতে চাওয়া একটা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ।

তখন আমি বুম্বা, ইন্ডাস্ট্রির প্রসেনজিৎ হয়ে ওঠার ঢের বাকি। সেই শুরুর দিনে টলি পাড়ার পরিচালকদের দরজায় দরজায় ঘুরেছি। সঙ্গে থেকেছেন আমার মা। কাজের সুযোগ না পেয়ে যখন চরম অসহায় তখনও আমাকে হতাশ হতে হয়নি। বিশ্বাস জুগিয়েছেন মা।

একটা ঘটনার কথা বলি। পরিচালক মানু সেন ছবি শুরু করতে চলেছেন। ছবির নাম সংক্রান্তি। এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য ওম পুরীকে আনা হচ্ছে। আমাকে নির্বাচন করা হয় একটা বাচ্চা ছেলের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। ছোটো হলেও চরিত্রটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শ্যুটিংয়ের জন্য আমার পোশাক, জামা, প্যান্ট সব বানানো হয়ে গেল। এতটা এগিয়েও শেষে জানলাম, গরিব ঘরের ছেলে হিসেবে আমাকে নাকি মানাচ্ছে না। তাই আমি বাদ। খুব অপমানিত হয়েছিলাম। প্রোডকশনের লোক নতুন ছেলে খুঁজতে লাগল। এরপর, যেদিন শ্যুটিং শুরু হবে, সেদিন সকালে পরিচালক আমার বাড়িতে লোক পাঠালেন। উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যায়নি। তাই আমাকে ওই অভিনয় করতে হবে। কম বয়সের অভিমান। আমি তো কান্নাকাটি করে অস্থির। যাব না বলে জেদ ধরলাম। মা বললেন, তোর রাগটা, অভিমানটা বড় হল, নাকি সুন্দর অভিনয় করে ওই অভিনয়টা যে তুইই সবচেয়ে ভালো করতে পারবি, সেটা প্রমাণ করা বড়ো কথা?

আমার কান্না ওই একটা কথায় মুছিয়ে দিয়েছিলেন মা। রূপালি পর্দায় আমার স্টার হওয়াটা মা দেখে গিয়েছেন। কিন্তু এখন যে আমি দেশের সীমা পেরিয়ে অন্যরকম মর্যাদা পেয়েছি এটা দেখলে মা আরো শান্তি পেতেন নিশ্চয়ই। আমি জানি, মা ঠিক দেখতে পাচ্ছেন।

আমার মা রত্না। আমার কাছে তিনি অমূল্য ধন, পরম রতন। আজও আমি বুকের মাঝে সেই রতন বয়ে বেড়াই।

বরেণ্য মানুষদের জীবনে জন্মদাত্রীদের অবদান

স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে কবি জীবনানন্দ দাশ প্রত্যেক বরণীয় মানুষের জীবনে তাঁদের মায়েদের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই মায়েদের আরেক পরিচয় হল তাঁরা হলেন রত্নগর্ভা জননী। এবারের পুজো সংখ্যায় ওই স্মরণীয় মায়েদের নিয়েই কলম ধরেছেন সাংবাদিক অরণ্য সেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মা

আজকের দিনে দাঁড়িয়েও স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে আমাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। শুধুমাত্র ধর্মের পরিসরে তাঁকে আটকে রেখে সবটা জানা সম্ভব নয়। তাঁর পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের পরিধি ছিল অসীম বিস্তৃত। বিবেকানন্দ তখন খ্যাতির মধ্য গগনে। অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা এই দেশের মানুষ তাঁর কথা শুনে যখন ধীরে ধীরে উদীপ্ত হচ্ছে তখন বিবেকানন্দের মুখে প্রায়ই শোনা যেত, আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি মায়ের কাছে ঋণী। মা ছিলেন বিবেকানন্দের জীবন জুড়ে। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, যে মাকে সত্যি সত্যি পুজো করতে না পারে, সে কখনো বড়ো হতে পারে না।

বিবেকানন্দ তখন স্বামীজী হয়ে ওঠেননি, এমনকী নরেন্দ্রনাথও নয় শুধু বিলে। ওই শৈশবে মা ভুবনেশ্বরী দেবী বিলেকে পড়াতেন। মার কাছে তাঁর বাল্যশিক্ষা। ভুবনেশ্বরী দেবী ছেলেকে শোনাতেন মনীষীদের কথা। মুখে মুখে বলে যেতেন রামায়ণ-মহাভারতের গল্পমালা। শুনতে শুনতে বিলের মুখস্থ হয়ে যেত। মহাকাব্যের কাহিনি বিলের খুব পছন্দ ছিল। ভুবনেশ্বরী দেবী বেছে বেছে এমন গল্প শোনাতেন, যে গল্পে বড়ো হওয়ার কথা রয়েছে, যে গল্পে রয়েছে শিক্ষণীয় দিক।

প্রায় অকালে মারা যান ভুবনেশ্বরী দেবীর স্বামী বিশ্বনাথ দত্ত। তখন তাঁর বয়স ৪৩ বছর। প্রায় রিক্ত অবস্থা, নাবালক সন্তানদের নিয়ে অনেক কষ্টে বেঁচে রয়েছেন। ছেলেকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, 'আজীবন পবিত্র থাকিও, নিজের মর্যাদা লঙঘন করিও না, খুব শান্ত হইবে কিন্তু আবশ্যক হইলে হৃদয় দৃঢ় করিবে'। মা'র এসব কথা কখনো ভোলেনি বিলে। এমনকী বিলে থেকে বিবেকানন্দ হয়েও সবটা মনে রেখেছিলেন।

ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন খুব সহনশীল। হাজারো কষ্টের মধ্যে কখনো ভেঙে পড়েননি। মায়ের আশ্চর্য সহনশীলতার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন, মা একবার সুদীর্ঘ চোদ্দ দিন উপবাসে কাটাইয়াছিলেন।

আপাতভাবে ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন মিতভাষিনী, কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির। এই গাম্ভীর্যের আড়ালে কতখানি কোমলতা ছিল, তা সহজে বোঝা যেত না। তাঁর সহৃদয়তার নানা পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কেউ কখনো নিরাশ হয়নি। পরের দুঃখে সব সময়ই কাতর হতেন তিনি। বিবেকানন্দের বাবা এক বন্ধকী সম্পত্তি ভুবনেশ্বরী দেবীর নামে লিখে দিয়েছিলেন। সেই সম্পত্তি যাঁর, খুবই গরিব ছিলেন তিনি। কিছুতেই শোধ দিতে পারেননি টাকা। ফলে সম্পত্তিও বন্ধক মুক্ত করতে পারেননি। অনেক বছর পর আচমকা ভুবনেশ্বরী দেবীর কাছে হাজির হন ওই মানুষটা। কাতর কণ্ঠে নিজের অসহায়তার কথা শোনান। সব শুনে ব্যথিত হৃদয়ে সেই বন্ধকী দলিল ফেরত দিয়েছিলেন তাঁকে। এমন ঘটনা কত যে ঘটেছে, তার কোনো হিসাব লেখা নেই।

ভুবনেশ্বরী দেবী ভালো সেলাই করতেন। গানের গলাও ছিল চমৎকার। বাড়িতে কোনো বৈষ্ণব ভিক্ষুক এলে, যে গান গেয়ে ভিক্ষে চাইত, সে গান অনায়াসে ভুবনেশ্বরী দেবী গলায় তুলে নিতেন। বিবেকানন্দের সঙ্গীতপ্রীতি সবার জানা। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে রামকৃষ্ণদেবকে শোনাতেন। ছেলেবেলাতেই গানের প্রতি এই ভালোবাসা মা ভুবনেশ্বরী দেবী ছেলের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন। বিবেকানন্দ তখনও নরেন্দ্রনাথ। বিএ পাশ করা রূপবান যুবক। একটা চাকরির জন্য আবেদনপত্র হাতে নিয়ে এই অফিসে, সেই অফিসে ঘুরেছেন। হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে কখনো জিরিয়ে নিয়েছেন মনুমেন্টের ছায়ায়। কী নিদারুণ পরিস্থিতি, খানিকটা আভাস রয়েছে তাঁর লেখায়। বিবেকানন্দের লেখায় পাওয়া যায়----প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম, গৃহে সকলের পর্যাপ্ত আহার্য নাই, সেদিন মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহির হইতাম, এবং কোনোদিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোনোদিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে ঘরে বাইরে কাহারও নিকটে ওই কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না।

এই চরম সংকটের দিনে নরেনের সঙ্গে পরিচয় হয় রামকৃষ্ণের। দিনে দিনে তাঁর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া বাড়ে। সাধু সঙ্গের ফলে ছেলে বদলে যাবে না তো? পাল্টে যায় যদি মতিগতি, ক্রমেই মা ভুবনেশ্বরী দেবীর চিন্তা বাড়ে। বিলে যদি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নেয়, তবে তাঁর কী হবে? কী নিয়ে থাকবেন? হাজারো ভাবনায় জেরবার হন ভুবনেশ্বরী দেবী। আচমকা এক বুদ্ধি খেলে যায়। ভুবনেশ্বরী দেবী ভাবেন, ছেলের বিয়ে দিলে কেমন হয়? বিয়ে দিলে পণ-যৌতুক পাওয়া যাবে, সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসবে। স্বামীর মৃত্যুর আগেই এক ধনী পরিবারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা বলে রেখেছিলেন। সেই প্রথম বিবেকানন্দ মায়ের অবাধ্য হলেন। মাকে জানিয়ে দিলেন, বিয়ে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর থেকেই বিবেকানন্দ কখনো দক্ষিণেশ্বর, কখনো কাশীপুরে গিয়ে কাটাতেন। অচিরে তিনি সন্ন্যাসও নেন। সংসার ত্যাগ করলেও বার বার ছুটে যেতেন মা'র কাছে। প্রণাম করে মায়ের পায়ের ধুলো নিতেন।

দেশে দেশে ঘুরে তখন বিবেকানন্দ বিধ্বস্ত। অসুস্থ শরীরে বেলুড় মঠে আয়োজন করলেন দুর্গাপুজোর। মা ভুবনেশ্বরী দেবীকেও আনানো হয় বেলুড়মঠে। নিজের মা'র উপস্থিতিতে মৃন্ময়ী মা'র পুজো করলেন বিবেকানন্দ। বেলুড়মঠে লক্ষ্মীপুজো হয়, কালীপুজোও হয়। কালীপুজোর শেষে বিবেকানন্দ মাকে নিয়ে যান কালীঘাটে। বিবেকানন্দ যখন ছোটো, আচমকা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। কালীঘাটে মা কালীর পুজোয় মানত করেন ভুবনেশ্বরী দেবী। সে পুজো অবশ্য আর দেওয়া হয়নি। ভুলেই গিয়েছিলেন মানতের কথা। দীর্ঘদিন পর আচমকা মনে পড়ে। ছেলেকে তা জানাতে কালীঘাটে নিয়ে যান। কালীঘাটে পুজো দেওয়ার মাস আটেক পরে প্রয়াত হন বিবেকানন্দ। মা ভুবনেশ্বরী দেবী তখনো বেঁচে।

সুভাষচন্দ্র বসুর মা

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মা ছিলেন প্রভাবতী দেবী। সুভাষের জীবনে তাঁর মায়ের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাকে লেখা একাধিক চিঠিতে মায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রকাশ দেখা যায়। এক চিঠিতে সুভাষ মায়ের কাছে জানতে চান, 'আপনার পুত্রকে কীরূপ দেখিলে আপনার সর্বাধিক আনন্দ হইবে তাহা জানিতে বড়ো ইচ্ছে হয়'। আবার আর এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আপনি কি শুধু আমাদের মা? না, মা আপনি ভারতবাসী

মাত্রেরই মা'। প্রভাবতী দেবীর গুণের শেষ ছিল না। ভালো রান্না করতেন। তাঁর হাতে তৈরি চন্দ্রপুলি খেলে মুখে লেগে থাকত। সুভাষও ছেলেবেলায় খেতে ভালোবাসতেন। কচুরি, শিঙাড়া, চিকেন কাটলেট— এসব ছিল তাঁর খুব প্রিয়। বাড়িতে ঠাকুর-চাকর ছিল। তাঁদের করতে না দিয়ে প্রভাবতী দেবী রকমারি মুখরোচক খাবার নিজের হাতে তৈরি করে সুভাষকে খাওয়াতেন। এমন অনেক খাবার ছিল, যা সহজপাচ্য নয়। খেলে শরীর বিগড়ে যাবে। ছেলেবেলার সেই লোভ তাঁর বড়বেলাতেও ছিল। সুভাষ ছেলেবেলায় মাকে যেমন ভয় পেতেন, তেমনি ভয় পেতেন বড়বেলাতেও। একবার অসুস্থ সুভাষ বাড়িতে ছিলেন, আচমকা কানে আসে, রাস্তা দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে এক প্যাটিসওয়ালা। 'হট প্যাটিস, হট প্যাটিস- হাঁকডাক শুনেই ঘরের বাইরে আসেন সুভাষ। খেয়াল করেন, মা রয়েছেন পাশের ঘরে। দেখে ফেললে তো আর রক্ষা থাকবে না। তাই চুপিসারে বেরিয়ে প্যাটিসওয়ালাকে নিয়ে সুভাষ গেলেন বাড়ির পাশের গলিতে। আয়েস করে পরম আনন্দে খেলেন গরম প্যাটিস।

সুভাষ তখন হাসপাতালে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হওয়ার পরও পুলিশ তাঁর পিছু ছাড়েনি। রীতিমতো পুলিশি প্রহরায় চলে চিকিৎসা। সুভাষের অসুস্থতার খবরে মা প্রভাবতী দেবীও অসুস্থ হয়ে পড়েন। খানিক সুস্থ হওয়ার পর সরকারের অনুমতি নিয়ে প্রতিদিনই তাঁকে দেখতে যেতেন সুভাষ। মাকে দেখে সুভাষচন্দ্র, আর তাঁকে দেখে মা'র-দু'জনে অন্তত সে মুহূর্তে সুস্থ বোধ করতেন। আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠত মা ও ছেলের মুখ।

বিদ্যাসাগরের মা

বিদ্যাসাগর প্রায়ই একটা কথা বলতেন, 'যদি মায়ের গুণের একশোভাগের একভাগও পাইতাম, তাহলে কৃতার্থ হইতাম। আমি যে এমন মায়ের সন্তান এই আমার গৌরব'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী ছিলেন মহীয়সী, অনেক বড়ো মনের মানুষ। তিনি বিদ্যাসাগরের মনে মহতীবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। গরিবদের জন্য বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা সবার জানা। এই বোধ জেগে ওঠার পেছনে ছিলেন তাঁর মা। একবার বিদ্যাসাগর খানকয়েক লেপ পাঠিয়েছিলেন মা'র উদ্দেশে। প্রবল শীত, হাড়হিম ঠান্ডায় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন না-

এসব ভেবে এক বাহকের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর লেপ পাঠালেন বীরসিংহ গ্রামে। ভগবতী দেবী সে লেপ একটিও ব্যবহার করলেন না, দিয়ে দিলেন গ্রামের গরিব লোকদের। তাঁরা হাড় কাঁপানো শীতে কষ্ট পাবে, আর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন, তা তো হতে পারে না। পাঠানো লেপ গ্রামের লোকজনকে দিয়ে ভগবতী দেবী ছেলের উদ্দেশে লেখেন, 'তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি শীতে বিপন্ন লোকদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্য লেপ পাঠাইয়া দিবে'। বিদ্যাসাগর তাঁর মাকে ভালো করে জানতেন। তাই ১টি নয়, ৬টি লেপ পাঠিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, মা অন্তত নিজের জন্য ১টি রাখবেন। সেটুকুও রাখেননি ভগবতী দেবী। তাই ফের লেপ পাঠানোর আদেশ পেয়ে মায়ের উদ্দেশে ফিরতি ডাকে বিদ্যাসাগর লেখেন, ' ওইরূপ ভাবাপন্ন লোকদিগকে ও বাড়ির লোকদিগকে দিয়া তোমার নিজের জন্য একখানি লেপ রাখিতে হইলে সর্বসমেত কয়খানি লেপ পাঠাইব লিখিবে'। গরিবদের জন্য এভাবেই প্রতিদিন কাতর হতেন ভগবতী দেবী। গ্রামের কেউ অসুস্থ

হলেই ছুটে যেতেন তাঁর বাড়িতে। ওষুধপথ্যের ব্যবস্থাও করতেন। কেউ যদি বাড়িতে এসে পড়ে, বলে, খাওয়া হয়নি, এসব ভেবে তিনি অনেক বেলা করে দুপুরের খাবার খেতেন।

বীরসিংহ গ্রামে সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রী পুজো হত। বিদ্যাসাগর সেই আড়ম্বর মেনে নিতে পারেননি। মায়ের কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছিলেন, ঘটা করে পুজো করে একদিনে ছয়শো-সাতশো টাকা খরচ করা ভালো? না, ওই টাকা দিয়ে মাসে মাসে গরিবদের সাহায্য করা ভালো? উত্তরে গরিবদের পক্ষে রায় দেন ভগবতী দেবী।

ভগবতী দেবীকে কোনোদিন দেখেননি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিদ্যাসাগরের বিষয়ে লিখতে গিয়ে স্মরণ করেন কবি। তিনি লেখেন—দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায় কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটা অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বন্ধ ছিল না। তাঁর উদারতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল।

ভগবতী দেবীর মহানুভবতার কোনো তুলনা নেই। একবার বিদ্যাসাগর তাঁকে গয়না গড়িয়ে দিতে চাইলেন। কী কী গয়না পরতে ইচ্ছে করে এই প্রশ্নের উত্তরে 'তিনটি গয়না পরার বড় সাধ' জানালেন ছেলেকে। অনেকবার তাঁর পছন্দের তিন গয়নার নাম জানতে চাওয়ার শেষে হেসে বলেন, প্রথম গয়নাটি কি জানো? গ্রামের ছেলেদের জন্য একটি দাতব্য বিদ্যালয় চাই। দ্বিতীয় গয়না, গ্রামের গরিবদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করে দিতে হবে। তৃতীয় গয়না, গ্রামের গরিব ছেলেদের থাকা, খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর আর দেরি করেননি বিদ্যাসাগর।

মায়ের প্রভাব বিদ্যাসাগরের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর ডাকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভরা দামোদর পেরিয়ে একবার বীরসিংহ গ্রামে যান বিদ্যাসাগর। মায়ের মৃত্যুতে ভীষণভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণের লেখায় পাওয়া যায়, বৃদ্ধ বয়সেও ভগবতী দেবীর কথা উঠলে চোখের জল ধরে রাখতে পারতেন না বিদ্যাসাগর।

রবীন্দ্রনাথের মা

যশহরের দক্ষিণডিহির রামনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে সারদাসুন্দরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা। কবি ছিলেন ১৪তম সন্তান। অষ্টম ছেলে। অষ্টম ছেলের জন্মকালে সারদাসুন্দরীর বয়স ছিল ৩৫ বছর। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবে মাকে পাননি। কবির কথায়—মাকে আমরা বেশি পাইনি। আমাদের বড়দি আমাকে মানুষ করেছেন। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। মায়ের ঝোঁক ছিল জ্যোতিদা ও বড়দার ওপরেই। আমি ছিলাম তার কালো ছেলে। শেষ সন্তান হওয়ার পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। শিশুটির অকালমৃত্যু হয়।

জীবনস্মৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে সারদাসুন্দরী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যের মা ও ছেলের সম্পর্কের খণ্ডচিত্র। সত্যপ্রসাদ বয়সে ছোটো মাতুলকে ভয় দেখিয়ে পুলিশমামা পুলিশমামা বলে চিৎকার করে আমোদিত হত। যাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা, সেই ছোট্ট রবির মনে হয় মা'ই নিরাপদ আশ্রয়।

বছর বারো যখন বয়স, তখন আকস্মিকভাবে মায়ের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অনেকদিন মাকে দেখেননি, গিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে হিমালয়। ফিরে আসার পর মা কাছে টেনে নিয়েছিলেন তাকে। হিমালয়

ফেরত কিশোর রবি বেড়ানোর গল্প শুনিয়ে মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল করে নিয়েছিলেন। মাকে জানান, বাবার কাছে পড়ে এসেছেন বাল্মীকির মূল রামায়ণ। ছেলের এই রামায়ণ পাঠ ভারী আমোদিত করে মাকে। নরমাল স্কুলে পড়ার সময় সূর্য যে পৃথিবীর চেয়ে লাখ গুণ বড় - এখবর শুনিয়ে মাকে অবাক করে দেন ছোট্ট রবি।

মাকে তো রবি সেভাবে পাননি, যেটুকু পেয়েছিলেন, সে স্মৃতি মনের কোণে অমলিন হয়েছিল। সারদাসুন্দরী থাকতেন তিনতলার ১টি ঘরে। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় সে ঘরের বর্ণনা পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৩। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন মা। টানা এক বছর অসুস্থ ছিলেন সারদাসুন্দরী। মাকে কাছে না পাওয়ায় যন্ত্রণা ছিল কবির মনে। যেটুকু মাকে পেয়েছেন, সে স্মৃতি জীবনভর লালন করেন রবীন্দ্রনাথ। সারদাসুন্দরী মারা যান ১৮৭৫ সালের ১১ মার্চ। সারদাসুন্দরীর মৃত্যু হয়েছিল যে রাতে, সে রাতের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখা আছে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে। শ্মশানে যান কিশোর রবি। কবির ভাষায়, 'যে রাত্রিতে তাঁর মৃত্যু হয়, আমরা ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওরে তোদের কী সর্বনাশ হইল রে। স্তিমিত প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া আচমকা বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মায়ের মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনও সে কথাটার পুরো অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপর শয়ন। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাইরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকন্নার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম, গলির মোড়ে আসিয়া তেতলায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন'। সদ্য মাতৃহারা কিশোরের এই মানসিক যন্ত্রণা আমাদের আজও ছুঁয়ে যায়। কবির এই যন্ত্রণা প্রশমিত হয়নি কোনোদিন। জীবনভর মায়ের জন্য কাতরতা তাঁর রয়েই গিয়েছিল।

অন্য মায়েদের কথা

সবুজ সেন

মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে গরিমাময় অধ্যায় হল মা ও মাতৃত্বের দায়ভার বহন করা। আপনার তর্কাতীত মন যদি প্রশ্ন তোলে কেন? প্রেমিকা, স্ত্রী ও অন্যান্য ছোটো-বড়ো সামাজিক সম্পর্কগুলোর আর কোনো ভূমিকায় কি তাহলে মেয়েরা সফল নয়? আসলে যখন কোনো মেয়ে তার গর্ভে সন্তান ধারণ করে, ততদিনে মেয়েটি জীবনের এক জলছবি এঁকে নেয়। তখন থেকেই সেই সন্তানকে ঘিরে আশাআকাঙ্খা, চাওয়াপাওয়া, স্বপ্ন, কামনা এসব কিছু হবু মায়ের অবচেতন মনে জাবর কাটতে থাকে। এগুলোর সংমিশ্রণই সচেতন হয়ে মায়ের মস্তিকের ওপরের ভাগে চলে আসে। আর সন্তান মায়ের সত্ত্বার

এক টুকরো হয়ে পৃথিবীতে আসে। মা তার সবটুকু দিয়ে সন্তানকে লালনপালন করতে শুরু করে। সেই কারণে হয়তো মাতৃত্ব মেয়েদের সবচেয়ে গরিমাময় অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় খোকা ব্যাকুল হয়ে জানতে চেয়েছিল----

'এলেম আমি কোথা থেকে!
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে---
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'।

এই ইচ্ছে আসলে পিটুইটারির খেলা নাকি ফ্রয়েডিয়ান তাত্ত্বিকতা সেটা তর্কের বিষয়। মূল কথা মায়ের ইচ্ছাশক্তি। আর ইচ্ছার জন্য মহাভারতের কুন্তী সূর্যদেবকে ডেকে আনেন আর তারই ফলস্বরূপ কর্ণের জন্ম। কুন্তী তখন অবিবাহিত। কুমারিত্বের লজ্জা ঘোচানোর জন্য সদ্যোজাত কর্ণের ঠাঁই হয়নি মায়ের কোলে। গঙ্গার জলে তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের যন্ত্রণা মাকে সারাজীবন বয়ে নিয়ে যেতে হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আহত ও মরণাপন্ন ছেলে কর্ণকে সেবা করতে এসে মা কুন্তী অন্য পাঁচ পুত্রকে তাঁর জীবনের গোপন ও গভীর কথাটি জানান। কর্ণের মৃত্যুর পর পাঁচ ছেলেকে তাঁদের বড়ো দাদার শেষ কাজের আদেশ দেন কুন্তী। যদিও ধর্মরাজ তার জন্য নিজের মাকে তিরস্কার করতে দ্বিধা করেননি।

কথিত আছে, মাতা মেরির কুমারী অবস্থায় নাকি যিশুর আবির্ভাব। বেথেলহেমের এক আস্তাবলে প্রভু যীশুর জন্ম হয়।

মাইথোলজি ছেড়ে এবার রিয়েলিটিতে আসা যাক। সামাজিক লজ্জা ও ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে নিজের ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিতে অবিবাহিত অবস্থায় মা হন অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা। অবিবাহিত অবস্থায় মা হয়ে গোটা দেশজুড়ে বিতর্ক তোলেন। তাঁর প্রেমিক ছিলেন ভিভ রিচার্ডস। আজকের মতো সেদিন সোশাল মিডিয়া থাকলে জানা যেত এই ব্যাপারে নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া।

যাবতীয় প্রেমিকের ডাক উপেক্ষা করে কোনো প্রভাবশালী লোকের শয্যাসঙ্গিনী না হয়ে দুই মেয়েকে দত্তক নিয়ে মা হয়েছেন প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী ও অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন। সুস্মিতা এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মা হওয়ার জন্য বিয়ে করা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁর মনে হয়নি।

শুধুমাত্র দত্তক মা নয়, টেস্টটিউব বেবি বা সারোগেট মা হওয়ার ঘটনা দেশজুড়ে বেড়ে চলেছে। চিত্রপরিচালক অনিন্দিতা সর্বাধিকারী দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় সারোগেট উপায়ে মা হয়েছেন। ওই একই

পথে হেঁটেছেন চিত্রশিল্পী এলিনা বণিক। বলিউড স্টার শাহরুখ খান ও গৌরী খান তাঁদের তৃতীয় সন্তানের সময় সারোগেট মায়ের সাহায্য নিয়েছেন। ২০১১ সালে আমির খান ও কিরণও একইভাবে সন্তানের মুখ দেখেছেন।

পাশাপাশি অবশ্যই নাম করতে হয় ২ মায়ের কথা। যাঁরা জৈবিক বা কৃত্রিম উপায়ে মা না হয়েও সবার মা।

সুদূর আলবানিয়ার এক ছোট্ট গ্রাম থেকে ১৯২৮ সালে চলে এসেছিলেন ভারতে। নিজের দেশে কনভেন্ট শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর ১৮ বছর বয়সে মেরি টেরিজা বোজাঝিউ প্রভু যিশুর ডাক শোনেন। ঠিক তখনই মনে মনে ঠিক করেন গরিবের সেবাই তাঁর জীবনের ব্রত হবে। প্রথম জীবনে একজন নান হিসাবে ভারতের বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন মিশনারি স্কুলে শিক্ষকতার কাজে জড়িত থেকেও, নিজে খুব সাধারণ, সরল জীবন কাটিয়ে নিজের লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যান। পরে তাঁর কাজের ক্ষেত্র হয় এই কলকাতা শহর। পার্কস্ট্রিটের লরেটোয় শিক্ষিকা থাকার সময় একদিন দু-একটি শাড়ি আর ৫ টাকা হাতে নিয়ে পুরোপুরি সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভারত স্বাধীন হলে তিনি এই দেশের নাগরিকত্ব নেন। পরে একজন বাঙালি মা হয়ে গড়ে তোলেন নির্মল হৃদয়। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন লাখ লাখ অনাথ শিশুর ও আমজনতার মাদার টেরিজা। মাদার বলতেন, তুমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে কর এই ভেবে যে, তুমি ঈশ্বরকে সেবার সুযোগ পেয়েছ। তার আর্তকে স্পর্শ করা ঈশ্বরকে স্পর্শ করার সমান।

একদিন সন্তান কামনায় স্বামীর কাছে আকুতি জানিয়েছিলেন, পরে সেই স্বামীর আশীর্বাদে শত শত সন্তানের মা হয়ে বিশ্ব মাতৃত্বের প্রতীক হয়ে ওঠেন মা সারদা। বিশ্বজোড়া চৈতন্যের স্পন্দনে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তাঁর মাতৃত্বের মহান বাণী, 'জগৎ জুড়ে আমার ছেলেরা রয়েছে। ছেলে যদি ধুলোকণা মাখে, মাকেই তো কোলে তুলে নিতে হয়। আমি যে সতের মা, অসতেরও মা'। সারা বিশ্বে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ফলহারিণী কালীপুজোর রাতে শ্রী মায়ের মানবী ও দেবী ভেদ মুছে দিয়ে তাঁকে জগৎমাতা রূপে পুজো করেন।

দেব অসুরের যুদ্ধে অমৃত কলস হরণ করতে ভগবান বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ করে অসুরদের অমৃত পান থেকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু শ্রীমার ক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ অবুঝ সন্তানের ভাষা যে বোঝে, তারই থাকে মা হওয়ার অধিকার। তাই তিনি দেব, অসুর, সৎ-অসৎ কাউকে অমৃত সুধা থেকে বঞ্চিত করেননি। সেই মাতাল পদ্মবিনোদ থেকে শুরু করে পতিতা, ডাকাত, সকলেই তাঁর সন্তান ছিলেন। মায়ের কথায়--শরৎ আমার যেমন ছেলে, আমজাদও আমার তেমন ছেলে।

বিষ্ণুপুর স্টেশনে অন্য রাজ্যের অবহেলিত ভুখা মানুষের প্রতিনিধি হতভাগ্য কুলি মায়ের কৃপায় ধন্য হয়েছেন, নীরদাসুন্দরীর মতো কত অভিনেত্রী বারাঙ্গনার তপ্ত ললাটে মা এঁকে দিয়েছেন স্নেহের চুম্বন। বাবা, মা হারা অসহায় বালক গোবিন্দর খোস-পাঁচড়ায় নিজের হাতে মলম লাগিয়েছেন মা।

স্বামীজী লিখেছিলেন, 'মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে একটাই আর দ্বিতীয় নেই'। পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে শত বেদনার বোঝা বয়ে করুণ গলায় মা বলেছিলেন, 'যদি তোমার আর কেউ না থাকে, তবে জানবে তোমার একজন মা আছেন। যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও, আমার ভালোবাসা আর আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে'।

শতবর্ষে পা দেবেন নীল নির্জনের কবি নীরেন্দ্রনাথ

এই বছর কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষ। ১৯ অক্টোবর শতবর্ষে পা দেবেন 'নীল নির্জন'র কবি। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়েছে। উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য গঠিত হয়েছে এক বিশেষ কমিটি। এই কমিটির সভাপতি পদে রয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। সহসভাপতিমণ্ডলীতে রয়েছেন জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, ইন্দ্রনীল সেন এবং ব্রাত্য বসু। এই কমিটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জন্মশতবর্ষ উদযাপন নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যে সব কর্মকাণ্ড ঘটছে, তার মধ্যে কিছুটা হলেও সংহতি স্থাপনের একটা প্রয়াস। প্রচুর লিটল ম্যাগাজিন, কবিতা ও আবৃত্তির ক্ষেত্রে যুক্ত নানা সংস্থা ইতিমধ্যেই কবির জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন শুরু করে দিয়েছে। উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলা আকাদেমি এবং সাহিত্য আকাদেমিও।

কবির পরিচয়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম ২ কার্তিক ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (১৯ অক্টোবর, ১৯২৪) ফরিদপুর জেলার চান্দ্রা গ্রামে। শৈশব কেটেছে পূর্ববঙ্গেই, ঠাকুরদা আর ঠাকুমার কাছে। কবির ঠাকুরদা কর্মজীবন কাটিয়েছেন কলকাতায়। কর্মজীবন শেষে ৫০ বছর বয়সে কলকাতার পাট চুকিয়ে বাংলাদেশের ফরিদপুরের চান্দ্রা গ্রামে বাড়িতে চলে আসেন। তাঁর বাবা কলকাতাতেই ছিলেন। কলকাতার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে তিনি কাজ করতেন। দুই বছর বয়সে কবির মা বাবার কর্মস্থল কলকাতাতেই চলে আসেন। কবি থেকে যান তাঁর ঠাকুরদা লোকনাথ চক্রবর্তীর কাছে। গ্রামে সময় কাটিয়েছেন মহা স্বাধীনতায়। ইচ্ছেমতো দৌড়ঝাঁপ করে। কখনো গাছে উঠে, কখনো আপন মনে ঘুরে গ্রামের এই প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। চার বছর বয়সে কবির

কাকিমা বলেছিলেন, 'তুই তো দেখছি কবিদের মতো কথা বলছিস'! সেই সময়েই মুখস্থ করেছিলেন কবিগান, রামায়ণ গান। গ্রামের দিনগুলো খুব সুন্দর কাটিয়েছেন, তাই তিনি গ্রামের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় যেতে চাইতেন না।

তাঁর প্রাথমিক লেখাপড়া ফরিদপুরের পাঠশালায়। পরে ঠাকুরদার মৃত্যুর পর ১৯৩০ সালে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কলকাতায় এসে প্রথমে বঙ্গবাসী স্কুলে, পরে মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। ১৯৪০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪২ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। ১৯৪৪-এ সেন্ট পলস কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকার সম্পাদনা করে সংবাদপত্রের প্রতি তাঁর নিবিড় ও গভীর অনুরাগের সূত্রপাত হয়।

কবির প্রথম কবিতা লেখা

মাত্র ৫ বছর বয়সে তিনি প্রথম কবিতা লেখেন। কিন্তু সেটা কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। ১৬ বছর বয়স থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখেছেন। ১৬ বছর বয়সেই 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় কবিতা লেখার মধ্যে দিয়েই সাহিত্যজগতে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়।

সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি

'দৈনিক প্রত্যহ' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি। পরে সত্যযুগ পত্রিকার সাংবাদিক রূপে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর একে একে মাতৃভূমি, স্বরাজ, ভারত, ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৫১ সালে যোগ দিয়েছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি আনন্দমেলা পত্রিকায় সম্পাদনা করেছেন। আনন্দমেলা থেকে অবসর নিয়ে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বানান বিধির দায়িত্বে ছিলেন। এই বিষয়ে নিয়ে তিনি লেখেন 'কী লিখবেন কেন লিখবেন'। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এই বই প্রকাশিত হয়। নীরেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই 'নীল নির্জন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। এরপর প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা 'অন্ধকার বারান্দা', 'নীরক্ত করবী', 'নক্ষত্র জয়ের জন্য', 'আজ সকালে' সহ অসংখ্য কবিতার বই। 'উলঙ্গ রাজা' কবিতায় সামন্ততান্ত্রিক জমিদার, জোতদার সমাজ ব্যবস্থাকে তীব্র কটাক্ষের বাণে বিদ্ধ করেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কবিতার শেষ লাইনে লেখা 'রাজা তোর কাপড় কোথায়' লাইনটি আজও মানুষের মুখে মুখে ঘোরে।

কবিসত্তা

তাঁর কবিতার প্রধান আশ্রয় মানুষ। মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, আবেগ তাঁর কবিতায় ঠাঁই পেয়েছে। মানবতার অবমাননা তিনি সহ্য করতে পারেননি বলেই সেই অবমাননার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তিনি ছিলেন সমস্ত ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। তাই সমকালীন জীবনের ভণ্ডামি, শোষণ ও অবিচার তাঁর কলমে ব্যঙ্গের রূপ নিয়েছে। আধুনিক সভ্যতার নেতিবাচক দিক, রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকের ন্যায়নীতি, ভ্রষ্টতা ও প্রজাশোষণ, বুদ্ধিজীবীদের স্তাবকতা ও বিবেকহীনতাও কবির কবিতায় রূপ পেয়েছে। আত্মসর্বস্ব আধুনিক সভ্যতার নির্লজ্জ রূপ দেখে ব্যথিত কবি একটি রূপকের ছলে প্রশ্ন করেছেন শাসক শক্তির কাছে, রাজা তোর কাপড় কোথায়? মানুষের কবি ও মানবতার পূজারি নীরেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় মানুষকে দেখেছেন। অখণ্ড দৃষ্টিতে। মানুষের মধ্যেই কবি ঈশ্বরকে দেখেছেন, মানুষের সারল্যের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশকে উপলব্ধি করেছেন। তাই 'কলকাতার যীশু' কবিতায় যীশুকে মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন----

স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টালমাটাল পায়ে
রাস্তার একপার থেকে অন্যপারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক শিশু।

মানবতাকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে কবি জীবনকে ভালোবেসেছেন-গভীর মমত্ববোধ দিয়ে। তাই আশ্রয়হীন পুঁটলি ঘাড়ে করে চলে যাওয়া মানুষটিকে কবি গৃহজীবনে আহ্বান জানান এভাবে—

ও বড়বউ, ডাকো, ওকে ডাকো,
ওই যে লোকটা পার হয়ে যায় কাঁসাই নদীর সাঁকো।

তাঁর কবিতার প্রেরণাও মানুষ, তাই মানুষ ও কবিতা কবির কাছে সমার্থক। তিনি লিখেছেন, স্পষ্ট কথাটিকে আজ অন্তত একবার খুব স্পষ্ট করে বলে দেওয়া ভালো। অন্তত একবার আজ বলা ভাল,

যা-কিছু সামনে দেখছি ধোঁয়া বা পাহাড় কিংবা পরস্পর আলাপনিরত ক্ষিপ্র পশু হয়তো এ ছাড়া কোনও দৃশ্য নেই। সমকাল চেতনা কবির কাব্যে এসেছে বারেবারে। যেমন, চিলের কান্নায় কবি উপলব্ধি করেছেন, অমন ধারালো শুকনো বুকফাটা আর্তনাদ আমি কখনো শুনিনি। মনে হয়েছিল, যেন পাখি নয়, বিশ্ব চরাচর আজ রাত্রে ওই

কলঘরে অন্ধকারে বন্দি হয়ে চিৎকার করছে। মানুষের কাছে মানুষের জন্য প্রেম ও ভালাবোসা প্রত্যাশা করে লিখেছেন, মানুষ। তোমার প্রেম ছিল। তবুও, মানুষ, তুমি কিছুই দিলে না নিখিল সংসারে। কবি যখন সমকালীন জগৎ দেখে অসহায়তা অনুভব করেন তখন প্রাকৃতিক জগতে খুঁজে পান নির্মল আনন্দ-'আকাশে গৈরিক আলো।

ছোটগল্প ও উপন্যাস :

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একাধিক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্রের নাম ভাদুড়ী মশাই। গল্পের মধ্যে রয়েছে:

১) শ্যামনিবাস রহস্য (১৯৯০)
২) মুকুন্দপুরের মনসা (১৯৯১)
৩) বিষাণগড়ের সোনা (১৯৯২)
৪) চশমার আড়ালে (১৯৯৩)
৫) রাত তখন তিনটে (১৯৯৪)
৬) লকারের চাবি (১৯৯৫)
৭) বরফ যখন গলে (১৯৯৫)
৮) একটি হত্যার অন্তরালে (১৯৯৭)
৯) আড়ালে আছে কালীচরণ (১৯৯৮)
১০) পাহাড়ি দিছে (১৯৯৮)
১১) আংটি রহস্য (২০০০)
১২) জোড়া ভাদুড়ি (২০০১)
১৩) শান্তিলতার অশান্তি (২০০২)
১৪) কামিনীর কণ্ঠহার (২০০৩)।

উপন্যাস 'নীরবিন্দু' আত্মজীবনীমূলক। ভ্রমণ কাহিনি 'গঙ্গাযমুনা'।

পুরস্কার ও সম্মাননা :

'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৭৪ সালে 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার' পান কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এছাড়াও একগুচ্ছ পুরস্কার রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। ১৯৫৮ সালে 'উল্টোরথ পুরস্কার', ১৯৭০ সালে 'তারাশঙ্কর স্মৃতি' ও ১৯৭৬ সালে 'আনন্দ শিরোমণি' পুরস্কার পান কবি। ২০০৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি. লিট দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

শেষের দিন

দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগে ৯৪ বছর বয়সে ২০১৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শতবার্ষিকী স্মরণে—

চরিত্রকে মঞ্চে জীবন্ত করে তুলতেন শোভা সেন

ড. শঙ্কর ঘোষ

বাংলা থিয়েটারের গোলাপসুন্দরী, বিনোদিনী দাসী, তারাসুন্দরী, প্রভাদেবী প্রমুখ নায়িকারা যে অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; বসুন্ধরা সেই জাতীয় অভিনেত্রী। বসুন্ধরা স্বীকার করেছেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি তাঁর গুরু। এই মুহূর্তে বসুন্ধরা দ্য গ্রেট বেঙ্গল অপেরার বর্ষীয়সী অভিনেত্রী। এই নাট্যশালার প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তি বেণীমাধববাবু। সকলে ডাকেন কাপ্তেনবাবু বলে। তিনি নতুন একটি মেয়েকে আবিষ্কার করেছেন, ময়না। ময়নার দিকে নজর পড়ে এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বীরকৃষ্ণ দাঁ'র। বীরকৃষ্ণ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে দেবেন লোভ দেখিয়ে বেণীমাধবের কাছে ময়নাকে চেয়ে বসেন। লোভনীয় টোপে বেণীমাধব সম্মত হন। বসুন্ধরা স্পষ্ট জানান, যাকে ময়না ঘৃণা করে তার সঙ্গে জোর করে গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়ার চেয়ে মেয়েটাকে মেরে ফেললেই পারো! নিজের মেয়ে হলে এ-কাজ করতে পারতে না, বাবু। বেণীমাধব তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। কারণ বীরকৃষ্ণ ময়নাকে পেলে থিয়েটার গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরূপ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় বসুন্ধরার কণ্ঠে 'থিয়েটার খুলছ না, খুলতে যাচ্ছ গদি, দোকান, দালালির আপিস। যেখানে ময়নার সতীত্ব বিক্রি হবে'। এমনই প্রতিবাদী চরিত্র বসুন্ধরা। যে নাটকের প্রধান চরিত্র এই বসুন্ধরা সেই নাটকের নাম 'টিনের তলোয়ার'। যার রচয়িতা নির্দেশক ও কাপ্তেনবাবুর চরিত্রের অভিনেতা হলেন উৎপল দত্ত। বসুন্ধরা চরিত্রের শিল্পী শোভা সেন। একটা চরিত্রকে মঞ্চে কীভাবে জীবন্ত করে তুলতে হয় সেটা শোভা সেন দেখালেন এই 'টিনের তলোয়ার' নাটকে।

ব্যক্তিজীবন :

শোভা সেনের জন্ম ১৯২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলার কার্তিকপুর গ্রামে। বাবা নৃপেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। বেথুন কলেজে বিএ পড়াকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে বিয়ে হয় ১৯৪২ সালের ৪ জুলাই। কলেজে পড়াকালীন নাট্যাভিনয় শুরু। 'শেষ রক্ষা' নাটকে গদাইয়ের বাবা, 'সীতা' নাটকে বাল্মীকির চরিত্রে অভিনয় করলেন। ভাগনাস-এর সুধী প্রধান ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রধান বিজন ভট্টাচার্যের কাছে নিয়ে যান শোভা সেনকে। ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর 'নবান্ন' নাটকে তিনি রাধিকার চরিত্রে অবতীর্ণ হলেন। সকলে মুগ্ধ। ইতিমধ্যে ১৯৫১ সালে ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত হন উৎপল দত্ত। তিনি লিটল থিয়েটার গ্রুপ খোলেন (সংক্ষেপে এলটিজি)। যখন এলটিজি নিয়মিত অভিনয়ের জন্য মিনার্ভা থিয়েটার লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন শোভা সেনের দাম্পত্যজীবনে চরম অশান্তি, স্বামীকে লুকিয়ে নিজের বাড়ির দলিল বন্ধক দিয়ে তিনি দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। অভিনয়ের ব্যাপারে স্বামীর অপছন্দ ছিল। তাই সাংসারিক বিরোধ চরমে পৌঁছোয়। বিবাহবিচ্ছেদ করেন ১৯৬০ সালের ১০ মার্চ। নাট্যসহকর্মী ও সহযোদ্ধা উৎপল দত্তকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেন ১৯৬১ সালের ২৯ মার্চ। প্রথম পক্ষের একটি পুত্রসন্তান উদয়ন। দ্বিতীয় পক্ষের এক কন্যাসন্তান বিষ্ণুপ্রিয়া।

চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ

উৎপল দত্ত তখন সাউথ পয়েন্টের শিক্ষক। সংসার নির্বাহের জন্য শোভা সেনকে নির্বিচারে প্রচুর সিনেমায় অভিনয় করতে হয়। নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' বা ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক'-এর মতো ছবিতে কাজ করলেও, পরে তিনি বাণিজ্যিক ছবিতে নিয়মিত অভিনয় করা শুরু করলেন। যখন তাঁর নায়িকা হওয়ার কথা তখন উনি অবলীলায় সমবয়সীদের গুরুজনের চরিত্রে মানানসই অভিনয় করেছেন। সত্যেন বসুর 'পরিবর্তন' ছবিতে প্রতিবন্ধী বালকের বিধবা মায়ের চরিত্রে তিনি দর্শকের মধ্যে দাগ কাটলেন। অগ্রদূতের 'বাবলা' ছবিতে তিনি দরিদ্র বাবলার বিধবা মা। 'মেজদিদি' ছবিতে দুঃখী কেষ্টর বিধবা মা। বাণিজ্যিক

ছবিতে তিনি সবার নজর কাড়লেন 'সবার উপরে' ছবিতে। সেখানে তিনি ছবি বিশ্বাসের স্ত্রী, উত্তমকুমারের মায়ের ভূমিকায়। আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। কলকাতার সব বিখ্যাত পরিচালকদের ছবিতে তিনি অভিনয় করা শুরু করলেন। তার মধ্যে রয়েছে চিরকুমার সভা, শিল্পী, পথে হল দেরি, বন্ধু, সূর্যতোরণ, লালু ভুলু, আম্রপালি, সূর্য শিখা, আকাশকুসুম, নতুন জীবন, শঙ্খবেলা, কখনো মেঘ, বিলম্বিত লয়, শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন, রোদন ভরা বসন্ত, স্বয়ংসিদ্ধা, মোহনবাগানের মেয়ে, বাবুমশাই, এই পৃথিবী পান্থনিবাস প্রভৃতি। 'ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ' ছবিতে তিনি সারদামণির ভূমিকায় ছিলেন। ঠাকুরের চরিত্রে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎপল দত্ত পরিচালিত 'ঘুম ভাঙার গান', 'বৈশাখী মেঘ', 'ঝড়' প্রভৃতি ছবিতেও তিনি দাপটের সঙ্গে অভিনয় করলেন। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' অবলম্বনে উৎপল দত্ত যে 'মা' ছবিটি তৈরি করেছিলেন সেখানেও শোভা সেন অভিনয় করলেন নাম ভূমিকায়। মৃণাল সেনের ছবি 'রাতভোর', 'আকাশকুসুম', 'এক আধুনিক কাহানি' ছবিতেও তিনি কাজ করেছেন। ঋতুপর্ণ ঘোষের 'আবহমান' ছবিতে এবং গৌতম ঘোষের 'পদ্মা নদীর মাঝি'তেও শোভা সেন কাজ করেছেন।

মঞ্চাভিনেত্রী হিসেবে মূল্যায়ন

১৯৫৩ সালে যখন তিনি অভিনেত্রী প্রভাদেবীর সংস্পর্শে আসেন তখন তাঁর নতুন রীতির অভিনয় ও বাগভঙ্গি আয়ত্ত্ব করে অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন শোভা সেন। উৎপল দত্ত যখন শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' বাংলায় মঞ্চস্থ করেন, তখন মিসেস ম্যাকবেথ চরিত্রে অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। ছয় দশকের অভিনেত্রী জীবনে দেশ-বিদেশের থিয়েটারকে গভীরভাবে জানার প্রচুর সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। ইউরোপের থিয়েটার চষে ফেলে, আত্মস্থ করে, নিজের অভিনয়শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন বার্লিনের হেলেনে ভাইগেলের অভিনয় দেখে। নাট্যজীবনে বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত ছাড়াও যাঁদের পরিচালনায় মঞ্চে কাজ করেছেন তাঁরা হলেন শম্ভু মিত্র, ঋত্বিক ঘটক, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ। ফ্রিৎস বেনেভিৎস-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করেছেন 'হিম্মতবাঈ' নাটকে ১৯৮৭ সালে। ওইবছরই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। উৎপল দত্ত প্রতিষ্ঠিত এলটিজি আর পিএলটি-র প্রায় সব নাটকেই তিনি প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যেখানে অবশ্যই নাট্যকার ও নির্দেশক হলেন উৎপল দত্ত। তেমন কিছু চরিত্রায়ন হল 'ছায়ানট' নাটকে সুচরিতা, 'অঙ্গার' নাটকে বিনুর মা, 'ফেরারি ফৌজ'-এ বঙ্গবাসী দেবী, 'চৈতালি রাতের স্বপ্নে' টিটানিয়া, 'কল্লোল'-এ কৃষ্ণাবাঈ, 'প্রফেসর মামলক'-এ এলেন, 'অজেয় ভিয়েতনাম'-এ কিম, 'মানুষের অধিকার'-এ মিসেস লিভোভিৎস, 'সূর্যশিকার'-এ ঊর্মিলা, 'ঠিকানা'-তে নানি, 'ব্যারিকেড'-এ ইঙ্গেব্রাত, 'টোটা'তে কস্তুরী, 'বর্গী এলো দেশে'-তে প্রভাবতী ইত্যাদি চরিত্রগুলি। এছাড়াও স্মরণীয় অভিনয় করেছেন 'তপতী' নাটকে রানির চরিত্রে, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে ফতিমা বিবি, 'শোধবোধ' নাটকে বিধুমুখী, 'ওথেলো'তে এমিলিয়া, 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ বাসন্তী চরিত্রে।

সম্মান

'সংগীতনাটক আদাদেমি' পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭৪ সালে। রাজ্য নাট্য আকাদেমি তাঁর এক ভিডিও সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেছে ১৯৯০ সালে। রাজ্য সরকার প্রদত্ত 'দীনবন্ধু পুরস্কার' পেয়েছেন ১৯৯৫ সালে। প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে সংবর্ধিত হয়েছেন ১৯৯৭ সালে। লিখে গেছেন বই।

শোভা সেনের শেষের দিনগুলো

প্রথম পক্ষের সন্তান উদয়নের আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। ১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট হারান উৎপল দত্তকে। শেষের দিকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন মঞ্চে নিবেদিতপ্রাণ শোভা সেন। সেই শোভা সেনকে আমরা হারাই ২০১৭ সালের ১৩ আগস্ট। শতবর্ষের প্রাক্কালে শিল্পীর উদ্দেশে রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সৌজন্য: জাগো বাংলা

শব্দযন্ত্রী থেকে বরেণ্য চিত্রপরিচালক তপন সিনহা

বাংলা সিনেমায় সত্যজিৎ, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন-এই ত্রয়ীর পর যাঁর নাম উচ্চারিত হয় তিনি হলেন তপন সিনহা। ২ অক্টোবর এই চিত্রপরিচালক পা রেখেছেন শতবর্ষে। তপন সিনহার কোন এক যাদুতে গল্পগুলো সত্যি হয়ে ওঠে। ছবির চিত্রনাট্যের মতোই ছিল তাঁর জীবন।

তপন সিনহা জন্মেছিলেন ১৯২৪ সালের ২ অক্টোবর, কলকাতা শহরে। শিক্ষাজীবন কেটেছে ভাগলপুর আর কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্স-এর শব্দযন্ত্রী হিসেবে কর্মজীবনে তাঁর পা রাখা। লন্ডনে গিয়ে হাতেকলমে চলচ্চিত্র নির্মাণ শিখেছিলেন। এরপর ইংল্যান্ড থেকে ফিরে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তপন সিনহার নিজের পরিচালনায় প্রথম ছবি 'অঙ্কুশ' মুক্তি পায় ১৯৫৪ সালে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটো গল্প অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি বক্স অফিসে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। পরের দু'টি ছবি 'উপহার' এবং 'টনসিল'ও দর্শকদের মন জয় করতে সফল হয়নি। এরপর তিনি পরিচালনা করেন 'কাবুলিওয়ালা'। ১৯৫৭ সালে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো শুরু হলে তপন সিনহার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তাঁর জীবনের বড়ো প্রেরণা। রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে বেশ কয়েকটি ছবি বানিয়েছিলেন- 'কাবুলিওয়ালা', 'অতিথি', 'ক্ষুধিত পাষাণ'। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় তাঁর লৌহ কপাট, ক্ষণিকের অতিথি, ঝিন্দের বন্দি, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, হাটেবাজারে, সাগিনা মাহাতো, সবুজ দ্বীপের রাজা, গল্প হলেও সত্যি, বাঞ্ছারামের বাগান, হুইলচেয়ার, আদালত ও একটি মেয়ে, নির্জন সৈকত, জতুগৃহ, আরোহী, সফেদ হাতি, জিন্দেগি জিন্দেগি, এক ডক্টর কী মৌত-এর মতো ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সম্পদ।

তপন সিনহা ও উত্তমকুমারের কেমিস্ট্রি

তপন সিনহার বেশ কিছু ছবিতে কাজ করেছেন উত্তমকুমার। 'উপহার' ছবিটির জন্য নায়ক হিসেবে পান উত্তমকুমারকে। তখনও তিনি 'মহানায়ক' হয়ে ওঠেননি। তপন সিনহার ডাকে পার্শ্বচরিত্রে এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার। চিত্রনাট্য পছন্দ হয়েছে এই কথা

পরিচালককে জানাতেই তিনি উত্তমকুমারকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন নিজের মতো করে সংলাপ বলার। শুনে উত্তমকুমার অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'তোমার কাছেই প্রথম শুনলাম জানো! সব ডিরেক্টর যা ডায়ালগ লেখেন, সেটাকেই বলতে বলেন। এতে কি অভিনয় হয় বলো'? পরিচালক তপন সিনহা ভেতরের আমিটাকে বের করে আনার জন্য এতটাই 'স্পেস' দিতেন অভিনেতাদের।

উপহার-এর পরে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায় উত্তমকুমার ও তপন সিনহার। 'ঝিন্দের বন্দি'তে পরিচালকের এককথাতেই ঘোড়ায় চড়া শিখতে রাজি হয়েছিলেন উত্তমকুমার। সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের লেখা 'জতুগৃহ' করতে গিয়ে উত্তমকুমার নিজেই তপন সিনহাকে জানালেন, 'আমি তো ভবানীপুরের রকে আড্ডা মেরে বড়ো হয়েছি, উচ্চারণ খুব একটা ভালো নয়। ছবিদার মতো মার্জিত ডায়ালগ বলতে পারি না'। উপায় বলে দিলেন তপনবাবু। 'রোজ সকালবেলা একটা করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করবেন'। শোনা যায়, এই কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন মহানায়ক। বিচারক ছবিতে উত্তমকুমার ছিলেন। কিন্তু বাঞ্ছারামের বাগান ছবি নিয়ে তপন সিনহা ও উত্তমকুমারের বন্ধুত্বে চিড় ধরে। এই ছবির জমিদার ছোকরি ও তার ছেলে নকরি এই ২টি চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল উত্তমকুমারের। ঠিক ছিল শীতকালে শ্যুটিং হবে। কিন্তু আচমকা মুম্বইতে গিয়ে অন্য ছবির কাজ পড়ে যাওয়ায় উত্তমকুমার ডেট পাল্টাতে চান। জানান, মার্চের আগে ডেট দিতে পারবেন না। কিন্তু তপন সিনহা তাতে রাজি হলেন না, ওই দুটি চরিত্রে তিনি দীপঙ্কর দে'কে নেন। ছবিতে শীতকালীন ফসল তোলার জন্য সবজির ব্যবস্থা করা হয়েছিল বাগানে। কয়েক মাস দেরি করলে সেগুলো নষ্ট হয়ে যেত। আর্থিক ক্ষতি হত প্রযোজক ধীরেশ চক্রবর্তীর। কিন্তু রেগে গিয়ে উত্তমকুমার আদালতে মামলা করেন। আদালতে বিচারকের সামনে পরিচালক তপন সিনহা বলেন, '৩ মাস পরে উত্তমকুমারকে পাব কিন্তু শীতের সর্ষে ফুল কোথায় পাব? সেই মামলায় শেষ পর্যন্ত উত্তমকুমার হরে যান।

আন্তর্জাতিক সাফল্য ও অন্য ছবির গল্প

বড়ো পর্দায় তপন সিনহাকে প্রথম আন্তর্জাতিক সাফল্য এনে দেয় 'কাবুলিওয়ালা'। তপনবাবু তখন জুনিয়র পরিচালক, এদিকে তাঁর ছবিতে কাবুলিওয়ালা'র ভূমিকায় অভিনয় করছেন দিকপাল ব্যক্তিত্ব ছবি বিশ্বাস। তপন সিনহা হঠাৎ একদিন দেখলেন, মাথায় জরির পাগড়ি, গায়ে সিল্কের আচকানের ওপর জরির কাজ করা প্রায় ঔরঙ্গজেবের পোশাক পরিহিত ছবি বিশ্বাস মেটিয়াবুরুজের সেটে এলেন কাবুলিওয়ালার অভিনয় করতে। কী বলবেন বুঝতে না পেরে 'ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস' ভেবে নিয়ে কাজ শুরু করে দেন তপন সিনহা। তিন-চারদিনের শুটিং ওইভাবে হয়ে গেলেও পরে ছবির প্রযোজক অসিত চৌধুরী ও তপন সিনহা দু'জনে মিলে ছবি বিশ্বাসকে অনুরোধ করাতে সেই 'রাজবেশ' ছেড়ে কাবুলিওয়ালার গরিব পোশাক পরতে রাজি হয়েছিলেন তিনি। তখন আবার প্রথম থেকে শুরু হয়েছিল সিনেমার শ্যুটিং। কিন্তু ছবি বিশ্বাসের রাজকীয় খামখেয়ালি মেজাজ সারা ছবি জুড়ে ছিল। স্পিরিট গাম দিয়ে কিছুতেই দাড়ি লাগাতে চাননি ছবি বিশ্বাস। তাই সারা ছবি জুড়ে কিম্ভুতকিমাকার এক দাড়ি নিয়ে দেখা যায় মিনুর কাবুলিওয়ালাকে। কেন পরিচালক হিসেবে তিনি এই ব্যাপারে জোরাজুরি করেননি তা নিয়ে পরবর্তীতে সত্যজিৎ রায় খুব বকাবকি করেছিলেন তপন সিনহাকে। যদিও ততদিনে কাবুলিওয়ালা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে গোটা দেশেই। বার্লিন ফেস্টিভ্যালে ছবিটি দেখে এক বিদেশি সাংবাদিক তপন সিনহাকে জানিয়েছিলেন, ছবি বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয় ওঁর দাড়ির বিষয়টি নিয়ে সমস্তরকম অভিযোগ উনি ভুলিয়ে ছেড়েছেন। আবার নিজের খেয়ালে এই ছবি বিশ্বাসই কাশ্মীরের শ্যুটিংয়ে কাবুলিওয়ালার কস্টিউম পরে হাজির করেছিলেন সহকারি বলাই সেনকে। অজেয় অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে কী বলবেন ভেবে পাননি তপন সিনহা। তাই ওই সিনেমায় কাবুলিওয়ালার চরিত্রে ছবি বিশ্বাসকে দেখা গেলেও কাবুলের দৃশ্যে কাবুলিওয়ালা রূপে যাঁকে দেখা যায় তিনি বলাই সেন। তপন সিনহা পরিচালক হিসেবে এভাবেই অনেক ব্যাপার ছেড়ে দিতেন সিনেমার

কলাকুশলীদের ওপর। আর তাতে প্রতিবারই শাপে বর হত। এই মেজাজি ছবি বিশ্বাসকেই দেখা যায় তপন সিনহার 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে। নিজে থেকে এগিয়ে এসে 'রোল' নিতে, ওই বয়সেও প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে তাঁকে দেখা যেত।

নিজের ভদ্রতার গুণেই তপন সিনহা সেই সময়ের তাবড় তাবড় অভিনেতা- অভিনেত্রীদের দিয়ে খুব সাবলীলভাবে কাজ করিয়ে নিতে পেরেছিলেন। 'সাগিনা মাহাতো'র শ্যুটিংয়ে অভিনেতা দিলীপকুমারকে নিয়ে তপন সিনহার কাজের অভিজ্ঞতা ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং। কোনো সিন পছন্দ না হলে নানা টালবাহানা করে তা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করতেন দিলীপকুমার। একদিন সেটে এসে দেখা যায় দিলীপকুমার গ্রিনরুমে বসে আছেন ঘাড়ে 'হটব্যাগ' নিয়ে। আতঙ্কিত তপন সিনহা তাঁর কাছে যেতেই তিনি বললেন ঘাড়ে ব্যথা, আজ আর হবে না কিছু। একটা গোটা দিন শ্যুটিং ক্যানসেল মানে অনেক টাকার ধাক্কা। বুদ্ধি করে তখন তপন সিনহা দিলীপকুমারকে বললেন, 'ব্যথা তো একটু হবেই। নার্গিস, মীনাকুমারী, বৈজয়ন্তীমালা... কত কত নায়িকা ওই কাঁধে মাথা রেখে অভিনয় করেছেন...'। দিলীপকুমার ওই অবস্থায় হেসে ফেলে তখন বলেছিলেন, 'বাবা শ্যুটিং করবে চলো, বাঙালিদের সঙ্গে পেরে ওঠা দায়'। আবার এর উল্টো ঘটনা ঘটেছিল অভিনেতা অশোককুমারের ক্ষেত্রে। 'হাটে বাজারে'র সেটে সত্যিই অসুস্থ অশোককুমার হাঁপানি নিয়েও নিজে থেকেই অভিনয় চালিয়ে গিয়েছিলেন। তপন সিনহার অনুরোধেও শ্যুটিং বন্ধ করেননি শুধুমাত্র পরিচালকের কাজের ক্ষতি হবে বলে। নিজের ভেতরের ভালো গুণেই সকলের কাছে এভাবেই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তপন সিনহা।

বাস্তবের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তপন সিনহার পরিচালনার মূল শর্ত ছিল। 'হুইলচেয়ার' ছবিতে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যাতে ঠিকঠিক এক প্রতিবন্ধীর যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তার জন্য তাঁকে বনহুগলিতে এক পরিচিত ডাক্তারের কাছে দু-তিনবার পাঠিয়েছিলেন তপনবাবু। দুর্ঘটনায় ওই ডাক্তারের দুটি পা'ই বিকল হয়ে গেলেও হুইলচেয়ারে তিনি গোটা হাসপাতাল চক্কর দিতেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে এই বিষয়টি রপ্ত

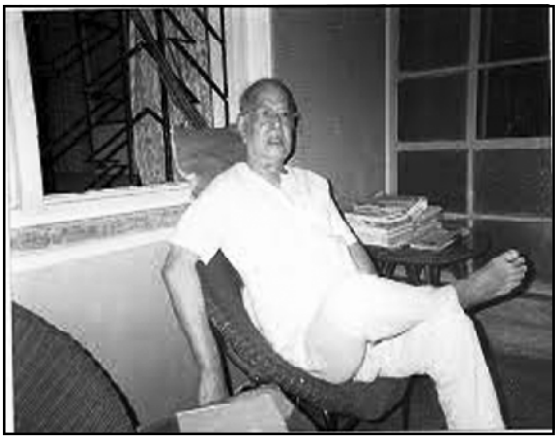

করাতেই পরিচালকের এই উদ্যোগ ছিল। বাস্তব বারবার কথা বলেছে তপন সিনহার ছবিতে। হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, আতঙ্ক, অভিমন্যু'র মতো সিনেমা তার প্রমাণ। আজও যখন দিল্লি, উন্নাও, হাথরসে কিংবা দেশের প্রতিটি কোণায় প্রায় প্রতিদিন নির্ভয়ারা ধর্ষিত হন, ছিন্নভিন্ন করা হয় মনীষা বাল্মীকিদের শরীরকে, তখনও দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে তপন সিনহার ছবি 'আদালত ও একটি মেয়ে'। মানুষকে এভাবেই বারবার জীবনের আয়নার সামনে দাঁড় করানো, শিক্ষিত মননকে উস্কে দেয় যে নাম তিনি হলেন তপন সিনহা।

তপন সিনহার যোগ্য সহধর্মিণী

তপন সিনহার স্ত্রী ছিলেন অরুন্ধতী দেবী। অরুন্ধতীর এটা ছিল দ্বিতীয় বিয়ে। তাঁর প্রথম স্বামীর নাম ছিল প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তিনিও ছিলেন জনপ্রিয় পরিচালক। অরুন্ধতী দেবী তপন সিনহার অনেক ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন, তার মধ্যে রয়েছে, কালামাটি, ক্ষুধিত পাষাণ, ঝিন্দের বন্দি, জতুগৃহ। এছাড়াও তপন সিনহার 'হারমোনিয়াম' ছবিতে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন। এই ছবিতে নিজের গলায় গান গেয়েছিলেন রজনীকান্তের 'কেন বঞ্চিত তব চরণে'।

পুরস্কার ও সম্মান

দেশ-বিদেশের নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তপন সিনহা। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য তিনি অনেকবার জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। ২০০৬ সালে তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্রকার তপন সিনহা প্রয়াত হন ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি।

শতবর্ষ স্মরণ—

বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী সহিতিক সমরেশ বসু

বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তাঁর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী শব্দটা প্রযোজ্য। কারখানার শ্রমিক থেকে পুরো সময়ের জন্য লেখক হয়ে ওঠার কাহিনিটা সিনেমার গল্পকেও হার মানাবে।

অধিকাংশ লেখকের ক্ষেত্রেই তাঁদের মফস্বল অথবা শহুরে অভিজ্ঞতা, জীবনযাপনের সুখী অথবা ম্লান পৌনঃপুনিকতায় যে একঘেয়েমির সুর লেখায় ধ্বনিত হয়, সমরেশ বসু সেখানে মূর্তিমান ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এবং তার জন্য শুধু নিন্দা বা প্রশংসা নয়, লেখক জীবনে খেসারতও কম দিতে হয়নি তাঁকে। স্রোতের বিপরীতে যাওয়া ভাঙা এবং ভাঙতে ভাঙতেই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কারিগর হয়ে উঠে আসা। এই বছর তাঁর শতবর্ষ, ফিরে তাকানো যাক ব্যতিক্রমী এই লেখকের জীবনের দিকে।

ছেলেবেলার সব দিন

সমরেশ বসুর জন্ম ১৯২৪ সালে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার রাজনগর গ্রামে। আসল নাম ছিল সুরথনাথ। বাবার কর্মসূত্রে পুরোনো ঢাকায় তাঁর ছোটোবেলার বেশ কয়েক বছর কাটে। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা সেখানেই। লেখাপড়ায় তেমন মন ছিল না। বরং বুড়িগঙ্গার ধারে ঘুরে আসতে ভালো লাগত। শ্মশানের দিকটাও মন টানতো। আর ভালো লাগত জয়নাল, মনসুর, ইসমাইল, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গ। ১৯৩৮ সালে ঢাকা থেকে সমবেশ বসুর দাদার কর্মস্থল ২৪ পরগনার নৈহাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দাদাই হয়তো চেয়েছিলেন নিজের কাছে রেখে ভাইকে পড়াশোনা করাবেন। ভর্তি করে দিলেন স্থানীয় স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে। বড়দার রেল কোয়ার্টারে থেকেই স্কুলে যাওয়া। তবে পড়াশোনায় তেমন উৎসাহ ছিল না, পরবর্তীকালে সহপাঠীরা তেমনই জানিয়েছেন। গুণেরও কোনও অভাব ছিল না। বাঁশি বাজানো, ছবি আঁকা, অভিনয় অনেক কিছুই করতে পারতেন। শুধু বাঁধা বইয়ের ছাপা অক্ষরের বিধিবদ্ধ লেখাপত্র ভালো লাগছিল না। চৌবাচ্চার কোন নল দিয়ে কত জল বেরোয় আর কোন নল দিয়ে কত জল ঢোকে, সে হিসেবের চেয়ে গঙ্গায় সাঁতরানো বেশি সহজ মনে হচ্ছিল। যাঁর মন গঙ্গার বিস্তার ও গতিতে, তাঁকে চৌবাচ্চায় ধরে রাখা কঠিন। নবম শ্রেণিতে ওঠার পরীক্ষা দিলেও তাতে মন ছিল না। ফলে উঁচু ক্লাসে পড়ার ইচ্ছে ত্যাগ করে কিশোর সমরেশ সবার অলক্ষ্যে স্কুলের চৌহদ্দি ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের তারাপদ আর শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত যেমন সব বাঁধন আলগা করে বিশ্ব পৃথিবীর কাছে চলে গিয়েছিল, তেমনই সমরেশ রোল-কলের ডাকে সাড়া না দিয়ে জীবনের বড় ইশকুলে ঢুকে পড়লেন।

তার সূচনা হল পরের বছরেই

অল্প বয়সে বিয়ে ও লেখক সমরেশ

বন্ধুরা যখন দশম শ্রেণিতে বই নিয়ে ব্যস্ত, সমরেশ তখন স্বামীর সংসার ছেড়ে আসা গৌরীর প্রেমে পড়লেন। অনেকে এই সম্পর্ক মানতে পারেনি, সমাজও খুশি হয়নি। সমরেশ গৌরী দেবীকে নিয়ে নৈহাটি ছেড়ে চলে গেলেন। উঠলেন বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে জগদ্দলের কাছাকাছি আতপুরের এক বস্তিতে। কাজ অবশ্য একটা জুটলো, মুরগির ডিম বিক্রির। স্ত্রী গৌরী গান জানতেন আর তাতেই আরও কিছু টাকা আসে। পরিচয় হল জগদ্দল অঞ্চলের শ্রমিক নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সঙ্গে। তিনি সত্য মাস্টার নামে বেশি পরিচিত ছিলেন আর সমরেশ বসুর রাজনৈতিক মাস্টার বলতে হলে এঁর কথাই আগে বলতে হয়। সমরেশ বসুর হাতের লেখার গুণে তাঁকে পোস্টার লেখার দায়িত্ব দেন, কিন্তু লেখার হাতের কথা জানতেন না। শুধু আঁকার বিষয়ে দক্ষতার কথা জানতেন। সে সূত্রেই ইছাপুর বন্দুক কারখানায় চাকরি মেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বলে অস্ত্রের চাহিদা বেশি আর তাই সমরেশ বসুর শিল্পীসত্তার প্রয়োগ ঘটলো অস্ত্র কারখানায়। বস্তি থেকে ততদিনে কারখানার মিস্ত্রিদের পাড়ায় একটা ঘর মিলেছে।

সংসারে সন্তান এসেছে। সত্য মাস্টারের কাছে মার্কসবাদে শিক্ষা ও দীক্ষা ঘটেছে। স্বপ্ন জেগেছে শোষণহীন সমাজব্যবস্থার। জেনেছেন চাকরির কর্মের সঙ্গে তাঁকে ভাবতে হবে শ্রমিকদের শ্রমের যথাযথ মূল্য পাওয়ার লড়াই নিয়েও। তাঁকে খণ্ড লড়াই থেকে অখণ্ড শ্রেণি সংগ্রামের দৃষ্টিতে চালিত করতে হবে। এই সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তকে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত সমরেশ বসু তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'বি টি রোডের ধারে' উৎসর্গ করেছিলেন 'সত্য মাস্টারের উদ্দেশে' লিখে।

প্রথম প্রকাশিত গল্প

১৯৪৪ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় সমরেশ বসুর প্রথম গল্প 'আদাব', যা আজও সমরেশ বসুর সবচেয়ে আলোচিত গল্প। তাঁর প্রথম লেখা উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি'। প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি থাকার সময় সমরেশ বসু 'উত্তরঙ্গ' লিখতে শুরু করেন। জেল থেকে মুক্তি, চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া, কমিউনিস্ট পার্টির পাঁচ বছরের সদস্য পদ ছেড়ে দেওয়া আর অনিশ্চিত পূর্ণ সময়ের লেখক-জীবন বেছে নেওয়া, সবই ঘটতে থাকে ১৯৫১ সালের কাছাকাছি সময়ে। সঙ্ঘ ছাড়লেও শ্রমজীবী মানুষ আর তাঁদের সংগ্রামের সঙ্গীদের যে সঙ্গ ছাড়েননি, তার প্রমাণ হল 'বি টি রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে', 'গঙ্গা', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-র মতো নানা উপন্যাস ও অনেক গল্প।

সমরেশ থেকে কালকূট

১৯৫৪ সালে কুম্ভমেলায় যান আর সেখানের মানুষজনের সঙ্গ লাভে 'কালকূট'-এর জন্ম হয়। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লেখা হল, যার ভাব আর ভাষা তাঁর আগের লেখা থেকে আলাদা। কিন্তু বামপন্থী সমরেশ কেন গিয়েছিলেন সে মেলায়, কীই বা পেয়েছিলেন! তাঁর মেলায় আসার পর এক বৃদ্ধার মুখ দিয়ে শুনিয়েছিলেন কালকূট 'বাবা, মানুষ মিলে মেলা, মানুষের মেলা। যখন ভাবি, এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আমিও একজন, তখন সুখে, আনন্দে আমি আর চোখের জল রাখতে পারি নে'। পরে এই উপন্যাস নিয়ে সিনেমা করেন দিলীপ রায়। কালকূটের ভূমিকায় অভিনয় করেন শুভেন্দু চ্যাটার্জি। কালকূট এই জনজীবন ও জনপদের কথা নানাভাবে তাঁর এই ধারার রচনায় লিখে গিয়েছেন। কালকূটের লেখা 'কোথায় পাব তারে, কোথায় সে জন আছে, আরব সাগরের জল লোনা, শান্ত আজও' পাঠকের মনে শান্তি আনে।

বিতর্ক ও সমালোচনা

'বিবর', 'প্রজাপতি' ইত্যাদি সমরেশ বসুর আরেক রকমের সৃষ্টি, যা বেশ বিতর্ক তৈরি করেছিল এক সময়ে। লেখক

নিজেকে বারেবারে বদলাবেন এটা স্বাভাবিক, ঠিক যেমন বড়ো নদী চলার পথে বাঁক নেয়। ছয়ের দশকের সামাজিক অবক্ষয়ের কালে এই গোত্রের উপন্যাসগুলো লেখা হয়েছিল, আর তা নিয়ে তর্কবিতর্কও হয়েছিল। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর মুক্তি পায় প্রজাপতি। আর ওই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার শীর্ষ ব্যক্তিত্ব।

২০০ ছোটো গল্প আর ১০০ উপন্যাস

সমরেশ বসু নিজ নামে এবং কালকূট ছদ্মনামে ২০০ ছোটোগল্প এবং ১০০ উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে উত্তরঙ্গ, গঙ্গা, বিবর, প্রজাপতি, দেখি নাই ফিরে, কোথায় পাব তারে, বাঘিনী, স্বীকারোক্তি, অপদার্থ, শাম্ব, শ্রীমতি কাফে, অবশেষে, জবাব, তিন পুরুষ, দাহ প্রভৃতি রয়েছে।

সমরেশের তুলনা সমরেশ

বাংলা কথাসাহিত্যে সমরেশ বসুর তুলনা তিনি নিজেই। 'গঙ্গা' সমরেশ বসু রচিত শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর অন্যতম ধ্রুপদি বাংলা উপন্যাস। আর্থসামাজিক কাহিনির সঙ্গে প্রচুর উপকথা-মিথের ব্যবহার এই উপন্যাসকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এই উপন্যাসটি লেখক তথা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিবেচিত হয়। বিচিত্র বিষয় এবং আঙ্গিকে আমৃত্যু ক্রিয়াশীল ক্ষণজন্মা লেখক সমরেশ বসু ১৯৮৮ সালের ১২ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। লেখক হিসেবে সমরেশ আমৃত্যু যে লড়াই করেছেন তার কোনো তুলনা নেই। মৃত্যুর সময়ও তাঁর লেখার টেবিলে ছিল ১০ বছরের অমানুষিক শ্রমের অসমাপ্ত ফসল শিল্পী রামকিংকর বেইজের জীবনী অবলম্বনে লেখা উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে'। ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা। সঙ্গে ছবি বিকাশ ভট্টাচার্যর। কিন্তু আচমকা তাঁর মৃত্যু হয় বলে এই উপন্যাস শেষ হয়নি।

সমরেশ বসুর নিজের জীবনই আরেক মহাকাব্যিক উপন্যাস। প্রায় ৫ লাখ শব্দের 'চিরসখা' নামের বিশাল উপন্যাসে সেই লড়াইকে স্মরণীয় করে রেখেছেন তাঁরই পুত্র নবকুমার বসু।

পুরস্কার

সমরেশ বসু ১৯৫৯ ও ১৯৮২ সালে পান আনন্দ পুরস্কার। ১৯৮০ সালে পান সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।

শতবর্ষ স্মরণ—

শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা মোহর

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর নাম করণ করেন। আশ্রম কন্যা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার শতবর্ষ শুরু। শিল্পীর জীবন কথা তুলে ধরা হল।

সে দিন ঝড় উঠেছিল বিকেলের দিকে। আশ্রমের গাছপালা মাতালের মতো দুলছিল। মনে হচ্ছিল যেন মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়বে মাটিতে। সেই ঝড় মাথায় করে ছোট্ট মেয়েটি ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে বন্ধুর সঙ্গে আশ্রমের উত্তর প্রান্তে, যেখানে আশ্রমগুরুর বাড়ি। সেই উত্তরায়ণে আম, জাম, গাব কিংবা শাল-শিমুল কুড়োতে। কোন দিকে যে ছুটেছে, বুঝে উঠতে পারেনি। একটা বাড়ি সামনে পেয়েই তার দাওয়ায় গিয়ে উঠেছিল। এমন সময় তার চোখ পড়েছিল বাড়িটার জানালার দিকে। সাদা চুল, সাদা গোঁফ-দাড়ি আর অপূর্ব দু'টি চোখ নিয়ে মানুষটা তাকিয়ে আছেন বাইরে ঝড়ের দিকে। তাঁকে চিনতে মেয়েটির দেরি হয়নি। এঁকে ঘিরেই তো শান্তিনিকেতন আশ্রম! এঁর গানই তো সে গায় সারাক্ষণ। আশ্রমের রাস্তা দিয়ে কত দিন তাঁকে হেঁটে যেতে দেখেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তাঁকে দেখেছে অনেকবার। সবইদূর থেকে। এত কাছ থেকে মানুষটাকে এই প্রথম দেখছে সে। ভয়ে কাঁটা হয়ে গিয়েছিল। হয়তো এবার বকুনি খেতে হবে। তিনি বকেননি। বরং কাছে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'গান জানিস?' সে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানাতেই তিনি বলেছিলেন, 'শোনা দেখি!' মেয়েটি অবলীলায় গেয়ে উঠেছিল তাঁরই একটা গান। মানুষটা মুগ্ধ হয়ে শুনে বলেছিলেন, 'ওরে বাবা, তুই এতটা শিখেছিস!' এর পরে তার পরিচয় জেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'মাঝেমাঝে এসে আমায় গান শুনিয়ে যাস'। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ ও অনিমা মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ ঘটেছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের উত্তরায়ণের 'শ্যামলী' বাড়ির দাওয়ায়। আর সেদিনের অনিমা হলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাছের লোকেদের কাছে তিনি মোহরদি। কণিকা নামটিও দেওয়া রবি ঠাকুরের।

শৈশব থেকে কৈশোর

১৯২৪ সালের ১২ অক্টোবর বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের কর্মী ও মা অনিলা দেবী ছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমজননী। তাঁদের পাঁচ কন্যা ও তিন পুত্রের মধ্যে কণিকা ছিলেন জ্যেষ্ঠ। পিতৃদত্ত নাম অনিমা। বিষ্ণুপুরের মামাবাড়ির যৌথ পরিবারে তাঁর শৈশব কাটে। পরে খুব অল্পবয়সে বাবার কর্মস্থল শান্তিনিকেতনে চলে যান। তখন তাঁকে ভর্তি করা হয় ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে।

১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তার 'অনিমা' নামটি পরিবর্তন করে 'কণিকা' রাখেন। অবশ্য ডাকনাম হিসাবে তিনি ব্যবহার করতেন 'মোহর'। পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই 'মোহর' নামটি বিস্তারিত করে বলেছিলেন 'আকবরী মোহর'।

মঞ্চে প্রথম গান ও তারপর

১৯৩৫ সালেই শিশুশিল্পী হিসাবে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনের শারদোৎসবে একটি অনুষ্ঠানে বালক-বালিকাদের দলে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সেই প্রথম ও শেষ মঞ্চাবতরণ; কারণ সেই অনুষ্ঠানটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের শেষ মঞ্চাভিনয়। ২৪ জুলাই ১৯৪০ সালে বোলপুর টেলিফোন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি 'ওগো তুমি পঞ্চদশী' গানটি গেয়েছিলেন। গানটি তিনি সরাসরি রবীন্দ্রনাথের কাছেই

শেখেন। এই অনুষ্ঠানটি বেতারে সম্প্রচারিত হয়। এটিই কণিকার প্রথম বেতার অনুষ্ঠান।

এরপর ১৯৩৭ সালে প্রথম কলকাতার ছায়া সিনেমা হলে আয়োজিত বর্ষামঙ্গল উৎসবে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে' গানটি গেয়েছিলেন। কলকাতার মঞ্চে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরূপে সেটিই ছিল তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই সময়ে অনেকগুলি গান রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্বয়ং শিখিয়েছিলেন। এই শিল্পী অভিনয় করেছিলেন তাসের দেশ নাটকের দহলানী, ডাকঘর নাটকের সুধা, বিসর্জন নাটকের অপর্ণা ও বশীকরণ নাটকের নিরুপমা চরিত্রে।

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নীহারবিন্দু সেনের কথায় ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সুরে দুটি আধুনিক গান রেকর্ড করেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। গান দুটি ছিল 'ওরে ওই বন্ধ হল দ্বার' ও 'গান নিয়ে মোর খেলা'। সেই বছরেই হিন্দুস্তান রেকর্ড কোম্পানি থেকে তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। এই গ্রামোফোন রেকর্ডের একপিঠে ছিল 'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে' এবং অন্যপিঠে ছিল 'না না না ডাকব না, ডাকব না'।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দুস্তান রেকর্ডের তালিকা পুস্তিকায় লেখা হয় 'কুমারী কণিকা মুখার্জির প্রথম রেকর্ডখানি সকলের তৃপ্তি সাধন করিয়াছে। এবার তাহার আর একখানি রেকর্ড বাহির হইল। এই গান দু'খানি শুনিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিবেন'।

এই গান দুটি ছিল 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' ও 'ওই মালতীলতা দোলে'। পূর্বের রেকর্ড ও এই রেকর্ডের চারখানি গানই রবীন্দ্রনাথের শোনা কণিকার রেকর্ডকৃত গান। জানা যায়, এই গানগুলি শুনে তিনি খুশিই হয়েছিলেন।

কণিকার নিজের কথায়, 'ততদিনে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেন কত সহজ। আজ জানি, তখনই তিনি অন্যদের কাছে কত মহান, কত বিরাট, কত বিশাল, কিন্তু তখন তিনি আমার অতি আপনজন। আমার আবদার করার, আমার নালিশ জানাবার, আমার অভিমান করবার, আমার সমাধান খুঁজে দেবার মানুষ তিনি।'

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় কণিকা ছিলেন শান্তিনিকেতনে। এই সময় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মতো 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি যে বৃন্দদলে গাওয়া হয়, সেই দলে ছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, এই গানটি মৃত্যুর কয়েক বছর আগে রচনা করলেও, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তাঁর মৃত্যুর পরেই প্রকাশিত ও গীত হয়।

এরপর ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, অমিতা সেন, রমা কর প্রমুখ খ্যাতনামা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষকের কাছে গান শিখতে থাকেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যান্য গানের শিক্ষা

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নেন হেমেন্দ্রলাল রায়, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভি ভি ওয়াজেলওয়ার, পি এন চিনচোর ও ধ্রুবতারা জোশির কাছে। ভজন শেখেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও প্রকাশকালী ঘোষালের কাছে। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের পিতা হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শেখেন অতুলপ্রসাদের গান। এছাড়াও কমল দাশগুপ্ত ও ফিরোজা বেগমের কাছে কিছুকাল নজরুলগীতিও শেখেন কণিকা।

কাজের ক্ষেত্র ও নতুন জীবন

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪২ সাল থেকে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েজ'র শিল্পী। ১৯৪৩ সালে তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষিকা হিসাবে যোগদান করেন। এই বছরেই আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পীরূপে তিনি যোগ দেন। পরে বিশ্বভারতীর এমিরেটাস অধ্যাপকও হন।

১৯৪৪ সালে কলকাতায় গীতবিতানসঙ্গীত বিদ্যালয়ের পক্ষ

থেকে নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা মঞ্চস্থ হলে সেই নাটকে অভিনয় করেন। এই অনুষ্ঠানেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে তিনি পরিচিত হন বাঁকুড়ার বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পরের বছর বৈশাখ মাসে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের কর্মী, রবীন্দ্র-বিশারদ ও আত্মকথা বাদে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত সকল গ্রন্থের সহলেখক বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত। ১৯৫৬ সালে এই গানটি তিনি প্রথম রেকর্ড করেন। গানটি তিনি শিখেছিলেন সঙ্গীতচর্চার রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এই গানটি ছাড়াও 'বাজে করুণ সুরে' সহ রবিঠাকুরের বহু গান তাঁর কণ্ঠে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

বিদেশ ভ্রমণ

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৭৪, ১৯৭৮ ও ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা; ১৯৭৬, ১৯৮০ ও ১৯৮৬ সালে ইংল্যান্ড এবং ১৯৮০ সালেই জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড-সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। কিন্তু তাঁর আত্মকথায় তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে বিদেশ-ভ্রমণের কথা সেটি হল বাংলাদেশ। তাঁর কথায়, 'আমি বহুবার বাংলাদেশে গেছি। বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা আমার জীবনে অমূল্য সম্পদের মতো সঞ্চিত হয়ে আছে।' তিনি বাংলাদেশে আসেন ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৮৬ ও ১৯৯৪ সালে।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের একটি চিত্র আঁকা আছে তাঁর আত্মকথায়। পরে তাঁর প্রিয় ছাত্রী ও বিশিষ্ট বাংলাদেশি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার তত্ত্বাবধানে তিনি বাংলাদেশ সফর করেন। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে শেষবার বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন কণিকা।

সুচিত্রা ও কণিকা

সঙ্গীত জগতের আরেক এক প্রবাদপ্রতিম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র ছিলেন তাঁর কৈশোরের বন্ধু। দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, নীলিমা সেন প্রমুখ শিল্পীর সঙ্গেও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সঙ্গীত জগতের পাশাপাশি সাহিত্য জগতেও তাঁর বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ছিলেন অনেকে। সৈয়দ মুজতবা আলি, অবধূত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী, সমরেশ বসু, নিমাই ভট্টাচার্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখের সঙ্গেও ছিল কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহ ভালোবাসার সম্পর্ক।

লাজুক প্রকৃতির

ব্যক্তিজীবনে কণিকা ছিলেন অত্যন্ত লাজুক; সংকোচ ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। অপরিচিত স্থানে গান গাইতে যেতে বেশ ভয় পেতেন তিনি। শোনা যায়, সত্যজিৎ রায় তাঁর কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবির গানে নেপথ্যশিল্পী হিসাবে ওঁর নাম ভেবেছিলেন; কিন্তু কলকাতায় এনে অপরিচিত পরিবেশে তাঁকে দিয়ে রেকর্ড করানোর ঝক্কির কথা মাথায় রেখে সে পরিকল্পনা বাতিল করেন। যদিও সত্যজিৎ রায় ও তাঁর স্ত্রী বিজয়া রায় উভয়েই ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ ও পরমবন্ধু। সত্যজিতের শেষ ছবি আগন্তুক-এ ব্যবহৃত সাঁওতাল নৃত্যের দৃশ্যটি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় তোলা হয়।

শেষ জীবন

১৯৮৪ সালে সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৩ সালে বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ 'মোহর' নামে তাঁর জীবনভিত্তিক একটি তথ্যচিত্র তোলেন। এর প্রযোজক ছিল ফিল্ম মেকার্স কনসর্টিয়াম। তাঁর শেষজীবন কাটে শান্তিনিকেতনে।

অসুস্থতার কারণে শেষদিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘ রোগভোগের পর ২০০০ সালের ৫ এপ্রিল কলকাতাতেই তাঁর জীবনাবসান হয়। রবীন্দ্রসদন চত্বরে শায়িত তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলার সকল ক্ষেত্রের দিকপালরা। পরে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

পুরস্কার

সঙ্গীতজীবনে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন বহু পুরস্কার-সম্মাননা। ১৯৭৩ সালে জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা ছবিতে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে গানটি গেয়ে পান বিএফজেএ পুরস্কার। ১৯৭৮ সালে পান গোল্ডেন ডিস্কইএমআই গ্রুপ। সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার পান ১৯৭৯ সালে।

একইভাবে ১৯৮৬ সালে হন পদ্মশ্রী। ১৯৯৬ সালে পান এশিয়ান পেইন্টস শিরোমণি পুরস্কার। ১৯৯৭ সালে বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম দ্বারা সম্মানিত করা হয় তাঁকে। ১৯৯৮ সালে পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র তাঁকে সম্মান জানায়। ১৯৯৯ সালে পান আলাউদ্দিন পুরস্কার। এছাড়া মৃত্যুর পরে কলকাতার বিখ্যাত সিটিজেন্স পার্কটি তাঁর নামে উৎসর্গিত করা হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লাগোয়া এই সুরম্য বিশাল উদ্যানটির নাম হয়েছে 'মোহরকুঞ্জ'।

বিজয়িনী---

বাধা পেরিয়ে ৩ বিজয়িনীর সাতকাহন

সামাজিক ও পারিবারিক বাধা পেরিয়ে, দীর্ঘ লড়াই করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে তিন বিজয়িনীর সাফল্যের কাহিনি তুলে ধরা হল।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বীণা ফের আন্দোলনে

রেখা কালিন্দী, আফসানা খাতুন, সুনিতা মাহাতো, বীণা কালিন্দী, মুক্তি মাজি, সঙ্গীতা বাউড়ি---এই ছ'টি নাম একসময় গোটা রাজ্যে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। এঁরা সবাই নিজেদের জীবনেই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের পাশে ছিল ওই সময়ের রাজ্য সরকার। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ওই ছয় কন্যার সাহসিকতার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। কারণ, পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে ওই ৬ কন্যা জানিয়েছিল ১৮ বছর বয়স না হলে তারা বিয়ে করবে না। কাজের স্বীকৃতির জন্য বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ওই ৬জনকে মানপত্র দেওয়া হয়েছিল। দেওয়া হয় ঋণও। ৬জনের মধ্যে বীণা কালিন্দী ছিল বয়সে সবচেয়ে ছোটো। একটাসময় বীণা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষেত্রে ইউনিসেফ'র রোল মডেলও হয়ে যান। পান প্রচুর সম্মান, প্রচারের আলো। ভারতের ওই সময়ের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের কাছ থেকে পান পুরস্কারও। সেসব আজ অতীত।

সময়ের নিয়মে ওই সাহসিনীরা আজ ঘোর সংসারী। তার মধ্যে বীণা কালিন্দী এখনো সক্রিয়। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডির ভুরসু গ্রামের মেয়ে। বাবার নাম পরীক্ষিত কালিন্দী। একসময় বীণা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল। রাজ্যের শ্রমদফতর তাকে নিয়ে আসে শিশুশ্রমিক স্কুলে। ওই স্কুলে পড়ার সময় তার বয়স ছিল ১২ বছর। তখন বাড়ির লোক তার বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু পরিবারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বীণা সেদিন জানিয়েছিল সে পড়ালেখা শেষ না করে বিয়ে করবে না। তাঁর এই প্রতিবাদকে কুর্নিশ জানায় সারা রাজ্য। সেটা ছিল ২০১০ সালের ঘটনা। বীণা কথা রেখেছিলেন। ২০২০ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন। যদিও তাঁর আগের বছর বীণা বাঘমুণ্ডির পাট্টার বাসিন্দা দিলীপ কালিন্দীকে বিয়ে করে নেন। বীণার স্বামী একজন পরিযায়ী শ্রমিক। ঝাড়খণ্ডের এক হোটেলে কাজ করেন। ৪ বছরের এক ছেলের মা বীণা এখন বাঘমুণ্ডির বিডিও অফিসে চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেন। কষ্ট করে কোনওমতে সংসার চালিয়ে বীণা এখনও সামাজিক আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেন। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক সময়ের এই রোল মডেল জানান, 'এখনো পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে চলছে বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, ডাইনিপ্রথা। মেয়েদের নিয়ে দল গড়ে ওই সব কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে চাই। তপশিলি তথা আদিবাসীদের জন্য আমাদের কালিন্দী সমাজ রয়েছে। কিন্তু আমি শুধু মেয়েদের নিয়ে গোষ্ঠী গড়তে চাই।' পাশাপাশি বীণা বাপেরবাড়িতে একটা শুয়োরের খামার তৈরি করতে চান। যার মাধ্যমে তাঁর পরিবারের আয় বাড়বে ও সন্তানের লেখাপড়া চালানো যাবে। তার জন্য তিনি সরকারি ও অন্য সংস্থার কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের (পুরুলিয়া জোন) প্রাক্তন রিজিওনাল ম্যানেজার শশাঙ্ক দত্ত বলেন, '২০১২ সালে পুরুলিয়া যুব আবাসে ওই ৬ সাহসিনীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ওদের কাজে মুগ্ধ হয়ে ৬জনের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করে দিই। অনেকের সঙ্গে আমার এখন আর যোগাযোগ নেই তবে বীণার সঙ্গে যোগাযোগ থেকে যায়। ও খুব লড়াই করে পড়ালেখা শিখে নিজে কাজ করছে। ওর কাজের পাশে সবসময় থাকতে চাই।'

স্বাধীনতা সংগ্রামীর মেয়ে নৃত্যশিল্পী সুস্মিতা সমাজের কাজে ব্রতী

সন্দীপ শোঠিয়া ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি জেল খাটেন। তাঁরই মেয়ে সুস্মিতা নন্দী শোঠিয়া। প্রখ্যাত নাচের শিল্পী। প্রায় চার দশক ধরে নাচের জগতে এক উজ্জ্বল নাম। উচ্চাঙ্গ নাচের শিল্পী। তালিম নিয়েছেন ভারতনাট্যম, কত্থক, মণিপুরী ও কথাকলি। একসময় যুক্ত ছিলেন মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার ও মমতাশঙ্করের দলের সঙ্গে। নাচের জন্য ঘুরেছেন ইউরোপের ৯টি দেশ আর দক্ষিণ আমেরিকার ৪টি দেশ। আরব দুনিয়া ও জাপানে অনুষ্ঠান করেছেন, একাধিকবার বাংলাদেশেও পা রেখেছেন।

নিজস্ব ভাবনায় শিল্পচর্চার জন্য ২০১৩ সালে তৈরি করেন নাচের দল 'কলাপি'। সুস্মিতা নানান ধরনের নাচের আঙ্গিকে দক্ষ হলেও সমসাময়িক ক্রিয়েটিভ ড্যান্স নিয়ে কাজ করেন। নানা আঙ্গিকের নাচের নির্যাস নিয়ে নিজস্ব ফর্ম তৈরি করেন। তার পরিবেশনায় যেমন থাকে মৌলিকতা তেমনি থাকে নাচের সব ধরনের রূপ আর রস। কলাপি'র প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্য প্রোডাকশনের মধ্যে রয়েছে শ্রীমতী, বর্ষা, প্রেমে প্রাণে গানে আর চিত্রাঙ্গদা। তাঁর সাম্প্রতিক প্রযোজনা হল 'মুখ মুখোশ ও স্বাধীনতা'। যার মধ্যে চলতি সময়ের রাজনীতির কথা উঠে এসেছে। এই প্রোডাকশনের মূল কাহিনি হল, স্বাধীনচেতা ও সক্রিয় আদিবাসীরা পুলিশের চোখে একদিকে যেমন 'মাওবাদী' আবার উল্টোদিকে আদিবাসীদের চোখে এরকম লোক পুলিশের 'চর' হিসেবে পরিচিত। এমনই এক দোটানায় পড়ে হপন মাণ্ডির জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। মার খেতে খেতে সে একটাসময় উপলব্ধি করে এই স্বাধীনতা আসলে মেকি। কবিতা ও গানের সঙ্গে এই প্রযোজনায় রয়েছে নাচের অসাধারণ কম্পোজিশন। চলতি বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রসদনে এই নাচের অনুষ্ঠানটি হয়। এরপর আরও ৩ জায়গায় হয়। এই ধরনের ভাবনা নিয়ে কাজ করতে গেলে রাজনৈতিক চাপ আসা স্বাভাবিক। নৃত্যগুরু সেই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি কোনো দলের পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু বলিনি। নিজের চোখে দেখা আদিবাসীদের সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।' নাচের গুরু সুস্মিতার অন্য পরিচয় হল তিনি একজন সমাজসেবীও। ১৯৯৮ সাল থেকে সমাজসেবার সঙ্গে জড়িত। কাজ করেন পথশিশুদের জন্য। মহিষবাথানের 'সৃজনশোভা'র মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের নাচ সেখান। এর মধ্যে ২জন তাঁর দলের নিয়মিত শিল্পী। ২০১৭ সাল থেকে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে যদুগোরায় বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষা নিকেতনের আদিবাসী ছেলেমেয়েদের নাচ, গান সেখান। প্রতিমাসে ওই সব আদিবাসী ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষার সরঞ্জাম পৌঁছে দেন। ওই স্কুলে যেমন আবাসিক রয়েছে তেমনি বাইরে থেকেও ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। তারা চারটে ভাষা শেখে- অলচিকি, হিন্দি, ইংরিজি ও বাংলা। নৃত্য শিল্পী সুস্মিতা জানান, 'ছয় আদিবাসী মেয়েকে আমরা কলকাতায় নিয়ে এসে লেখাপড়া শেখাচ্ছি। এরমধ্যে ২জন এবার মাধ্যমিক পাশ করে কলকাতার এক নামি স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বাকি ৪জন নবম শ্রেণিতে পড়ছে। এই প্রথম আদিবাসী মেয়েরা নিজেদের চেনা গণ্ডি ছেড়ে বাইরে এসে লেখাপড়া শিখছে। ক্রিয়েটিভ ড্যান্স শিখছে। আমার লক্ষ্য ওদের মূল স্রোতে নিয়ে আসা।' সুস্মিতা নানা জায়গায় নাচের অনুষ্ঠান করে যে টাকা পান তাই

দিয়ে আদিবাসী মেয়েদের পড়ালেখার খরচ মেটান। তাছাড়া দেশ বিদেশে থাকা তাঁর ছাত্রছাত্রীরাও আর্থিক সাহায্য পাঠান।

বাঁকুড়ার পটশিল্পীদের জীবনে সূর্যোদয় আনেন সংহিতা মিত্র

বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে মায়াময় গ্রাম ভারতপুর। গ্রামের কয়েক ঘর মানুষের জীবন ও জীবিকা পটচিত্র। তারা পটে ছবি এঁকে আর গান গেয়ে জীবন নির্বাহ করে। সবার কাছে এই গ্রাম পটুয়াগ্রাম বলেই পরিচিত। অভাব আর দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে পটশিল্পীরা তাঁদের পূর্বপুরুষের এই পেশা হারিয়ে ফেলতে বসেছিলেন। আর সেখান থেকেই লড়াই শুরু করেছেন বাঁকুড়ার ভূমিকন্যা সংহিতা মিত্র। হারিয়ে যেতে বসা লোকশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে শিল্পীদের পাশে থেকে ১০ বছর ধরে কাজ করে চলেছেন। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া গ্রামের মেয়ে সংহিতা মিত্র। তাঁর বাবা কৃষ্ণদুলাল চ্যাটার্জি ছিলেন শিক্ষক, লোককবি ও লোকসাহিত্যিক। মা তপমালা। সংহিতা ২০০৩ সালে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ থেকে অনার্স নিয়ে বি কম পাশ করেন। ২০০৫ সালে যাদবপুরের এনআইআইটি থেকে ডিজিটাল ভিজুয়াল গ্রাফিক্স ডিজাইন আর ওয়েব ডেভলপমেন্ট নিয়ে স্কলারশিপ করেন। ২০০৫ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত কলকাতার এক বহুজাতিক সফটওয়্যার সংস্থায় টিম লিডারের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর আচমকাই চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসেন। বাঁকুড়ার পটচিত্র বাঁচাতে শিল্পীদের পাশে থেকে কঠিন লড়াই শুরু করেন। কেন এই উদ্যোগ? সংহিতার উত্তর, 'বাঁকুড়া শুশুনিয়া অঞ্চলের ভূমিকন্যা হওয়ার সুবাদে নিজের শিকড়ের প্রতি দায়বদ্ধতা আর লোকশিল্পের প্রতি অমোঘ টান অনুভব করলাম। পটুয়া ভাইদের পাশে থেকে কিছু করার তাগিদে ভালো মাইনের চাকরি ছেড়ে চলে আসি। শুরু হয় একরাশ ঘোর হতাশার অন্ধকার থেকে আশার আলোয় ফিরিয়ে আনার সংগ্রাম।' তাঁর আরো সংযোজন, 'কাজটা যদিও খুব সহজ ছিল না তবে ভালোবাসা দিয়ে বোধহয় অনেক কিছু সহজে হয়ে যায়। তাই করে চলেছি।'

বাঁকুড়ার হারানো পটচিত্র বাঁচাতে ও দুঃস্থ শিল্পীদের স্বার্থে সংহিতা গড়ে তুলেছেন 'লোকসংহিতা ফাউন্ডেশন'। এই কাজের জন্য সংহিতা পেয়েছেন অনেক সম্মান ও পুরস্কার। তার মধ্যে রয়েছে চেতনা লোক সংগ্রহশালা সম্মান (২০২২), ইন্টারন্যাশনাল উইমেন ডে সম্মান (গান্ধী বিচার পরিষদ), এফওএসবিইসিসিআই অ্যানুয়াল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড (২০২২), ইউমেন এন্ত্রেপ্রেনিয়র অফ দ্য ইয়ার (২০২২)। দিল্লির ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন থেকে প্রতি বছর ভারতের ২৪জন মহিলাকে দেওয়া হয় শ্রীশক্তি অ্যাওয়ার্ড। ২০২৪ সালে এই রাজ্য থেকে পুরস্কারটি পেয়েছেন সংহিতা। সরকারি সাহায্য ছাড়াই নিজের উদ্যোগে ও নিজের টাকায় সংহিতা পটশিল্পীদের 'মোটিভেটর' হিসাবে কাজ করে চলেছেন। সংহিতার কথায়, 'বাঁকুড়ার পটচিত্র ঐতিহ্যময়। এখানের কাজের বিশেষত্ব রয়েছে। শিল্পীরা প্রাকৃতিক রঙে কাজ করেন আর তাঁদের শিল্পকলায় নিজেদের জীবন ও সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেন। ভারতপুর গ্রামে ১৫-২০টি পরিবার পটশিল্পের সঙ্গে জড়িত। আমার লক্ষ্য, তাদের পরিবারের সন্তানরাও যাতে বংশ পরম্পরায় এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখে। তার জন্য যাবতীয় চেষ্টা করে চলেছি।' এই সব কর্মকাণ্ড ছাড়াও সংহিতা সাহিত্য জগতের সঙ্গেও জড়িত। দেশে বিদেশে নানা পত্রিকা ও ওয়েব ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে কালি ও কলম, দেশ প্রসঙ্গ, অনুশীলন, মেলা। লেখক সমরেশ মজুমদার তাঁর লেখা উপন্যাস 'আয় সুখ আয়' এই কর্মযোগী সংহিতাকে উৎসর্গ করেন। ওই উপন্যাসে সংহিতা মিত্রের লেখা কবিতারও ব্যবহার করেন সাহিত্যিক।

রক্তের গ্রুপ বিচার করবে মানুষের ব্যক্তিত্ব

মানুষের চরিত্র বড়ই বিচিত্র। একেক জন একেক রকম। কেউ হয়তো গোমড়ামুখো কেউ আবার ভীষণ রসিক। কেউ সারাদিন খাই খাই করে। কেউ আবার খুব বেছে খুঁটে খান। কেউ হয়তো পান থেকে চুন খসলেই রেগে আগুন, কারোর হয়তো মুখে হাসির ফোয়ারা। এমন নানা চরিত্রের, নানা বৈচিত্র্যের মানুষ আমাদের চারপাশে ভিড় করে রয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এমন রকম ফের জানেন? সবই ব্লাড গ্রুপের সৌজন্যে। ব্যাপারটা অবাক করা হলেও আঠারো আনা সত্যি। ব্লাড গ্রুপ বলে দেবে, মানুষটা কেমন। সেই সব অজানা তথ্য দেবে মনোবিদ অভিষেক হংস।

এ পজিটিভ গ্রুপের ব্যক্তিত্ব

এই গ্রুপের মানুষ খুব সংবেদনশীল ও সৃজনশীল। যে কোনো বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পিছপা হয় না। খুব দক্ষ চাকুরে। খুঁতখুঁতে স্বভাবের। এছাড়া খুব শান্ত,পরিচ্ছন্ন স্বভাবের। একইসঙ্গে কিছুটা অমনোযোগীও। নিজেকে সবার সামনে প্রকাশ করতে, মেলে ধরতে একেবারেই ভালোবাসেন না। রুটিন অনুযায়ী কাজ করতে পছন্দ করেন।

বি পজিটিভ গ্রুপের ব্যক্তিত্ব

এই গ্রুপের মানুষ খুব সক্রিয়। মানসিকভাবে শক্ত ও ক্রিয়েটিভ টাইপের। এরা একটু স্বার্থপর গোছের হয়। চট করে দায়িত্ব নিতে চায় না। খুব স্বাধীনচেতা, মেধাবী, নমনীয়, সরল ও দক্ষ। একইসঙ্গে বাস্তববাদীও। পরিকল্পনা না করে এক পাও চলে না। তবে অলস, অগোছালোও।

এ বি পজিটিভ গ্রুপের ব্যক্তিত্ব

এই গ্রুপের মানুষ খুব শান্ত হয়। যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। খুব যুক্তিবাদী। যুক্তি দিয়ে বোঝালে সব বোঝে। তবে এই গ্রুপের মানুষ দায়িত্ব এড়িয়ে চলেন। কিছু ক্ষেত্রে আবার দুর্বোধ্য, ক্ষমাহীন, আবার রক্ষণশীলও। অন্যকে আঘাত করতে চায়।

ও পজিটিভ গ্রুপের ব্যক্তিত্ব : এই গ্রুপের মানুষ খুব আত্মবিশ্বাসী হয়। একইসঙ্গে শক্ত চরিত্রের। খুব তাড়াতাড়ি অন্য লোকের মন বুঝতে পারে। কাজ নিয়ে পড়ে থাকে। পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে। সেইসঙ্গে খুব বাকপটু, বুদ্ধিমান, রোম্যান্টিক হয়।

ও নেগেটিভ গ্রুপের ব্যক্তিত্ব : এই গ্রুপের মানুষ সাধারণত অন্যের মতামতের তোয়াক্কা করে না। সব সময় সমাজে মর্যাদা পেতে চায়। ধনী লোকের সঙ্গ পছন্দ করে। এরা একটু বেশি কথা বলতে পছন্দ করেন।

কোন ব্লাড গ্রুপে কোন রোগ

আপনার অজান্তে আপনারই ব্লাড গ্রুপ ডেকে আনতে পারে অনেক বড় ধরনের অসুখ। শরীরে রোগ বাসা বাঁধার আগেই জেনে নিন কোন ব্লাড গ্রুপে কোন রোগ হতে পারে। সেই বুঝে সাবধান হোন আগেভাগেই।

এ বি : এ বি গ্রুপের মানুষ প্রায়ই হার্টের রোগে ভোগেন। এছাড়া মুখের পেশী বা নার্ভের রোগেও কষ্ট পান। এই গ্রুপের মানুষের হতে পারে স্বরযন্ত্রের সমস্যাও। হারাতে পারে স্মৃতিশক্তি।

ও গ্রুপ : এরা বেশিরভাগ সময় আলসারের সমস্যায় ভোগেন। তবে এই গ্রুপের মানুষের ম্যালেরিয়া বা ক্যান্সার রোগে ভোগার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

বি গ্রুপ : আপনার শরীরে যদি বি গ্রুপের রক্ত থাকে, তাহলে সর্দি কাশিতে ভোগার প্রবণতা বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা নিতে হবে। এই গ্রুপের কমবেশি ১১% মানুষ হার্টের রোগে আক্রান্ত হন।

এ গ্রুপ : এ গ্রুপের মানুষ ক্যান্সারে ভুগতে পারেন। প্রায়ই প্যানক্রিয়াস ক্যান্সার বা লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হতে দেখা যায়। মারণ রোগের পাশাপাশি গুটি বসন্তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।

অল্পবয়সি মেয়েদের মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে

গত ৫ বছরে কলকাতায় এক লাফে অনেকটা বেড়েছে মহিলা ধূমপায়ীর সংখ্যা। চোখে দেখেই বলতে পারেন অনেকে। তবে সমীক্ষাও তেমন বলছে। এক সমীক্ষা বলছে, এ শহরে কমবয়সি মেয়েদের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাস সবচেয়ে বেড়েছে। ১৯.৬% কিশোরী (১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে) দিনে ৫-৬টি সিগারেট খায়। সমবয়সি ছেলেদের ক্ষেত্রে তা ১৫.৭%। মহিলা ধূমপায়ীর সংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমাদের দেশ। এমনই বলছে 'ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল'এ বেরোনো এক সমীক্ষার রিপোর্ট। প্রথম স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর সারা দেশে কলকাতায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ধূমপায়ী রয়েছে। বলছে কেন্দ্রের করা এক সমীক্ষা। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতায় ৪৯% বাসিন্দা ধূমপান করেন। সারা দেশে এই সংখ্যা ৪৩%।

এক সময় বলা হত, মেয়েরা ফ্যাশনের জন্য সিগারেটে টান দেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মূলত বাড়তে থাকা মানসিক ডাক্তারদের মতে, আধুনিক জীবনের চাপেই শহরে বাড়ছে নারী ধূমপায়ীর সংখ্যা। কাজের ক্ষেত্র থেকে শিক্ষাক্ষেত্র, সংসার— সবজায়গায় গতি বাড়ছে। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে মনের ওপর চাপও বাড়ছে। সেই চাপ থেকে মুক্তি পেতে বেড়েছে ধূমপান। তার ওপর অনেকে আবার মনে করেন, ধূমপান কমাতে পারে ওজন। তা আদৌ সত্যি নয়। তবে চেষ্টা ছাড়েন না মেয়েরা। এক নামি ডাক্তারের কথায়, 'রোগীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, মূলত মানসিক চাপের কারণেই গত ৪-৫ বছরে অনেক মেয়ে ধূমপানে আসক্ত হয়েছে। কাজের জায়গা ও ব্যক্তিগত পরিধি, দু'ক্ষেত্রেই চাপ অনেক বাড়ছে। আর একটি বিষয় খেয়াল করেছি, মেয়েরা কাজের জায়গায় গিয়ে অনেক সময়ে মনে করছেন, তাঁরা পুরুষদের থেকে পিছিয়ে পড়বেন যদি ধূমপান না করেন। কারণ, যেকোনো কর্মক্ষেত্রেই পুরুষদের মধ্যে দলবেঁধে ধূমপান করতে যাওয়ার একটি প্রবণতা রয়েছে। তা করতে গিয়ে মেয়েরা আসক্ত হয়ে পড়ছেন। আর ধূমপান ছাড়তে তাঁদের অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে।' ডাক্তারদের বক্তব্য, সব আগে জরুরি সচেতনতা। ধূমপানের অভ্যাস হয়ে গেলে তা ছাড়া যে অনেক কঠিন, তা জানতে হবে। ধূমপান কতটা শারীরিক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে, তা'ও বার বার বলতে হবে।

ধূমপান ছাড়ার ঘরোয়া পদ্ধতি-

যাঁরা চেষ্টা করেও ধূমপান ছাড়তে পারেন না তাঁরা কিন্তু কিছু সহজ ঘরোয়া টোটকা উপায় অবলম্বন করে তা করতেই পারেন। ঘরোয়া পদ্ধতি এই সব উপায়ে দারুণ কাজে আসে। ধূমপান ছাড়তে চাইলে এই সব পন্থা একবার বেছে দেখতে পারেন। দেখে নিন কোন ঘরোয়া উপায়ে ধূমপান ছাড়বেন।

লঙ্কার গুঁড়ো: ধূমপান ছাড়তে চাইলে ১ গ্লাস জলে লঙ্কার

গুঁড়ো মিশিয়ে সেই জল পান করুন। এটা করলে আপনার ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়বে। এই পন্থা বেছে নিলে ধূমপানের কারণে আমাদের ফুসফুসের যে ক্ষতি হয় তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

মুলেঠি: এটিও ধূমপানের নেশা ছাড়তে বেশ সাহায্য করে থাকে। নিয়মিত মুলেঠি খান। এটা খেলে যেমন আর ধূমপান করতে ইচ্ছে করবে না, তেমনই পেটের নানান সমস্যাও দূর হবে।

মুলো: দিন ২বার মুলোর রস খেলে কমে যায় ধূমপান করার ইচ্ছে। এই মুলোর রসে মধু মিশিয়ে খেতে পারেন।

আঙুর: আঙুরের রস আমাদের শরীরের ভেতর জমতে থাকা সব টক্সিক জিনিস বের করে দেয়। এটা আমাদের ফুসফুসের কাজ করার ক্ষমতা বাড়ায়। তেমনই ধূমপান করার ইচ্ছে কমাতে থাকে।

আদা : ধূমপান ছাড়তে চাইলে আদার সাহায্য নিতে পারেন। এতে এমন বেশ কিছু উপাদান আছে যা ধূমপান করার ইচ্ছেটাকে একদম কমিয়ে দেয়।

মধু: মধুতে রয়েছে ভিটামিন, এনজাইম আর প্রোটিন। এটা যেমন আমাদের ধূমপান করার ইচ্ছেকে দমন করে তেমনই এটি আমাদের শরীর থেকে নিকোটিন বের করে দেয়।

ওটস: এটিও ধূমপান করার ইচ্ছা কমায়। রোজ ২ কাপ ফোটানো জলের সঙ্গে ১ চামচ করে ওটস মিশিয়ে সারা রাত রেখে দিন। পরদিন সকালে আবার জলটাকে ফুটিয়ে অল্প অল্প করে খেতে থাকুন যেকোনো খাবারের পর।

ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে মেয়েরা সিগারেট খায়
তনিমা সেন, অভিনেত্রী

অভিনয় জগতে ৭০ থেকে ৭৫% অভিনেত্রী ধূমপায়ী। পাশাপাশি এখন রাস্তাঘাটে দেখছি মধ্য বয়সি থেকে স্কুল কলেজ পড়ুয়া সব শ্রেণির মেয়েরা সিগারেটে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই তো সেদিন মেয়ের সঙ্গে গাড়িতে যেতে যেতে দেখলাম রকে বসে ৩-৪ জন মেয়ে সিগারেট ফুঁকছে। বয়সে ছোটো ছেলেরা আমাকে দেখলে সিগারেট লুকিয়ে ফেলে, আর মেয়েদের মধ্যে প্রবণতা—খাচ্ছি তো কী হয়েছে! অনেকে বলে, টেনশন কমাতে সিগারেট খাই। তখন বলি, যত টেনশন সব তোদের, আমরা এত বছর ধরে অভিনয় আর তার সঙ্গে সংসার করছি আমাদের কোনো টেনশন নেই। অনেক মেয়ে আবার নিজেকে অতি স্মার্ট দেখাতে বা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে সিগারেট বা নেশার ভান করে। কিন্তু ওই কথায় আছে না, অতি চালাকের গলায় দড়ি। নেশা করে যে নিজের আর তার সঙ্গে অন্যদের ক্ষতি করছে তা কে বোঝাবে! তার থেকেও বড়ো কথা ওরা সবাই তথাকথিত শিক্ষিত। কিন্তু সবাই জ্ঞানপাপী। ডিগ্রি থাকলে শিক্ষিত হওয়া যায় না, আসল শিক্ষা ভেতরে থাকে।

শুধু সচেতনতা নয়, চাই কঠোর পদক্ষেপ
ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য,অভিনেতা

আমি প্রায় ৪ দশক ধরে ক্যানসার নিয়ে কাজ করে চলেছি।

নিজস্ব পর্যবেক্ষণে বলতে পারি এই প্রজন্মের মধ্যে সিগারেট খাওয়ার প্রবণতা কমছে। কিন্তু, গুটখা, তেরঙ্গা প্রভৃতি তামাকজাত নেশা দ্রব্যের ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়েছে। ধূমপান তো ক্ষতিকর। তার চেয়েও ওইসব দ্রব্য তামাকজাতীয় দ্রব্য আরো বেশি ক্ষতিকর। চিকিৎসার পাশাপাশি অভিনয় করি, সেখানে দেখছি ৫০-৬০% অল্পবয়সি অভিনেত্রীরা ধূমপানে অভ্যস্ত। আরো দেখেছি তাঁদের মধ্যে সকলের সামনে দেখিয়ে খাওয়ার প্রবণতা বেশি। অনেকের ধারণা, ধূমপান ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। ধূমপান বা তামাকের ক্ষতিকর দিক আমরা সবাই জানি। যাঁরা এইসবে অভ্যস্ত তাঁরা এসবের পক্ষে নানা কুযুক্তি দেখান। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই ধূমপায়ীদের মধ্যে ক্যানসারের হার অনেক বেশি। এসবের বিরুদ্ধে অনেক প্রচার হয়েছে কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। কী করে হবে? একদিকে বলা হচ্ছে এসব ক্ষতিকর। অন্যদিকে দেদার বিক্রি হচ্ছে। এসবের থেকে সরকারের অনেক রাজস্ব আদায় হয়। ফলে আর সচেতনতা নয়, চাই কঠোর পদক্ষেপ। আইন করে নিষিদ্ধ করা। আইন ভাঙলে কঠোর শাস্তি দাও।

স্বাধীনতার ইতিবৃত্তান্ত—

দেশের মানুষের স্বার্থে অস্ত্র ঘুরিয়েছিলেন গোপাল পাঁঠা

মধুমিতা দাস

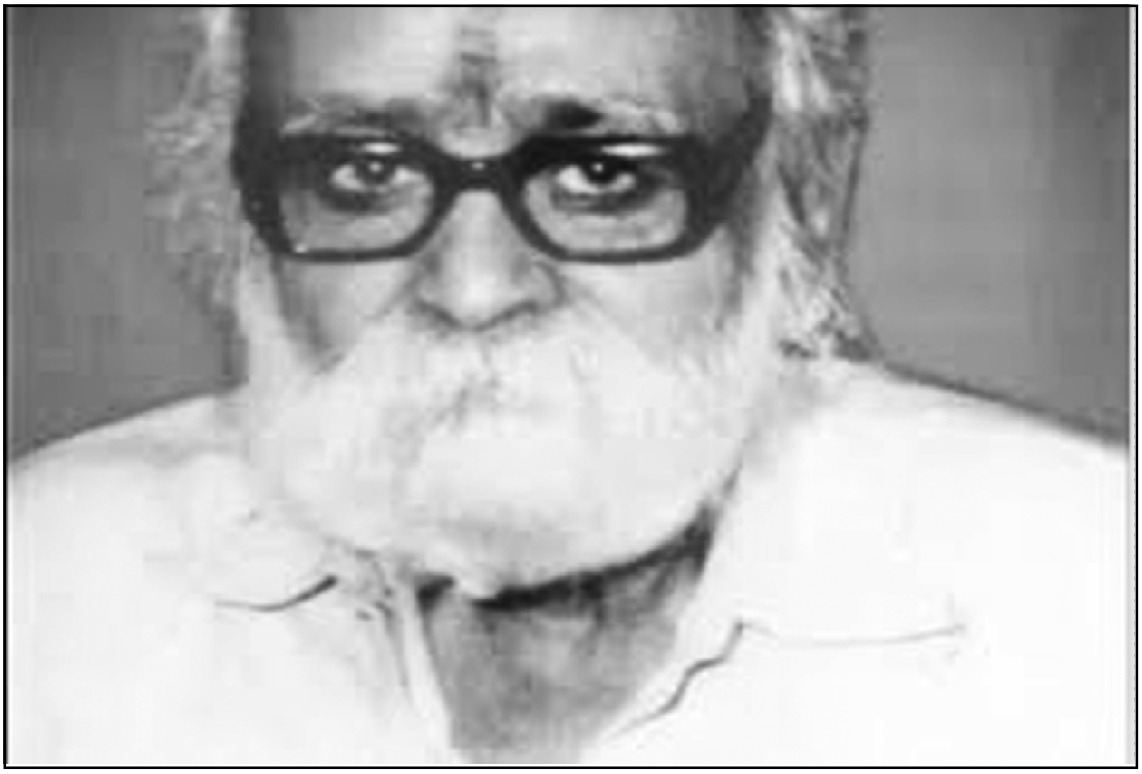

স্বাধীনতার ইতিহাস পড়তে বসলে অনেক বিপ্লবী, সংগ্রামীদের কথা জানতে পারি। তবে এঁরা ছাড়াও এমন অনেক সাধারণ মানুষ রয়েছেন যাঁরা দেশের জন্য পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে অনেক কিছু করেছেন। তাঁদের এই অবদানের জন্যই ভারতের ইতিহাসটা আজ এমন হয়েছে। নাহলে হয়তো ইতিহাসের প্রেক্ষাপট আলাদাই হত। তাঁদেরকে বা তাঁদের এই কাজকে আমরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যেতে বসেছি। আজকের গল্প এমনই একজনকে নিয়ে। যাঁর নাম গোপাল মুখার্জি বা গোপাল পাঁঠা বা বীর গোপাল। ঠিক সময়ে এই গোপাল না থাকলে এই পশ্চিমবঙ্গে কী যে হতে পারত তা ধারণারও বাইরে। হতে পারত এই রাজ্য বাংলাদেশের বা এই পশ্চিমবঙ্গই হয়তো থাকতো না।

পারিবারিক সম্পত্তি পাঁঠার মাংসের দোকানের সূত্রে গোপাল পাঁঠা নামটি পাওয়া। আদতে গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন বৌবাজারের মলঙ্গা লেনের বাসিন্দা। বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এই ভ্রাতুষ্পুত্রটি বিধান রায় ও সুভাষচন্দ্র বসু উভয়েরই অনুরাগী ছিলেন, যদিও কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নিয়ে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। যেমন জোর দিয়ে বলা যায় না যে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট গোপাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সংগঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ভূমিকার মধ্যে কতদূর সাম্প্রদায়িকতা ছিল, আর কতটা ছিল এলাকাগত রক্ষণের উপাদান। ১৯৪৬-১৯৪৭ সালের দাঙ্গায় ব্যবহার হওয়া পয়েন্ট ২৪ বোরের রিভলভারগুলো গোপাল মুখোপাধ্যায় জোগাড় করেছিলেন ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় ঘাঁটিগাড়া মার্কিন সৈন্যদের কাছ থেকে। তাঁর

কথায়, এক বোতল হুইস্কি বা সামান্য কিছু টাকার মূল্যে এই জাতীয় অস্ত্র সে আমলের কলকাতায় দিব্যি সুলভ ছিল। আর চল্লিশের দশকের কলকাতার রাজপথে অহরহ সংঘর্ষে ও রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলে এই অস্ত্র মজুত ছিল নেহাতই স্বাভাবিক প্রবণতা। তাছাড়া সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা' বইটিতে লিখেছেন, ব্যবসায়িক কারণেই গোপাল মুখোপাধ্যায়কে অনেক মুসলমান ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত। সোজা কথায়, আঁকাড়া মুসলমানবিদ্বেষী হিসেবে কোনও জনপরিচিতি তাঁর ছিল না।

রাজনৈতিক হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির বিভিন্ন বয়ানের উপাদান জোগানোর ক্ষেত্রে কলকাতায় ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও 'গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং'-এর গুরুত্ব ও কদর দুইই প্রচুর ছিল। ১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মে ক্যাবিনেট মিশন ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে ভারতীয় নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব নিয়ে ভারত সফরে আসে। এই উপলক্ষে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ নেতৃত্বের মধ্যে একটি সাময়িক সমঝোতা হলেও সে সমঝোতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তার কারণ দু'পক্ষের পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাস। এখানে উল্লেখযোগ্য, ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালের ১৬ মে তারিখে ভারতের স্বাধীনতার যে প্রস্তাবটি পেশ করে সেখানে কিন্তু ঐকবদ্ধ ভারতবর্ষের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ আর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো আলাদাভাবে বিন্যস্ত হবে। আর পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। এই হিন্দু আর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে আলাদা করার বিষয়টি কংগ্রেসী নেতৃত্বের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়, কারণ তাঁরা এর মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারে ও ভবিষ্যতের ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য হারানোর ভূত দেখতে পান। কংগ্রেস ও লিগ দু'পক্ষের অনড় অবস্থানের সামনে পড়ে ক্যাবিনেট মিশন ১৬ জুন দ্বিতীয় আরেকটি পরিকল্পনা ঝুলি থেকে বার করে। যেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষকে সরাসরি ভাগ করার কথা বলা হয়। আগের প্রস্তাবটিতে কংগ্রেসী নেতৃত্ব 'খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না' গোছের একটি অবস্থান নিয়েছিল, জুন মাসের প্রস্তাবে তারা সরাসরি বেঁকে বসে। ১০ জুন একটি বক্তৃতায় নেহরু সাফ জানিয়ে দেন, একমাত্র সংবিধান সভায় যোগ দেওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আর এই প্রেক্ষাপটেই আসে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের 'ডায়ারেক্ট অ্যাকশন ডে' বা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'র উদ্দেশ্য ছিল নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের দাবির স্বপক্ষে ঔপনিবেশিক সরকারের সামনে শক্তিপ্রদর্শন। তবে ছেচল্লিশের দাঙ্গা বিষয়ে 'মুসলিম লিগের আক্রমণ' ও সাধারণ হিন্দু জনতার প্রতিরোধের ছকটি বহু আগেই প্রচার হয়ে যায়। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কর্মসূচি সম্পর্কে জিন্না সাহেবের আবেদনটি যথেষ্টই মারমুখী ছিল সন্দেহ নেই, তবে একথা ভাবাটা ঠিক হবে না যে অপরপক্ষের তরফে কোনও প্রস্তুতি ছিল না। ইতিহাসবিদ জয়া চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গল ডিভাইডেড' বইতে লিখেছেন, আগস্ট মাসের ১৬ তারিখ মুসলিম লিগের সদস্যদের মতোই হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবকরাও লড়াইয়ের জন্য তৈরি ছিলেন, তাঁদের অস্ত্র ছিল মূলত ছোরা আর দিশি পিস্তল। যুগান্তর দলের বিপ্লবী ও পরে বামপন্থী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মকথা 'বিপ্লবের সন্ধানে'তে লিখেছেন, "লিগ থেকে যখন ১৬ আগস্ট হরতাল ঘোষণা করা হল, তখন হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস মিলে ১৪ আগস্ট দেশপ্রিয় পার্কে এক বিরাট সভা করে এক প্রস্তাব পাশ করে। এ হরতাল কিছুতেই সফল হতে দেওয়া যাবে না, ১৬ আগস্ট হরতাল উপলক্ষে যে দাঙ্গার সম্ভাবনা ষোল আনা, এটা সকলেই অনুভব করতে লাগল এবং দুই পক্ষই তার জন্য প্রস্তুত হল"। বস্তুত তিরিশের দশক থেকেই বাংলার নির্বাচনি রাজনীতিতে মুসলমানদের গুরুত্ব বাড়ছিল। তাছাড়া ১৯৪০ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার আমলে প্রকাশিত ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পক্ষে জোরালো সওয়াল করা হলে জমিদারি নির্ভর হিন্দু বাঙালি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজে আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে আসে। এই দু'টি বিষয়কে

কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতিতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার প্রকট ও প্রচ্ছন্ন যুক্তফ্রন্ট বেশ জমে উঠেছিল। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় এরই একটি সংগঠিত চেহারা দেখা যায়।

১৯৪৬-এর দাঙ্গায় মৃত কয়েকটি শরীরকে ঠেলায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সৎকারের জন্য। জয়া চট্টোপাধ্যায় তাঁর বইয়ের আরেক জায়গায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে লিখেছেন যে, যেখানে মুসলমান দাঙ্গাকারীদের বেশিরভাগ ছিলেন গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষজন, সেখানে দাঙ্গায় অংশ নেওয়া হিন্দু জনতার মধ্যে একটা বড়ো অংশ ছিল শিক্ষিত তরুণ, ছাত্র সমাজ ও মধ্যবিত্ত পেশাজীবী। আসলে ১৯৩১ সাল নাগাদই শহর কলকাতায় বসবাসকারীদের ৩১.৭০ শতাংশ আসছে ভিন রাজ্যগুলো থেকে, আর ৩০ শতাংশ আসছে কলকাতার বাইরের জেলাগুলো থেকে। মূলত কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলের কলকারখানাগুলোতে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য গ্রাম থেকে আগত এই জনগোষ্ঠীর শহরবাসের রোজনামচা যে খুব একটা সহজ ও সুখকর ছিল না সেকথা বলাইবাহুল্য। স্বাভাবিকভাবেই ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক সত্তার শেকড় এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্টই মজবুত ছিল। ছেচল্লিশ ও তার পরেও মুসলমান শ্রমিক, কষাই, খালাসি বা ছ্যাকরা গাড়ির চালকদের শহরের রাজপথে দাঙ্গাকারীর ভূমিকায় দেখা গেছে, কিন্তু ছেচল্লিশের দাঙ্গায় হিন্দু মহাসভার তরফে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভূমিকা এব্যাপারে আলাদা ভাবনার খোরাক জোগায়।

তাছাড়া ১৯৪৬ সালের ১৬-১৯ আগস্টের দাঙ্গা চলাকালীন অবিভক্ত বাংলায় ক্ষমতাসীন সুরাওয়ার্দি সরকারের সাম্প্রদায়িক ভূমিকা নিয়ে নানা সময় বিস্তর কথা তোলা হয়েছে। তার মধ্যে যথার্থও নিশ্চয়ই খানিকটা আছে। কিন্তু কোনো আড়াআড়ি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের দিক থেকে যদি সরকারের ভূমিকাকে বিচার করতেই হয় তাহলে একথাও মাথায় রাখতে হবে যে সে সময়ে ৬০ লাখ মানুষের কলকাতা শহরে মাত্র ১২০০ সদস্যের একটি পুলিশবাহিনী ছিল, যে বাহিনীতে মাত্র ৬৩ জন ছিলেন ধর্মে মুসলমান। আর অফিসারদের মধ্যে একজন ডেপুটি কমিশনার ও একজন ওসি ছাড়া সকলেই ছিলেন হিন্দু। আর যদি লাশ গোনার হিসেব করতে চাওয়া হয় তাহলে জেনে রাখা ভালো যে সুরঞ্জন দাশ সহ ছেচল্লিশের দাঙ্গা নিয়ে গবেষণা আছে এমন সব ইতিহাসবিদই একটি বিষয়ে মোটামুটি একমত। তা হল এই দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের ঢের বেশি। এর কারণটি কিন্তু খুব জটিল নয়। ধনী হিন্দু ও ধনী মুসলমানদের পক্ষে পিঠ বাঁচানো অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল (ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল), কিন্তু সামাজিক ও অন্য ধরনের নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত গরিব মানুষের পক্ষে তা সহজ ছিল না। আর ১৯৪৬ সালের কলকাতায় বসবাসকারী অধিকাংশ মুসলমানই ছিলেন দরিদ্র শ্রেণির।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের ভোরে পাকিস্তান তৈরির জন্য মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলে শহর কলকাতা জুড়ে শুরু হয়ে যায় হিন্দু গণহত্যা। নেহেরু তখন দিল্লিতে অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী। আর অখণ্ড বাংলার শাসনের দায়িত্ব পেয়েছিল মুসলিম লিগ এবং মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুরাবর্দি।

সুরাবর্দির নির্দেশেই কলকাতায় শুরু হয় এই হিন্দু গণহত্যা। কলকাতায় ছিল মহড়া, আর পুরো উদ্দেশ্যটি কার্যকর করা হয় নোয়াখালিতে।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের সকালে মুসলিম লিগ যখন অ্যাকশন শুরু করে, তখনও পর্যন্ত কলকাতার হিন্দুরা বিষয়টা বুঝে উঠতে পারেনি। কারণ, ওই দিন বিকেলে কলকাতার তথাকথিত প্রগতিশীল 'ধর্মনিরপেক্ষ' হিন্দুরা ময়দানে মনুমেন্টের তলায় মুসলিম লিগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ মিটিং শুনতে গিয়েছিল।

তখন অনেক নেতার মুখে শোনা গিয়েছিল, 'আগে পাকিস্তান দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে'।

ওইদিনই বিকেলে মিটিং থেকে ফেরার পথে মুসলিম লিগের গুন্ডাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ধর্মতলায় হিন্দু জনসাধারণ ও হিন্দুদের দোকানের ওপর।

১৯৪৬ সালের ১৬, ১৭, ১৮ আগস্ট তিন দিন ধরে সারা কলকাতা জুড়ে চলল মুসলিম লিগের পরিকল্পিত গণহত্যা। সুরাবর্দি লালবাজার কন্ট্রোল রুমে বসে নিষ্ক্রিয় করে রাখলেন পুলিশকে। এই সুযোগে কলকাতায় তাণ্ডব

চালাল নিউ মার্কেট এলাকার বোম্বাইয়া, কর্ণওয়ালিশ বস্তির মিনা পাঞ্জাবি ও হ্যারিসন রোডের মুন্না চৌধুরীর মতো মুসলিম লিগের গুন্ডারা।

এই দাঙ্গার বিষয়ে ইংরেজি দৈনিক 'দ্য স্টেটসম্যান' লিখল, 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং', অন্যান্যরা লিখল, 'উইক অফ লং নাইভস'।

'ইনস্টিটিউট অফ কারেন্ট ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স' -এর প্রধান ওয়াল্টার রজার্সকে লিখলেন, "ভারতের বৃহত্তম এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরটা (কলকাতা) যেন লিপ্ত রয়েছে নিজেকে নরখাদকে পরিণত করতে। শহরের সমস্ত রাস্তার দোকানগুলির একটিরও দেওয়াল বা দরজা আস্ত নেই। লুঠ হয়েছে সব দোকান। গুন্ডারা যেসগুলোকে লুঠ করতে পারেনি, সেগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রাস্তায়। আর চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের লাশ। টাটকা লাশ, গরমে পচা লাশ, অঙ্গহীন লাশ, থেঁতলে যাওয়া লাশ, ঠেলা গাড়িতে জড়ো করা লাশ, নর্দমায় লাশ, খালি জায়গায় গাদা হয়ে থাকা লাশ, শুধু লাশ আর লাশ।

শুধু ৩৫০০ লাশ সংগ্রহ করে গোনা হয়েছে, আর কত লাশ যে হুগলি নদীতে ভেসে গেছে, কত হাইড্রেনে আটকে আছে, কত লাশ যে ১২০০ জায়গায় দাঙ্গার আগুনে পুড়ে গেছে, কত লাশ যে তাদের আত্মীয়রা তুলে নিয়ে গিয়ে সৎকার করেছে, এর সংখ্যা বলতে পারবে না কেউই।" তিন দিন পর শহরে সেনা নামানো হয়। ৭,০০০ থেকে ১০, ০০০ লোক এই দাঙ্গায় খুন হয়েছে বলে সেনাবাহিনীর অনুমান।

ঠিক ওই সময় মুসলিম লিগের গুন্ডাবাহিনীর হাত থেকে হিন্দুদের বাঁচাতে এগিয়ে এলেন কলকাতা বৌবাজারের এক ডাকসাইটে হিন্দু যুবক কুস্তিগীর গোপাল মুখোপাধ্যায়। পরিচয় বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্নে। কলকাতা বৌবাজারের মলঙ্গা লেনে ১৯১৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর গোপালের জন্ম।

কলকাতায় তাঁদের একটি বুচার শপ অর্থাৎ পাঁঠা কাটার পারিবারিক দোকান ছিল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের উল্টোদিকে কলেজস্ট্রিটে সে দোকান এখনো রয়েছে, নাম- 'অনুকূল মুখার্জির পাঁঠা কাটার দোকান'। পাঁঠা কাটার এই পারিবারিক ব্যবসার সূত্রে লোকমুখে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাম হয়ে যায় 'গোপাল পাঁঠা'। হিন্দুদের বাঁচাতে গোপাল জোগাড় করলেন ২৪ পয়েন্ট বোরের রাইফেল এবং সেগুলি জোগাড় হল ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা মার্কিন সৈন্যদের কাছ থেকে। এক বোতল হুইস্কি কিংবা সামান্য কিছু টাকা দিলেই তখন সেগুলো পাওয়া যেত।

ছোটো থেকেই গোপালের আদর্শ ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী' নামে একটি ছোট্ট সংগঠন পরিচালনা করতেন গোপাল। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন যুগলকিশোর ঘোষ, কলকাতায় বসবাসকারী শিখ ও গোয়ালা সম্প্রদায়ের মানুষজন এবং সঙ্গে ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থন। গোপালের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

গোপাল পাঁঠার নেতৃত্বে মারমুখী হিন্দুরা এবার পাল্টা মার দিতে শুরু করল। মার খেতে লাগল মুসলিম লিগের দলবল। তখন সুরাবর্দি ইংরেজ সরকারকে অনুরোধ করে সেনা নামালেন। অমনি হাজির হলেন গান্ধী। গোপালকে বললেন, তাঁর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করতে।গোপাল জানিয়ে দিলেন, যতক্ষণ পযর্ন্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি একটি সূচ বা পেরেকও দেবেন না। দরকার হলে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পায়ে তাঁর অস্ত্র সমর্পণ করবেন, কিন্তু গান্ধীর কাছে নয়। অবস্থা বেগতিক দেখে এরপর মুসলিম লিগের ছাত্র সংগঠনের প্রধান জিজি আজমিরি এবং মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য শেখ মুজিবর রহমান (পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) হাতজোড় করে এই আক্রমণ বন্ধ করতে কাতর অনুরোধ জানালে গোপাল পাঁঠা থামেন। গোপাল একদিনেই আটশো হিন্দু ও শিখ যুবককে সঙ্গে নিয়ে পাল্টা মার দিয়েছিলেন।

শেষ জীবনে গোপাল একজন সমাজকর্মী হিসেবে 'ন্যাশনাল রিলিফ সেন্টার অফ ডেসটিটিউটস' নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালাতেন। এলাকায় বিশাল আকারে শুরু করেছিলেন কালীপুজো। বহু বিশিষ্টজনরা এই কালীপুজোয় এসেছেন। ২০০৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এই বীর গোপাল পাঁঠার মৃত্যু হয়।

বিশেষ আকর্ষণ —

কলকাতার রবিনহুড ফাটা কেষ্ট

কমার্শিয়াল সিনেমার মতো ছিল কলকাতার ফাটা কেস্টর জীবনের চিত্রনাট্য। শোনাচ্ছেন স্বনাম গুপ্ত।

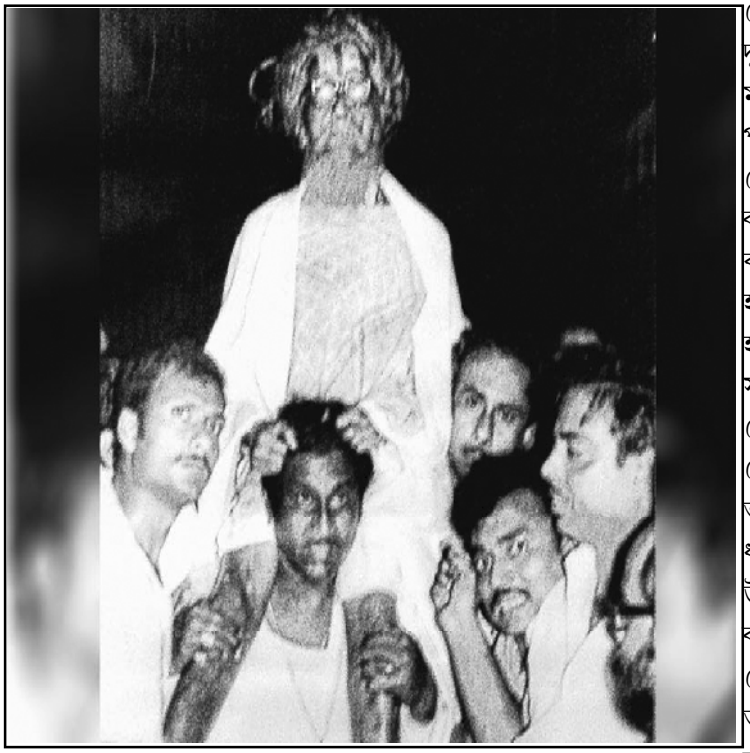

ওঙ্কার নাথকে ঘাড়ে নিয়ে ফাটা কেষ্ট

'মারব এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে' এই মারকাটারি সংলাপ এমএলএ ফাটা কেষ্ট সিনেমায় শোনা যায় অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর মুখে। এই সিনেমার দৌলতে ফাটা কেষ্ট নামটা নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত হলেও এক সময় কলকাতার রবিনহুড ছিলেন ফাটা কেষ্ট। আজও কলকাতায় তাঁর নামে কালীপুজো বিখ্যাত।

কে ছিলেন এই ফাটা কেষ্ট?

ভালো নাম কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত। কলেজ স্ট্রিট মোড়ে বাবার পানের দোকানে বসত কেষ্ট। ছোটোবেলা থেকেই কালীভক্ত। শনি-মঙ্গলবার ঠায় ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আরতি দেখত। শরীরচর্চার খুব শখ। বেঁটেখাটো চেহারা আর মুখে বসন্তের দাগ নিয়ে ছেলেটা মনোহর আইচের আখড়ায় ডাম্বেল আর মুগুর ভেজে ফেরে, হাতে তার শস্তার পাউরুটি আর পাঠার মাথা। আমহার্স্ট স্ট্রিটের নীলকণ্ঠ কেবিনে সেদ্ধ করে গোগ্রাসে ভক্ষণ। যেদিন না জোটে, সেদিন দুধে কাঁচা ডিম দিয়ে চুমুক। শরীরটাকে মন্দিরের মতো করে গড়তে চাইত কেষ্ট। পাড়ার আড্ডায় কখনো হাতের, কখনো কাঁধের পেশি ফুলিয়ে দেখাত সে। কেউ উপহাস করত, কেউ বা ভক্ত হতে লাগল। দোকানে বসার ফাঁকে প্রায়ই সে লোকাল নেতা হরেনদার সঙ্গে কংগ্রেসের মিছিলে যেত। হরেনদা বুঝিয়েছিল, নকশালদের আতঙ্কে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন। মাঝে মাঝে সে গুলে, পচাদের সঙ্গে যেত নিলাম দেখতে- কোথাও পুরোনো আসবাব, পুরোনো বাড়ি-ভাঙা লোহা, অথবা সম্পত্তির নিলাম। ধারেভারে কেটে তাদের গোষ্ঠী যেদিন বিড উইন করত, ১০-১৫ টাকা হাতেও পেত কেষ্ট। বাবার পানের দোকানে মন টিকছিল না আর, লেখাপড়াও কোনওদিনই ভাল লাগত না। তাই স্কুল-কলেজও তার সঙ্গ ছেড়েছিল। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত কাঁপা হাতে বাংলায় চেক সই করত। লড়াকু চরিত্র হওয়ায় সাগরেদের পাশাপাশি শত্রুও তৈরি হয়েছিল অনেক। তাদের কল্যাণেই জীবনটা ঘুরে যায় অন্য পথে।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট লাগোয়া নরসিংহ দত্ত লেনে তার বাড়ির কাছেই ওত পেতে ছিল পাড়ারই এক নম্বর দুশমন নকুল, সঙ্গে বরানগরের কুখ্যাত মাস্তান নিলু আর তার সুকৌশলে ধরা ছুরিটা। হার মানেনি কেষ্ট। ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েও ক্ষিপ্র বাঘের মতো লড়ে যায় সে, ছিটকে দেয় দুই প্রতিপক্ষকে। কয়েকটা ছুরির কোপই শুধু তাকে আঘাত করেছিল তা নয়, আঘাত করেছিল তার নামটাকেও। তাই মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে এলে তার নাম হয় 'ফাটাকেষ্ট'।

নকশাল দমন, নিলামের কারবার, লোকাল দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা একের পর এক 'সাফল্যের পালক' তার মুকুটে জুড়তে লাগল। নকশালদের বাড়িতে ঢুকে তুলে আনা, জালকাঠি, বারুদ, গন্ধক সহযোগে বানানো কেষ্টর ওয়ার্কশপের পেটোর শব্দ বিরোধীদের কানে আর বুকে একসঙ্গে বাজতে

থাকে। গৌরীবাড়ি, চালতাবাগান, হৃষিকেশ পার্কে প্রায়ই চলত সংঘর্ষ। এভাবেই একদিন প্রধান সাগরেদ হিসেবে জুটে যায় গোয়াবাগানের চিনে বাগ্গা। মুঙ্গের থেকে আনা সিক্স-শটার আর দেশি পাইপগান দিয়ে চিনে কেষ্ট-বাহিনীর দাপট বাড়িয়ে তোলে। রোজগারের ধান্দা শুরু হতে মনে পড়ে যায় অকশনের কথা। সেই নিলাম মানে হাওড়া লিলুয়ায় রেলের মধ্য-উত্তর কলকাতার যা কিছু সরকারি অথবা ব্যাঙ্কের নিলাম হবে, সেখানে ফাটাকেষ্ট আর তার দলের থেকে নীচে কেউ বিড করতে পারবে না। যদি করে আর জিতেও যায় তার কানের গোড়ায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে তুলে আনা হবে অথবা ছেলেমেয়ের স্কুলের সামনে লোক পৌঁছে যাবে। কিছু কেসে আগেই মেশিন দেখিয়ে ঢুকতেই দেওয়া হবে না। যেখানে মধু থাকে সেখানেই মৌমাছির ভিড়। তাই আরো বাহুবলীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে কেষ্ট। আগরপাড়া-সোদপুর থেকে যোগ দিয়েছিল ইনু মিত্র, আসত রাম চ্যাটার্জি। তবে সবসময় খুব সহজ হত না, কোথাও কোথাও থামতে হত তাকে। পটলডাঙার ঋষি যেখানেই যেত, কেষ্টকে বিড করতে দিত না। দু'জনের মধ্যে প্রবল লড়াই। পরে পুলিশ অফিসার রুনু গুহনিয়োগীর হাতে এনকাউন্টারে মারা পড়ে ঋষি। পরবর্তীকালে ঝামেলা এড়াতে বিডাররা চুক্তি করে ফাটাকেষ্টর টিম আর কোনও অকশনে যাবে না। পরিবর্তে পৌঁছে যাবে তার ভাগের তিন পার্সেন্ট। শুধু ব্যবসার সুবিধা নয়, সঙ্গে অন্য সমাজবিরোধী যারা নিলামের সময় দাদাগিরি করে তাদের হাত থেকেও বাঁচাবে কেষ্ট। বাগমারিতে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার জন্য তিনটি ছেলেকে মানিকতলা থেকে দৌড় করিয়ে রাজাবাজারের খোলা রাস্তায় চপার মারে কেষ্ট, দলবল নিয়ে। রাইটার্স থেকে ফোন আসে লোকাল কংগ্রেস নেতার কাছে। লালবাজার থেকে আরেকটা ফোন যায় থানায় 'কেষ্টকে চাই'। ওকে সামনে রেখেই চলুক পুলিশি অপারেশন। আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

ফাটাকেষ্টর বিখ্যাত কালীপুজো

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে ১৯৫৫ সালে কেষ্ট যে কালীপুজো শুরু করে, মনোমালিন্যের কারণে তা সরিয়ে আনে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে। এক-দেড় দশকেই কালীভক্ত ফাটাকেষ্টর পুজো পৌঁছে যায় অন্য উচ্চতায়। বিশাল মূর্তি, ভক্তিতে গদগদ ভক্ত, রুপোর বাসন, ভারী সোনার অলংকার, মেলার জাঁকজমক, সৌন্দর্য ও অলৌকিকতার এক অব্যর্থ ককটেল তৈরি করে ফাটাকেষ্ট। কলেজ স্ট্রিট বাটা থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিট অবধি গোটা কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট আলোয় মুড়ে ফেলা হত, ঝাড়বাতি আর পাখা মাথার ওপর। কাকে দিয়ে কোন কাজটা হবে এটা খুব ভালো বুঝত কেষ্ট। অন্নকূটের পুরো দায়িত্ব ছিল তার নিজের। পুজো কমিটির অজিত ঘোষরা ছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী অজিত পাঁজার সহচর। তাই পুজোর উজ্জ্বলতাও বাড়ছিল। কর্পোরেট স্পন্সর ছাড়াই এই পুজোর ব্র্যান্ড 'ফাটাকেষ্ট' হওয়ার কারণ ছিল।

বাহুবলীর পাশাপাশি অন্য ইমেজ

বাহুবলী-কাম-রক্ষাকর্তা দু'টো ইমেজই জনমানসে প্রভাব ফেলেছিল প্রবল। যে ফাটাকেষ্ট বোমা-গুলি আর কবজির জোরে লড়ে সেই আবার নাইট-শো ফেরত পাড়ার মেয়ে-বৌদের নিরাপত্তার খেয়াল রাখে। কেষ্টদার কড়া নির্দেশ, বীণা-জহর-পূরবী-অরুণায় নাইট-শো ভাঙা অবধি ছেলেরা পাহারায় থাকবে। সেরকমই এক রাতে পূরবীতে সিনেমা দেখে ফিরছিল মিত্তির বাড়ির দুই বৌমা, সেজ মেয়ে নন্দিনী আর ছোটো ছেলে তপন। ওই বাড়িরই ছেলে খোকা আবার কেষ্টর সহচর, যদিও ওই নারীদের মধ্যে কেষ্ট সম্পর্কে অশ্রদ্ধাই ছিল। পার্কের সামনে আলোটা কম। সেখানেই রিপন কলেজ হস্টেলের কয়েকটি ছেলে নন্দিনীকে টিজ করে। তপন প্রতিবাদ করে বলে, তোমরা এক্ষুনি চলে যাও, কেষ্টদা জানতে পারলে কিন্তু খুব খারাপ হবে। চারজনের একজন বলে ওঠে, কে তোদের নাটা কেষ্ট, আসুক না, আমরাও হস্টেলের ছেলে। বিরক্ত নন্দিনী বলেন, কয়েকটা লোফারকে আটকাতে কোনও গুণ্ডার প্রয়োজন নেই। তখন ছেলেগুলো এসে অসভ্যতা করতে গেলে তপন চিৎকার করে কেষ্টর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে যায়। একটা সাদা অ্যাম্বাসেডর এসে দাঁড়ায় হ্যারিসন রোড ক্রসিংয়ে। দু'জন পালিয়ে যায়, বাকি দু'জন খালি গায়ে রিক্সা টানে। রিক্সায় বসে 'ফাটা'র ছেলেরা বলতে থাকে, মেয়েরা মায়ের জাত, সম্মান না করলে মা কালী পাপ দেবে। পরেরদিন নন্দিনীর সঙ্গে দেখা হলে ফাটাকেষ্ট বলে, আমি গুণ্ডা হতে পারি, ভিলেন নই।

প্রেমের কেষ্ট

এরপর বরফ কিন্তু সহজে গলেনি। রাস্তাঘাটে দু'জনে দু'জনকে দেখেও না-দেখার ভান করে আকর্ষণটা বাড়িয়ে তুলেছিল। টিজ করা বা প্রণয় প্রস্তাব তো দূর, এলাকার যুবকরা নন্দিনীকে এড়িয়ে চলত কেষ্টর ভয়ে। ভালোবাসার কথা জানাতে বিশ্বকর্মা পুজোকে বেছে নিল কেষ্ট। মিত্তির বাড়ির ছাদ থেকে পেটকাটা ঘুড়িটা ভোকাট্টা না হয়ে যখন গাঁত খেয়ে নন্দিনীদের ছাদে পড়ল তাতে তুঁতের আঠায় জুড়ে ছিল বন্ধুকে দিয়ে লেখানো চার লাইনের প্রেমপত্র। এহেন কঠিন মানুষ কিন্তু পাড়ার

তরুণীদের কাছে মুখচোরা। তবু তার জীবনেও প্রেম এনেছিল নন্দিনী। আর প্রথা মতো মাস্তান পাত্রে বাড়ির আপত্তি থাকায় পাত্রীকে নিয়ে পলায়ন এবং বন্ধুর থিয়েটার রোডের আস্তানায় বিয়ে। খাবার এসেছিল চাংওয়া থেকে। পরে অনুষ্ঠান হয়। মহানায়ক উত্তমকুমার সোনার দুল দিয়ে বৌমাকে আশীর্বাদ করেন।

উত্তমকুমার ও ফাটাকেষ্ট

উত্তমকুমারের সঙ্গে ফাটাকেষ্ট'র ঘনিষ্ঠতার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। প্রায় প্রতিদিনই ভোরে ফ্রিহ্যান্ড আর জগিং করতে ময়দানে যেতেন উত্তমকুমার। ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট ময়দানে পুলিশের গুলিতে নিহত হন নকশাল নেতা সরোজ দত্ত। সম্ভবত দৃশ্যটি দেখে ফেলেন উত্তমকুমার। পরে কোনও পার্টিতে মদ্যপ অবস্থায় ঘটনার বিবরণ দেন এবং সেখান থেকে শুরু হয় বিপত্তি। কলকাতা পুলিশের হয়রানি, ছেলে গৌতমের ওষুধের দোকানে বোমাবাজি। এককথায় রাজরোষে পড়েন উত্তমকুমার। তখন তাঁর ঢাল হয়ে দাঁড়ায় ফাটাকেষ্ট। গৌতমের দোকানের নিরাপত্তা এবং পুলিশের ইনফর্মার হিসাবে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে বিরাট ভূমিকা ছিল তার। তাই শ্যুটিং না থাকলে কালীপুজোর দিন উত্তমকুমার আসতেন তার পুজোয়।

সোমেন মিত্র বনাম ফাটাকেষ্ট

পুজোয় উপস্থিত অজিত পাঁজা শুরুর দিকে যুব কংগ্রেস কর্মী সোমেন মিত্র আর তাঁর দুই সহযোগী দীপক দাস ওরফে পল্টু আর জীবন চক্রবর্তীর সঙ্গে এলাকার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করলেও পরে দু'জনের পথ বেঁকে যায় দু'দিকে। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস(ই) গঠন করলে সোমেন-পন্থীরা ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য মিটিং করার সময় ফাটাকেষ্টর দলবল বোমাবাজি করে। ততদিনে কলকাতা ময়দানের রাজনীতিতে প্লেয়ার-ক্যাচার হিসেবে পসার জমিয়ে ফেলা জীবন-পল্টু জুটি দু-নলা বন্দুক হয়ে উঠেছে। অটোমেটিক রিভলবার, কেমিক্যাল বোমা, অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা আর সোমেনের নেতৃত্ব কেষ্টকে অনেক পেছনে ফেলে দেয়। জীবন, পল্টু শেষদিন পর্যন্ত ফাটাকেষ্টকে প্রতিহত করে এলাকা দখলে রেখেছিল।

ফাটার বুদ্ধির জোর

আপাত অশিক্ষিত হলেও কেষ্টর জানা ছিল কোন দক্ষতায় অ্যাকশন প্ল্যান করতে হয় আর কীভাবে জনসংযোগ করা যায়। বিড়লা হাউজে রবিশঙ্করের সেতার শুনতে যাওয়ার পাশাপাশি সে রামা-বাসু-চন্দন-ফ্যানটাদের দিয়ে এলাকায় শক্তি-সাম্য বজায় রাখতেও জানত। নকশাল আমলে সাফল্যের পুঁজির সুদ কেষ্ট আজীবন ভাঙিয়েছে বুদ্ধিবলে। কংগ্রেস আমলে যে সরকারি ডেয়ারিতে সে চাকরি পেয়েছিল, বাম আমলেও তা বহাল ছিল। অফিসে না গিয়েও মাইনে ঘরে চলে আসত। আরেকটা ফাটকা রোজগারের সিন্ডিকেট খুলেছিল তারা। তার মধ্যে ছিল তাবড় তাবড় নেতা ও শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার সময় সিটি কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, চিত্তরঞ্জন কলেজের পরীক্ষার্থীদের সিক সার্টিফিকেট জমা দিয়ে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ছাড়পত্র-সহ প্রশ্নপত্র বাইরে এনে যথেচ্ছ টুকে উত্তরপত্র জমা দিয়ে ছাত্রদের পাশ করানো হত। সেই সময় একে 'খাতা খাসি' বলা হত। প্রতি পেপার সে যুগে ১০০০ টাকা।

মিল্ক কলোনির যে ডেয়ারিতে কেষ্ট চাকরি করত, সেখানে মাইনের দিনগুলোতে তার লোকেরা যেত শ্রমিকদের থেকে তোলা আদায় করতে। একবার এক শ্রমিক নেতার নেতৃত্বে সবাই ঘিরে ফেলে কেদার আর তার টেনিয়াদের। তাদের চাবকানো হয় বেল্ট দিয়ে। প্রতিহিংসায় তিনদিন বাদে দমদম থেকে সেই শ্রমিক নেতাকে তুলে এনে কোমরের হাড় ভেঙে দেয় কেষ্ট।

নভেম্বর, ১৯৭২ সালের এক রাতে পুলিশের সঙ্গে কাশীপুর বরানগরে ঘর থেকে বার করে করে গুলি করে হত্যা করে অসংখ্য নকশালকে। এলাকার নকশাল নেতা স্বপন দত্তর সঙ্গে কেষ্টর গণ্ডগোল লেগে থাকত। কেষ্ট সন্ধ্যাবেলার আড্ডা দিত পেট্রোল পাম্পের পাশে, নয়তো নরেন সেন স্কোয়ারে সেন্ট্রাল বোর্ডিংয়ের পাশের খাটালে। হত্যাকাণ্ডের বদলা নেওয়ার সময় এসে পড়ে। তৈরি হয় কেষ্ট-বধের নীলনকশা। একদল বোমা নিয়ে গেল পটুয়াটোলা লেন দিয়ে, আরেক দল রাজা লেনে সাইকেলের চেন নিয়ে, আর পটলডাঙার দিক দিয়ে ৫-৬জনের একটি দল। ওলটপালট হয়ে যায় আড্ডার আসর বোমার আওয়াজ আর সাদা ধোঁয়ায়। বেঁচে যায় কেষ্ট, খাটালে ঢুকে গরুর পিছনে লুকিয়ে। শক্তিসাধকের এই উল্লাসের ঘোর কাটার সময় এসে পড়ে। কালীপুজো বাবদ কলেজ স্ট্রিট 'বাটা'র দোকান থেকে ১ টাকা চাঁদা চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করে। দোকানে শুরু হয় কেষ্টর ছেলেদের হুজ্জুতি। কলকাতা পুলিশের সাহায্য না পেয়ে বাটা কোম্পানি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে যোগাযোগ করে অভিযোগ জানায়। দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে, গ্রেফতার করতে হবে ফাটাকেষ্টকে। পুলিশ রিমান্ডে নারকীয় নির্যাতন চলে তার ওপর। কেষ্ট বোঝে, থামার সময় এসেছে। স্ত্রী নন্দিনী ইতিমধ্যে এক ফুটফুটে কন্যার জন্ম দিয়েছেন।

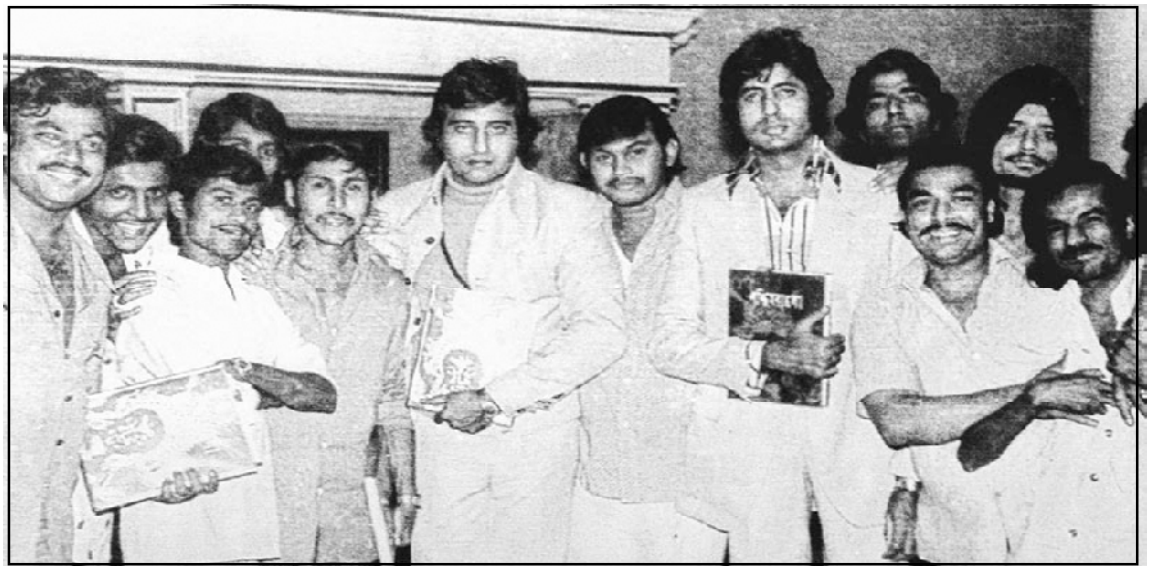

ফাটাকেষ্টর পুজোয় অমিতাভ বচ্চন ও বিনোদ খান্না

জীবনের ঝুঁকি এসেছে এরপরেও। সূর্য সেন স্ট্রিটের 'গণ্ডার' তাকে পেটো মারে। সেটি না ফাটায় সেই বোমা তুলে কেষ্ট পাল্টা চার্জ করে গণ্ডারকে।

অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে দেখা

সাদা সাফারি স্যুট পরনে, সারা মুখে বসন্তের দাগ নিয়ে বেঁটে গাট্টাগোট্টা লোকটাকে ফেরাতে পারতেন না অমিতাভ বচ্চনও। পরিচালক দুলাল গুহের 'দো অনজানে'-র শ্যুটিংয়ে অমিতাভ কলকাতা এলে গ্র্যান্ড হোটেলে ফাটাকেষ্টর সঙ্গে পরিচয় হয়। ওই পুজোর সঙ্গে বচ্চনের যোগ ছিল বহুদিন। প্রতিমার জন্য বম্বে থেকে হিরের নাকছাবিও পাঠান।

ফাটার ব্যক্তিজীবন

ব্যক্তিগত জীবনকে কেষ্ট চেষ্টা করতো সাধারণের থেকে দূরে রাখতে। ঘনিষ্ঠ পরিসরে সীমিত পরিমাণ মদ্যপান করত। এক প্রিয় নারীকে নিয়ে রেখেছিল বাগুইহাটির ফ্ল্যাটে। এই সময় কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় সুদে টাকা খাটানোর ব্যবসা শুরু করে সে।

ফাটার কালীপুজো

নরেন সেন স্কোয়ারে ফাটাকেষ্টর ক্লাব নবযুবক সঙ্ঘ আজও রয়েছে। উত্তম-সুচিত্রা, অমিতাভ, রাজেশ খান্না, বিনোদ খান্না, মালা সিনহা, আর ডি বর্মণ, আশা ভোঁসলে কে আসেননি তার পুজোয়? এমনকী রাশিয়ান ফুটবলার লেভ ইয়াসিনও ১৯৭৩-এ অতিথি হয়ে আসেন। কাশী থেকে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুর এলে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে কেষ্ট। ভিড় থাকায় জটাধারী সাধুকে ঘাড়ে নিয়ে মঞ্চে ওঠে।

শেষ জীবন

রমরমার সময়ও তার নামে পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছিল মধ্য কলকাতা। যাতে লেখা ছিল 'ফাটাকেষ্টর মুণ্ডু চাই'। একবার নকশালদের প্রতিরোধে কালীপুজোইবন্ধ হতে চলেছিল। ঠাকুর আনা ও বিসর্জন নিয়ে কৌশল করতে হয়েছিল তাকে। বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল পুজোর নাম। পুজোকে কেন্দ্র করে অন্নকূট ও দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র দান ছাড়াও অভাবি পরিবারের মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা ও ঘরবাড়ি করে দিত কেষ্ট। এমনকী এক গর্ভবতী ছাত্রীর তবলার মাস্টারকে তুলে এনে বিয়েও দিয়েছিল কেষ্টদা। অনেকে আসত কেষ্টর কাছে নানান আবদার নিয়ে। এফসিআই-তে, ডেয়ারিতে, এমনকী ব্যাঙ্কের চাকরিতেও ঢুকিয়েছিল অনেক ছেলেকে, কোনো স্বার্থ না দেখেই। একবার বাদুড়বাগানের ছাপাখানায় ২টি ছেলে ১টি মেয়েকে গণধর্ষণ করে। রাজাবাজার থেকে তাদের তুলে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেয় কেষ্ট।

বোমাগুলির লড়াই থেকে বহুদূরে সরে এসে ১৯৯২ সালে মাত্র ৫২ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরপারে চলে যায় কলকাতার রবিনহুড, মাস্তান ফাটাকেষ্ট। সমাজের নিচুতলা থেকে উঠে আসা বেপরোয়া ছেলেটাকে কোনো ক্ষমতা বদলাতে পারেনি। তার বাহুবলের ঘরানাই ছিল আলাদা। ফাটাকেষ্ট না থাকলেও এখনো তার নামে কালীপুজো হয়। চালায় তার প্রিয় শিষ্যরা।

খানাপিনা—

কলকাতার আরেক ঐতিহ্যের নাম কচুরি

রসেবশে বাঙালি চিরকালই খাদ্যরসিক। লোভনীয়, জিভে জল আনা মনপসন্দ খাবার দেখলে নিজেকে সামলাতে পারে এমন বাঙালির সংখ্যা যে নেহাতই হাতে গোনা তা হলফ করে বলতে পারি। আজকের দিনে স্বাস্থ্য সচেতন বাঙালিরাও ছুটির দিনে, পুজো-উৎসবের সময় তেলে ডোবানো গরমাগরম কচুরিতে মজবে না এমনটা কোনো আহাম্মকও বলবে না। যতই পিৎজা, বার্গার, সসেজ, চিকেন স্যান্ডুইচে বাঙালি কামড় বসাক না কেন হিং দেওয়া কচুরির সঙ্গে মাখা মাখা আলুর দম বা মিষ্টি মিষ্টি ছোলার ডালই একমাত্র পারে বাঙালির রসনা মেটাতে। আহা! তার যেমন স্বাদ, তেমনই রূপ। শহর কলকাতা জুড়ে থাকা এমন নানা স্বাদের কচুরি হার মানাতে পারে বড়ো রেস্টুরেন্টের অনেক নামজাদা পদকেও। উৎসবের দিনে শহরের এমন নাম করা কচুরির খোঁজেই না হয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ুন। কোথায় গেলে কোন কচুরি মিলবে হদিশ দিলাম আমরা।

কচুরির কিন্তু একটা ভালো নাম রয়েছে। এর আদি নাম কর্চরিকা। পাকেচক্রে পড়ে এখন সে কচুরি। এই গোলগাল পুর ভরা জিনিসটির গল্প শুরু করতে হলে উত্তরের কলকাতার উল্লেখ না করলেই নয়। কারণ উত্তর কলকাতাতেই এর সূত্রপাত।

হরিদাস মোদক

শ্যামবাজার মোড়েই পাশাপাশি হরিদাস মোদকের দোকানের ২টি দোকান। এর মধ্যে যে দোকানটা অপেক্ষাকৃত পুরোনো সেখানে ঢুকে পড়তে হবে। কাঠের বেঞ্চ-টেবিল। রঙচটা দেওয়ালে মহাপুরুষদের বাঁধানো ছবি, রজনীগন্ধার সরু মালা ঝুলছে সেখানে। কলকাতার আকাশ-বাতাস যখন আরেকটু নীল ছিল, সতেজ ছিল সেই সময়ের পরিবেশ আজও যেন থমকে আছে এখানে। এক অদ্ভুত নস্টালজিয়া কাজ করে। আপনি টেবিল-বেঞ্চে থিতু হতেই আধছায়া ঘরে ঝুড়ি হাতে দোকানের এক কর্মী এগিয়ে আসবে আপনার দিকে। সবুজ কলাপাতায় ঘিয়ে রঙা দুটি কচুরি টুপ করে বসে পড়বে। তার সঙ্গে হাতা ভরা ছোলার ডাল। নাহলে খোসা সমেত আলুর তরকারি। এই কচুরি ডাল বা আলুর তরকারির সঙ্গে বন্ধন যুগ যুগ ধরে রক্ষা করে আসছে। এই দোকানে কচুরি মিলবে শুধু সকালে। তারপর লুচি। পাশের দোকানে বিকেলবেলাতেও পাওয়া যায়।

খাদ্য রসিকদের দাবি, ডালের পুর দেওয়া ভাজা খাবারই হল কচুরি। সেভাবে দেখলে, ছোলার ডালের পুরীকেও কচুরি বলতে হবে। তবে খাঁটি কচুরিতে কাঁচা বিউলির ডাল আর হিঙের পুর ছাড়া অন্য কিছু চলবে না। আবার ওই একই পুর যখন পাঁচফোড়ন দিয়ে ভেজে ময়দার লেচিতে ভরা হবে, তখন তার নাম রাধাবল্লভী। শীতের সময় আবার জায়গার দখল নেবে কড়াইশুঁটি।

বাগবাজারের পটলার কচুরি

হরিদাস মোদক থেকে এবার গন্তব্য বাগবাজার। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় ছেড়ে এগিয়ে সোজা পটলার দোকান।

বাগবাজারে যখনই ঢুকেছি, রাস্তার দু'পাশে সাজানো থরে থরে কচুরি দেখে একটাই কথা মনে হয়, এত কচুরি খায় কারা! উত্তর মেলে না। শুধু ভোজবাজির মতো খালি হয়ে যায় ঝুড়ির পর ঝুড়ি। কিন্তু, এই ভিড়েও পটলার কচুরির হি সেবনিকেশা আলাদা।

দেখতে দেখতে ৯৩ বছর পার করে ফেলেছে এই ছোট্ট দোকান! কাচের শোকেসের ওপারে, বাবু হয়ে বসে আছেন দিব্যেন্দু সেন। এখনকার মালিক। তবে এই দোকান শুরু করেছিলেন তাঁর ঠাকুরদা শশীভূষণ সেন। লোকে ভাবতে পারে তিনিই হয়তো সেই পটলা। তবে না, বাগবাজার খ্যাত পটলা হলেন দিব্যেন্দু সেনের কাকা। ভালো নাম কার্তিক সেন। এখানে কচুরি মেলে শালপাতার বাটিতে। ডুমো ডুমো করে কাটা আলুর তরকারি সঙ্গে কচুরি। আহ! যেন অমৃত। বিকেলে আসলে মিলবে রাধাবল্লভী। দুটি বল্লভী, দু'টুকরো আলুর দম। এর নড়চড় নেই। ওই আলুরদম বাজার খুঁজেও মিলবে না।

গীতিকা

এবার সুকিয়া স্ট্রিট। মোড় থেকে কয়েক পা এগোলেই গীতিকা। সরু একফালি দোকানে, কাঠের পাটাতনে বসে একটানা কচুরি বেলে চলেছেন একজন। পাশেই ময়দার তাল ঠাসা চলছে। এখানে কচুরি পাওয়া যায় যেকোন সময়। হিঙের কচুরি। আলুর তরকারি আর চাটনি মাখিয়ে মুখে দিলে স্বর্গীয় স্বাদ। এই দোকান শুরু করেছিলেন গণেশ দলুই। মুড়ি, বাতাসা, তেলেভাজা আর কচুরি। এখন দোকান শঙ্কর দলুইয়ের হাতে। কণ্ঠি পরা মানুষটির ঝকঝকে কথাবার্তা। গণেশ দলুইয়ের নাতির নাতি। ১০০ বছরেরও বেশি বয়স এই দোকানের।

পুঁটিরামের দোকান

গন্তব্য এবার কলেজ স্ট্রিট। পুঁটিরামের দোকান। পুঁটিরামের ইন্দ্রজিৎ মোদক এখনকার মালিক। দশটার পর এখানে রাধাবল্লভীর পালা। সঙ্গে ছোলার ডাল। হালকা একটু আদা ফোঁড়নের গন্ধ, মন ছুঁয়ে যাবে বারবার। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর ভক্ত ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ মোদক। পুঁটিরাম মোদক তাঁর পিসেমশাই। নিজের হাতে ভিত খুঁড়ে, জিতেন্দ্রনাথের জন্য এই দোকান চালু করেন কুলদানন্দ। সেই যে গাড়ি ছুটলো এখনো ছুটছে।

শয়তানের কচুরি

ধর্মতলায়, কলকাতা কর্পোরেশন আর চাঁদনি চকের ক্রসিংয়ে পাশাপাশি দুটো অবাঙালি কচুরির দোকান। যেকোনো একটায় ঢুকে পড়লেই হল। তবে এখানে কচুরির থেকেও টানটা বেশি কাঁচা লঙ্কার আচারের। ঘন সবুজ এই আচারের মোহে পড়েছিল কলকাতার ৯০ দশকের কবিরা। তারা এর নাম দিয়েছিলেন শয়তানের কচুরি। কারণটা কী তা জানা নেই। এখানকার আমআদার চাটনিটিও মন্দ নয়। হিঙের কচুরি, চাটনি, আচার আর তরকারি। ফুরিয়ে এলেই, বাটি ভরে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে আবার। যাকে বলে ভরপেট খাওয়া।

ভবানীপুরের শ্রীহরি

ভবানীপুরের শ্রীহরি হল এমন দোকান যেখানে মাছির মতো খদ্দেররা সারাক্ষণ ভনভন করছে। এটা সেটা মিষ্টি আছে হরেকরকম। কিন্তু ভিড়টা হল কচুরি আর রাধাবল্লভীর। শ্রীহরি কখনো ফাঁকা দেখেছি, এরকমটা ঠিক মনে পড়ে না। এখানেও আসল চাহিদাটা বোধহয় ছোলার ডালের। ১৯১২ সালে এই দোকান শুরু করেছিলেন সন্তোষকুমার গুঁই।

কলকাতার নামকরা অনেক মিষ্টির দোকানেই কচুরি পাওয়া যায়। যে কোনো এলাকার পাড়ার দোকানেও পাওয়া যায়। নামডাক সব ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর রয়েছে। কিছু বলা হল। আর বাকি থেকে গেল অনেকটাই। শ্যামবাজারের দ্বারিক, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে মহারানি, খিদিরপুরের বহু পুরোনো অবাঙালি কচুরির দোকান। মল্লিকবাজার, রাজাবাজার বা কলাবাগানের মুসলিম বস্তিতে, সকাল-বিকেল রাশি রাশি কচুরি ভাজা হচ্ছে। ওরা যদিও বলে পুরী। তারপর? তার আর পর নেই। বেরিয়ে পড়ুন এবার। পুজোর ক'টা দিন চেয়ে চেখে, হামলে পড়ে সাবাড় করুন গরমাগরম কচুরি। দুগ্গা দুগ্গা।

সোশাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত ও অনুলিখন

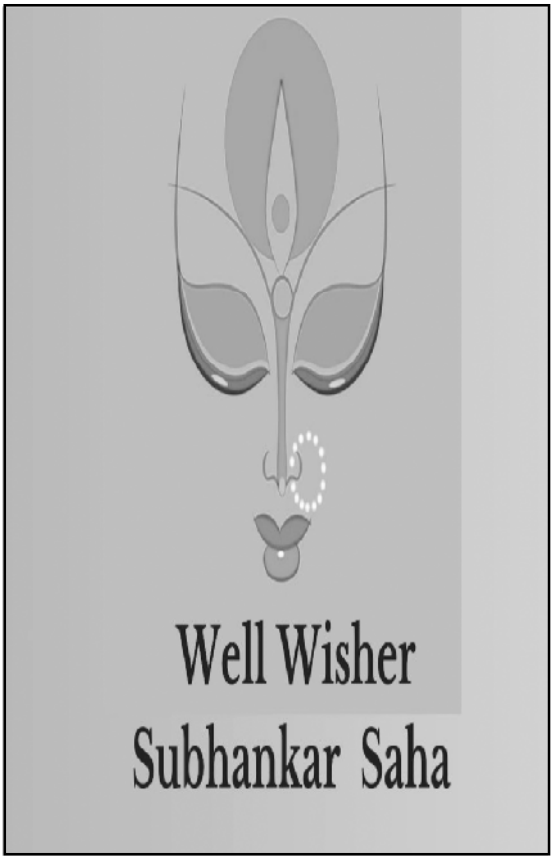

সমাজ

মানস কুমার ঠাকুর

যে ছোট্ট মেয়েটা ধর্ষিত হল আজ
ধর্ষকরা কি খোঁজ নিয়েছিল সে কোন জাত?
কোন রক্তে কি হয়?
রক্ত নিয়ে ছেলেখেলা করেও ক্ষান্ত নয়।
অস্তিত্বের পরিহাস রাজকীয় ভয়।
শুধু শূন্য হাতে প্রার্থনা
যে প্রার্থনা কোন মঙ্গলের জন্য নয়।
সৃষ্টি ও ধ্বংস একইসঙ্গে হতে পারে,
যদি ধ্বংসের অন্তিমে সৃষ্টি ফিরে আসে,
যদি আবার বৃষ্টি নামে
শান্ত পৃথিবীর অতৃপ্ত রূপ।
দেখা হবে তোমার আমার
সেটাই হবে শেষ আশ্রয়।
কিন্তু যে মেয়েটা ধর্ষিত হল আজ
মেয়েটিকে সমাজচ্যুত হতে হল
মন্দির মসজিদ তার জন্য নয়,
সে যে ধর্ষিতা।
আর ধর্ষকরা তো আলো মেখেছে
কলঙ্ক তাদের জন্য নয় এটাই তো রাজ
যে মেয়েটা ধর্ষিত হল আজ।

তিলোত্তমা

ইন্দ্রজিৎ আইচ

জ্বলছে দেখো শহর জুড়ে
মানুষের চোখে আগুন
দেয়ালে ঠেকেছে পিঠ তোমার
এবার বাঙালি জাগুন...
ভয় কী তোমার ভয় কী আমার
আছে শত শত তিলোত্তমা
সময় আসছে প্রতিশোধের
সব কিছুই পড়বে জমা...
বাংলা জুড়ে ভারত জুড়ে
বিশ্ব কলরব
তিলোত্তমার পাশে আছি
সকল নাগরিক সব...
দুর্নীতির এই কালো পাহাড়ে
ঢেকে গেছে রাজপথ
সিবিআই এবার করবে প্রমাণ
কে দোষী কে সৎ...
সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়ানোর
বিচার পাবেন তিলোত্তমা
ফাঁসির থেকেও চাই কঠিন সাজা
হবে না কোনো ক্ষমা ....

দুগ্গা দুগ্গা

সুব্রত সিদ্ধান্ত

আর কিছুদিন থাকিস উমা
বাপের বাড়ি এবার এসে,
মূর্তি হয়ে না দাঁড়িয়ে
আড্ডা দিস পাশে বসে।

আর কতদিন অসুর বধের
মিথ্যা নাটক করে যাবি,
টিনের খাঁড়া, ত্রিশূল দিয়ে
টিকবে না যে তোর দাবি।

ভক্তি, চাঁদা, অঞ্জলি সব
করছে না কাজ একেবারে,
কষ্ট আমার একই আছে
তবে কেন পূজি তোরে।

এবার না হয় শিখিয়ে দিবি
আসল পুজো মনের মাঝে,
লোভ আর ভয়ের অসুর দমন
এই পুজো তাই লাগবে কাজে।

মনের ত্রাণের মন্ত্র পড়ে
দুর্গতি যাক সবার এবার,
ভালোবাসার পুজোর ফুলে
চিন্ময়ী তুই হোস মা এবার।

শারদীয়া মা দুর্গা

ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মণ

শরতের অনুপম আভরণ ঐ, স্নিগ্ধ ছায়ায় মোড়া,
সকালে হিমেল ঘাসের পরে, সোনালি শিশির ভরা।
রাতে মধুময় আলোছায়া, নীলিমায় শুভ্র মেঘ ভাসে,
দিবালোকে কাশফুল দল, হওয়ায় দুলে হাসে।
দীঘির জলে পদ্মরাশি, জলকেলি করে,
শেফালি, শিউলির গন্ধে ভ্রমর, গুন গুন সুর ধরে।
পাতা ঝরার মাতন হওয়া, বইছে মৃদু তালে,
আমন ধানের গন্ধে, চাষী ভাইরা, দুঃখ যায় ভুলে।
আগমনীর আবাহনে ভুবন মজে, মহালয়া পাঠ শুনে,
অদৃশ্য এক পবিত্র বাতাস, পরশ লাগায় মনে।
মৃন্ময়ী মা হে দুর্গা, চিন্ময়ী হয়ে দেখাও তোমার শক্তি,
ভক্তিবানে ডোবাও ভুবন, হীন পশুসম মানুষদের দাও মুক্তি।

আদুরে সকাল

পূবালী চট্টোপাধ্যায়

সকালের রোদ জানলা গড়িয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে।
পরিচিত দোয়েলের ডাক ঘুম জাগা ভোর
কালো মোষের দল চই চই হাঁস,
শালুক ভর্তি পুকুরটা আয়না মতো!
আব্দুল তিরতির গাছে উঠে আলো নিয়ে এল
আর রাখালিয়া বাঁশি সুর তুলে গাইছে ভোরাই।
কত কথা কত শত বেচা কেনা পসরার সারি।
উঠান জুড়ে মঙ্গল আলপনা আঁকা
নতুন বৌ উনানের আঁচে ভালোবাসা রাধে।
আর আদুরে সকাল যেন রামধনু আঁকে।

প্রতিবাদ – নির্ভয়া

প্রদীপ চন্দ্র

তুই মায়ের কোল করলি খালি
মায়ের বুকে করিস আঘাত!
বর্বর তুইনরকের কীট
তোর মাথায় বজ্রাঘাত ;
নিষ্পাপ মেয়ে সমাজসেবী
বোঝেনি তোর চাল
মানুষরূপে মানুষখেকো
তুই আদিম ধূর্ত শৃগাল
তোর হাতের নখ রক্তে রাঙা
তুই মহাআতঙ্ক নরখাদক
তুই মা বোনেদের পণ্য ভাবিস
তুই বিশ্বে বিষের বাহক।
মিষ্টি ঐ নিষ্পাপ মেয়ে
মনে ছিল বহু আশা
সমাজসেবায় ব্রতী ছিল সে
পেয়েছিল ভালোবাসা
মানুষের মাঝে নেকড়ের দল
ভাবেনি সে কোনোদিন
ফুলের মতো নির্মল মেয়ে
সেবায় ব্যস্ত নিশিদিন।
নৃশংস কিছু নেকড়ের দল
ক্ষুধার্ত ক্ষুরধার
ভোররাতে তার গলা চেপে করে
পাশবিক অত্যাচার।

মা ছিল তার সারারাত জেগে
মেয়ে যে চোখের মণি
বাবা ভাবে কখন রাত পোহাবে
বাড়ি ফিরবে প্রাণের রানি
সেদিনও আবার প্রভাত হল
পাখিরা গাইল গান
পুলিশ পাহারায় ফিরল মেয়ে
নিশ্চুপ নিষ্প্রাণ

বুকে টেনে মা আঁচলে লুকায়
লজ্জা নিবারণে
প্রতিবেশী কাঁদে, জগৎ কাঁদে
কেন মৃত্যু অকারণে?
কত যে মিছিল, প্রতিবাদ হল
যায় না মানুষ গোনা
নানাভাবে সব প্রতিবাদ করে
নানা ভাষা গেল শোনা
মা বোনেরা পথে নামিল
বিচার পাওয়ার আশায়
সারা দেশে উঠে ক্ষিপ্ত আওয়াজ
দিকে দিকে নানা ভাষায়
চোখ খুলে দেখি মিছিলে মিশে
চতুর নেকড়ের দল
মোমবাতি হাতে রক্ত লুকায়
যুগে যুগে করে ছল।

সময় হয়েছে ওঠ মা জেগে
হাতে নে তোর কৃপাণ
অত্যাচারীর কাট মা শেকড়
তুই কেটে কর খানখান
মায়ের ত্রিশূল তোর হাতে নে
কর মা ওদের নিধন
সব নির্ভয়া বিচার খোঁজে
যেন না হয় প্রহসন
দশ হাতে দশ অস্ত্র নিয়ে
কর মা অসুর নাশ
পৃথিবী হোক অসুরমুক্ত
শান্তি করুক বাস।

কবিতার পাঁচালি

পঞ্চমুখী

কবি নই তবু কবিতা লিখি
দুচার লাইন আঁকিবুকি
বন্ধু যারা সাফাই গাবে
পকেট ছিঁড়ে সবাই ভাবে
নিত্য দিনের বে-খেয়ালি
পুরুষ নাকি মেয়েই খালি!
দিলে হাতের পরে লিখে
চমকে দেখি কাগজ রেখে
বেহিসাবি কথা কী সব!
মন্তর নয় মনের গরব----
একটানা ঐ বাঁশির টানে
কী যে মানে সে তা জানে
ছটফটানি বাড়ে যত
এলোমেলো কথা তত
একটুখানি মুচকি হাসি
আজ নয় কাল গ্রহের ফাঁসি।

দেবে যখন লোকের চাবুক
দে ছুট বলে পালাবে সুখ
কবিতা আর কবিতা নয়
বন্ধ ঘরে যাক না সময়
তখন দুহাত চোখের পরে
লজ্জা রাঙা প্রভাত ভোরে
রাঙিয়ে ওঠে ভুল নিশানা
এসব এখন বলতে মানা
কবিতা থাক কবির কাছে
এছাড়া কি বলার আছে?
গোপন কথা কোথায় আছে!
বলবে না সে মিথ্যা সাজে
ভালোবাসার এমন বড়াই
কবি বলে তারে সাজাই
নিত্য করি আলাপনের

নিত্য করি জ্বালাতনের
সমান যখন হয় প্রহরা
শান্ত স্বভাব নেই দোতরা
জটিল যত হিসেব মাঝে
রাতের কঠিন স্বপ্ন সাজে
যেতেই যখন হবে জানি
একটুকরো কথাখানি
বলব যখন; বলেই ফেলি
কবিতার নাম মনের কালি
দুঃখটাকে ভালোবাসি
তাইতে যে রোজ কাছে আসি
আদর করি সোহাগ ভরে
তুই ছাড়া আর ডাকি কারে?
দিনরাত্রির আনাগোনা
বুঝেও কি তুই বুঝিস না?
ভালোবাসার এমন জ্বালা
কবিতাতে গাঁথে মালা
পড়ায় তা নিজে হাতে
এসব কথা কবিতাতে
লিখে আবার মুছে ফেলি
ভীমরতি সব কথার বুলি
স্বপ্ন দেখা জগতগুলো
উড়িয়ে কখন দিক ভুলালো
হারিয়ে গেলাম কোন পথে যে
রাজার ঘরের সাম্রাজ্যে
রানি হতে হবেই বুঝি?
নেই যে রে সেই সময় খুঁজি
হাজার বছর গুনব প্রহর
দেবদেবতার লাগবে ঘোর

তুই নেই আমিও নেই
হারিয়ে গেছে সময়ও সেই
তোর কাছে সব জমা দিলাম
হারাসনি সব করে নিলাম
ভয় পেয়ে তুই পালাস যেমন
অবাক লাগে বিশ্বভুবন
ভালোবাসার এমনি জোর
একদিন তো হবে রে ভোর!
সর্বনাশা মন পাপিয়া
ডেকেই যাবে নামের জিয়া
হাসবে ভালোবাসা পাখি
এসব সব সত্যি না কি!
দেখ না ভেবে আগল খুলে
কবিতারা সব দিব্যি ভুলে
কাগজ খুলে বসে গেছে
পাঠাবে আজ তোরই কাছে
ঘরের দরজা খুলে রাখিস
জানলাতে তুই দাঁড়িয়ে থাকিস
নামটি ছিল মনে আছে?
গোলাপ হাতে প্রাণের কাছে!
সবটুকু আর মিথ্যে নাকি
সর্বনাশা কথার রাখি
পরে আজ চলবে কথা
পড়লে পাবি মনব্যথা।
রাতের কথা রাতেরই থাক
কবিতাতে হারিয়ে যাক।।

হারিয়ে যাই

তপন ব্যানার্জি

আরও হারিয়ে যাই
রক্তের চাপ আর ত্বকে
বয়সের ছাপ
কমতে থাকা সুদের হার
হারিয়ে যাওয়া সুনাম
বাড়তে থাকা শার্টের মাপ
আরও হারিয়ে যাই।

সুইমিং পুলের জলে
পা ডুবিয়ে ভাবনাগুলো
ডাঙায় ছটপট করতে দেখি
না শোনা কথাগুলো
বিদ্রোহ করে মনে
সামনে যাকেই দেখি
অচেনা প্রতিজনে
অপ্রয়োজনীয় জিনিস সাজিয়ে রাখি
স্মৃতির অতলে
আরও হারিয়ে যাই

আমাকে শাসন করে
দুর্বৃত্তের দল, বলি পা ধুয়ে আয়
তর্ক করি চল।
তবে ইডিয়টের সঙ্গে
রক্ত ঝরা অঙ্গে
কতক্ষণ আর সমঝোতা করা যায়
রোদ পড়ে যাওয়া পার্কে
ছোটদের ফুটবল
ভালো লাগে দেখতে, কিন্তু খেলতে পারি না
মন মাঠ পার করে ভাবনায়
আরও হারিয়ে যাই

যাকে ঘিরে ধরবে জীবন
ঘরে বাইরে সব কিছুর মানেতে
আলাদা স্বপন, শোনে না বারণ
করে এমন জীবন নির্ধারণ
চাইনি এভাবে আসুক
সব দিন হয় শেষের দিন
মরে বেঁচে থাকা অর্থহীন
ভাবতে হয় ভাবাতে হয়
আরও হারিয়ে যাই
একসাথে চলা পথ
যখন মেশে মোড়ের মাথায়
খুঁজে নিতে হয় আগে যেতে চাই
দাঁড়িয়ে ভাবার অবকাশ নেই
কেউ তোমার সঙ্গে না থাকলেও
এগোতে হয়
জীবনের রাস্তা একমুখী
হয় এগোও না হলে চলবে না
আরও হারিয়ে যাই

মাণ্ডবী

দেবাশিস মিত্র

সূর্য অস্তগামী, দিগন্তে ভাসে রক্তিম ডালা।
বিকশিত, ছিল যত রূপ মাধুরী।
মণীশ এগোয় হাতে জাল।
জোয়ার সবে শুরু।
ফুলে ওঠেন মা গঙ্গা।
না জানি কোন অনাচারে।
এক কাঁধে জাল, আরেক কাঁধে সংসার।
মণীশ ধীর পায়ে চলে, ঘাটে বাধা নৌকা।
ভাসে নৌকা, মণীশ দেখে দূরে।
লাল ফিতে, দুই বিনুনি পিঠেতে স্কুল ব্যাগ
পায়ে পায়ে হাটে বালিকা মাণ্ডবী।
জলেতে কম্পিত সূর্য, নাকি মাণ্ডবী।
উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল, স্বচ্ছ রামধনু।
কাঁপে সূর্য, নাকি মাণ্ডবী, নাকি কাঁপে ব্রহ্মাণ্ড,
মণীশ আঁকড়ে ধরে প্রথমে মাণ্ডবী,
তারপর সূর্য, শেষে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড।

নৃত্যের রাজসূয় - এক

অরুণাংশু ব্রহ্ম

ধিনতা, তা-ধিনতা তা-ধিন তা-ধিন
আলোয় মাখা ভব্য রথ সামনে রেখে,
জনসুমদ্র পা বাড়ায় অন্ধকার মেখে।
রাজা মন্ত্রী সভাসদ স্তাবক পরিবেষ্টিত
হয়ে চলেছেন নৃত্যের তালে তালে,
আপন প্রত্যয় ভুলে মশগুল খেয়ালে,
নৃত্যের অশ্বমেধ যজ্ঞের রাজকীয়
আয়োজন শেষ উন্মত্ত কোলাহলে।

যাপনের ধারায় ধারায় মিশে যাচ্ছে
তাণ্ডব নৃত্য, ছুটছে তালে-বেতালে
পথে মাঠে ঘাটে মাটিতে, মহাশূন্যে,
প্রদীপ্ত আলোকে, নিরন্ধ্র অন্ধকারে,
অসহায় মানুষ অদ্ভুত নৃত্য দেখছে,
নৃত্যের রাজসূয় যজ্ঞের পুণ্য প্রসূন
রক্ত ধারায় গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে,
পূর্ণ পুণ্য কুড়িয়ে নিচ্ছে ভিক্ষা পাত্রে
কোলাহল ভেসে যায় প্রান্তরে প্রান্তরে
শব্দের উত্তেজনায় বধির লোকেরা
হাততালি দেয় ভয়ে, বিস্ময় অন্তরে।

ধা-ধিন-ধিন, তাক ধিনা-ধিন নৃত্য চলছে
ছন্দবিহীন বেতালা খাপছাড়া নৃত্যের
প্রবাহে সকলেই উদ্ভট ভঙ্গিতে অচেনা
বেসুরো, ভুলে ভরা স্বদেশ সমাজ।
ভুল লেখা হয়ে গেছে পাতায় পাতায়,
নৃত্য, তাল-লয়, ছন্দ, ধ্বনি সব ভুল,
ভুল শিক্ষা-দীক্ষা, বিবেক, চেতনা মনন
অন্যায় ভ্রান্ত ধারণায় পথভ্রষ্ট নির্লিপ্ত প্রাণ
সারিবদ্ধ এগিয়ে যায় কৃষ্ণগহ্বরের দিকে,
মহাশূন্য অপেক্ষায় অন্ধকার জগতে,
অসার শূন্যগর্ভের ঢেউয়ে ভাসে সব,
নেই অন্ন, নেই কাজ, নেই শিক্ষা, নেই লাজ
নেই স্বপ্ন, নেই চেতনা, নেই জ্ঞান, নেই বেদনা।
তবু রাজার বিষম নৃত্য ছন্দে সবাই নাচছে,
বিবর্ণ ক্ষুধার দেশে, নেই রাজ্যের রাজার
প্রসাদ কণা ভিক্ষা পাওয়ার আশায় কাঁদছে,
ঠিক-বেঠিকের প্রভেদ ভুলে শুধুই নাচছে।

উন্মত্ত নৃত্যের তরঙ্গমালার প্রচণ্ডতায়
বুক ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে, যন্ত্রণায়
মন-অবয়ব কুঁকড়ে যায় ভয়ে বিতৃষ্ণায়।
বিদ্বেষের কুণ্ঠিত ধারায় ভেসে যাচ্ছে মন
ভাঙছে সমাজ ছিঁড়ে যায় মানববন্ধন।
রাজা কি জানে কেন তাণ্ডব আয়োজন?

সবুজ পাখি

সন্তোষ কুমার সরকার

যে সবুজ পাখিটি ডানা মেলে উড়তো একদিন
তার পাখা ঝাপটানো শব্দ ছড়িয়ে পড়তো আকাশ জুড়ে
যে প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর ফিরতো বাসায়
আজ সে আর ফেরে না!
খবর এসেছে, তির বিদ্ধ পাখিটি ছটফট করছিল মাটিতে পড়ে
রক্তে ভিজেছে মাটি
তিরন্দাজির নির্ভুল তিরে!
এখন সে আছে অচিনপুর
নাম না জানা দেশ তার নতুন ঠিকানা!
অবশিষ্ট জীবন থেকে বঞ্চিত সে
তাই সে প্রতিদিনের মতো আর ঘরে ফেরে না!
কিন্তু মুকুট পরে শিকারির বিচার করবে যে পক্ষীরাজ
তার মাথার ব্যামো, কিছুই মনে থাকে না তার!
সব সময় ভুলভাল বকে
অথচ পাখিরা স্লোগান তুলেছে শূল হোক, ফাঁসি হোক,
আরো কত কী!
অমনি বৃদ্ধ প্যাঁচা মাথায় হাতে রেখে বললে
যেখানে ঝরা পালক একটাও পড়ে নাই
যেখানে সব চিহ্ন পুড়েছে আগুনে
সেখানে বিচার অধরা!
তাই এখন বাতাসে কালো ধোঁয়া
যেদিন ধোঁয়াশা কেটে যাবে
পরিষ্কার হবে ঘোলা জল
সেদিন, একমাত্র সেদিন প্রাপ্তবয়স্ক হবে এ বিচার!

জীবন যাত্রা, কলকাতা

রজনীশ জৈন

সকাল বেলা
স্টেটসম্যান পড়া,
শ্রীহরির হালুয়া কচুরি,
মাঝে মাঝে জিলিপি,
আর গাঙ্গুরামের মিষ্টি দই।
গলির ক্রিকেট,
সিনেমার টিকেট,
এই ছিল আমার ছোটবেলা,
জীবন যাত্রা, কলকাতা।

সন্ধ্যাবেলার আড্ডা,
ফুটবল হোক বা ক্রিকেট,
পলিটিক্স হোক বা ছবি,
সঙ্গীত হোক বা সাহিত্য,
তর্ক, বিতর্ক এত প্রবল,
চেঁচামেচি, মারপিট।
তারপর, এক ঘণ্টা পর,
'আসি' বলে গলায় গলায়
আবার বন্ধু।
এই ছিল আমার সন্ধ্যা বেলা,
আড্ডা জীবন, কলকাতা।

এক নম্বর, লেখা পড়া,
লরেন্স হোক বা সেন্ট জেভিয়ার্স,
তার মাঝে, ক্লাস বাঙ্ক করে,
ডিলাইটের সামোসা আর চানা ঘুগনি,
তিওয়ারির ধোকলা, ফ্লুরিসের পেস্ট্রি,
মাসিমার লুচি, তুলোপট্টির পুরি,
কখনও ফুচকা আর ঝালমুড়ি,
কি ভাবে ভুলি।
বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকা ভাসানো,
মিনিবাস, ট্রাম আর রিকশাতে
অতিবাহিত সময়,
আমার মিষ্টি জীবন যাত্রা
এক আকাশ, কলকাতা।

শিক্ষা হোক বা সংস্কৃতি,
কলকাতার সান্নিধ্য
কবিগুরুর গীতাঞ্জলি,
সত্যজিতের দারুন ছবি,
উৎপল দত্তর নাটক,
উত্তমকুমারের অভিনয়,
কলকাতা দিলো রাষ্ট্রসঙ্গীত,
সরস্বতী পূজা, মহালয়া,
আর দিলো দুর্গাপূজার অঞ্জলী।
পেয়েছি তোমার থেকে,
অপূর্ব সংসার,
দেশের মাঝে আছে যে দেশ,
আমার একমাত্র কলকাতা।

আমি নয় বাঙালি।
বলে আমায় প্রবাসী,
কিন্তু এত বছর পরেও,
ভুলতে পারি নি,
আনন্দের শহর,
চলো আবার এক বার,
ঘুরে আসি,
আমার ভালবাসা,
স্বপ্নের শহর,
আমার মিষ্টি কলকাতা।

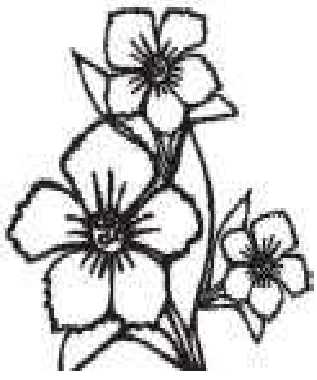

বন্ধুতা

অনিমেষ ভট্টাচার্য

আজকাল খুব নির্জনতা খুঁজি
মেঠোপথ লাগোয়া দোকানে
চায়ের ভাঁড়ের আদুরে ওম,
দিগন্তে অস্ত যাওয়া বিবস্বান,
নিশুতি রাতে মূলা নক্ষত্র,
শরতের জমে থাকা শিশির,
মজে যাওয়া শীর্ণা গাঙ
এসব বড় টানে আজকাল।
মনে হয় মনের মতো বন্ধু পেলে
যাই চলে উনকোটি যোজন
বাতাসিয়া লুপ, ভালুকবাসা,
বালিতে শিকড়,ঘন ঝাউবন।
চলে যাই বনবিবির থান
বাঘরোলের অচিন দেশ,
দু একজন খ্যাপা বন্ধু পেলে
হাতানিয়া দোয়ানিয়া পার হয়ে
নামখানা, বকখালি, জম্বুদ্বীপ
উত্তাল ঢেউয়ে টলমল
নৌকা দুলবে সাগরের জলে।
মফস্বলের কোনো কানা গলি
লোহার গেট, পাঁচিল, বাগান
চন্দননগর, সুরুল, কুলতলি
নির্জনতা খুঁজে যাই চলে
কিছু উড়নচণ্ডী বন্ধু পেলে।

কবিতা

নীলকমল বসাক

কবিতা আমায় লিখতে বল,
যা চিন্তা অনুভূতি ধারণা প্রকাশ।
সৃজনশীল কল্পনা, প্রসুত ভাষা,
একটা শক্তিশালী রূপে,
প্রাণবন্ত ছবি হলো কবিতা।

কিন্তু আমার অলসতা মোড়ানো,
আরামদায় বিছানায় আশ্রয়স্থলে,
আমি ঘুমের মধ্যে থাকি।
কাজ, কর্তব্য, জগত, আমার দৃষ্টি থেকে বিবর্ণ।
তাই সকল সময় অলসতার কাছে আত্মসমর্পণ করি।
মনে মনে ভাবি, কাল থেকে শুরু করব, প্রতিশ্রুতি করি।
যেখানে আমার অলসতা প্রতিদিনের অভ্যাস,
সেখানে কি করে নতুন স্বপ্ন দেখি!
তারপরে আমার আর কবিতা লেখা হয় না।
হঠাৎ প্রতিটি পতনের সাথে জেগে উঠলাম, আমার ইচ্ছাশক্তি
কাজ, কর্তব্য, জগত।
ক্লেশের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।
আর সাফল্যের সাথে মনশক্তিশালী হচ্ছে।
মনে হচ্ছে, বারবার ইচ্ছা সব জয় করবে।
চ্যালেঞ্জ আসুক, বাধা বারুক, ইচ্ছা সব জয় করবে।
আমার কথার মাধ্যমে চিন্তাভাবনা অনুভূতি- ধারণা প্রকাশের
মধ্যে দিয়ে এখন একটি কবিতা হল।

মতামত—

সোশাল মিডিয়া মুক্ত মনের ক্ষেত্র নাকি চায়ের ঠেক

এই মুহূর্তে গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে সোশাল মিডিয়া। এই মাধ্যম একদিকে যেমন মানুষের মতামতের মুক্ত ক্ষেত্র তেমনি পরচর্চারও ক্ষেত্র। এই নিয়ে নানা পেশার মানুষ নিজেদের মতামত জানালেন।

সোশাল মিডিয়া এখন মুক্ত মনের দিশারী
ড. রতন মণ্ডল, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সোশাল মিডিয়া এখন এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রযুক্তির শিক্ষক হিসাবে এই প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকটাই বলতে চাই। মানুষের খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস কমেছে, টিভি দেখার আগ্রহ কমেছে। অন্য অনেকের মতো আমিও এখন সোশাল মিডিয়ায় খবরের হাইলাইট দেখি। শুধুমাত্র খবর নয়, নানা ধরনের কারেন্ট ইনফরমেশন পাওয়া যায়। যা পড়ে সবসময় আপডেট থাকা যায়। গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত মুক্তচিন্তা, নিজের মতামত প্রকাশ করা। যার প্রতিফলন দেখা যায় সামাজিক মাধ্যমে। এই মুহূর্তে যে কোনো আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সোশাল মিডিয়া। এক নিমিষে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এরমধ্যে সোশাল মিডিয়া মূল ধারার মিডিয়ার বিকল্প হয়ে উঠেছে।

সোশাল মিডিয়া আগামী দিনের প্যারালাল মিডিয়া
নন্দিনী চক্রবর্তী, বিভাগীয় প্রধান, জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন, মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ

নতুন প্রজন্মের মধ্যে সোশাল মিডিয়া খুব জনপ্রিয় মাধ্যম। শুধু তাই নয়,সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই মিডিয়ার প্রতি টান দিন দিন বাড়ছে। সাংবাদিকতা পড়াতে গিয়ে দেখছি, ছাত্রছাত্রীদের যখনই কোনো খবরের কথা বলি, তখনই ওরা বলে, হ্যাঁ এইমাত্র পোর্টাল বা ইউটিউবে দেখলাম। ওরা খবর লিখতে চায় সোশাল মিডিয়ার ধরনে। ছোটো ও স্মার্ট। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা খবরের কাগজ বা টিভির খবরে আগ্রহ দেখায় না। হাতের স্মার্ট ফোনে সারা বিশ্বের খবর জেনে নেয়। আমার নিজেরও এই ব্যাপারে টান রয়েছে। তবে এটাও ঠিক সোশাল মিডিয়ার খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। অনেক ফেক খবর সামনে আসে। মূল ধারার সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় পড়ে তাদের সম্পাদকীয় পলিসি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। কিন্তু সোশাল মিডিয়ার পলিসি গোপন থাকায় আমরা সবসময় ধরতে পারি না, তারা কী উদ্দেশ্যে খবর পরিবেশন করে।

সোশাল মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার
দিওতিমা রায়, ইঞ্জিনিয়ার, আইটি সেক্টর

নিজে খুব বেশি আসক্ত না হলেও আজকের দিনে সোশাল মিডিয়ার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। নতুন প্রজন্ম সোশাল মিডিয়া ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারে না। তার একটাই কারণ নতুন প্রজন্মের মধ্যে খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস কমেছে। সাকুল্যে হয়তো মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ ছেলেমেয়ে খবরের কাগজ পড়ে। স্মার্ট ফোনে বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় খবর জেনে নেয়। নিজেকে আপডেট রাখে। সোশাল মিডিয়ার ভালো ও খারাপ দুটো দিক রয়েছে। মুক্ত চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। মানুষ নিজের মতামত তুলে ধরতে পারছে। আর মত প্রকাশের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। অন্যদিকে, সোশাল মিডিয়ায় অনেক ফেক নিউজেরও জন্ম নেয়। সম্প্রতি আর জি কর কাণ্ডে এই ধরনের অনেক ফেক নিউজ সামনে এসেছে। নেগেটিভ বা ফেক নিউজ সমাজে খারাপ প্রভাব ফেলে। অনেকসময়ই ফেক নিউজ চেনা না সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। পজিটিভ খবরের চেয়ে নেগেটিভ নিউজ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই, আমার মনে হয় সোশাল মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকাটা খুব দরকার।

গল্প—

বাজলো তোমার আলোর বেণু

তপন ব্যানার্জি

আলোর বেণুর সুরে মাতোয়ারা এই ভুবন, দোলায় চড়ে সেই বাপের বাড়ি আসছেন মা। সঙ্গে অবশ্যই চার ছেলেমেয়ে। প্রতিবারই আসেন আর আমরা মেতে উঠি সেই আনন্দে ভুবন ভোলানো হাসিতে, মেতে উঠি বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে। মা আসেন আর সংহার করেন অশুভের, কালিমালিপ্ত আবহাওয়াকে ভরিয়ে দেন সুরের মূর্ছনায়, সংগীতের লহরীতে, খাদ্যের সমাহারে, ভক্তির আঙিনায়, পাপকে নিশ্চিহ্ন করেন আপন মহিমায়

এবার পুজোয় অংশ নেবে না নয়া পাড়ার রবি দাদা। সদ্য চাকরি গিয়েছে যে, আর এই বয়সে নতুন করে শপ ফ্লোরের স্কিলড কাজের কেউ দাম দেয় না। শুনলাম এত লাখের চাকরি পেল কলেজ ক্যাম্পাস থেকে মিত্রবাড়ির বড়ো ছেলেটা...বেশ ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিদেশ গেল।

রবি দাদা সকাল থেকে চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজের সব বিজ্ঞাপনগুলো দাগ দেয় আর দেখতে থাকে কাজে যাওয়া লোকগুলোর দৃপ্ত ভঙ্গিতে, ইঙ্গিতে জয়ের ইশারা।

রবি দাদা ইলেক্ট্রিকের বিল, ফ্রিজ বদলানোর চিন্তা আর ছোটো ছেলেটাকে কী করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার কাজে একটা ট্যাব কিনে দেবে এসব ভাবতে ভাবতেই কেটে যায় সময়। আর ভেসে আসে গানের কলিটা কানে, 'মাতলো রে ভুবন ...'

আজ পুজোর দিনে প্রায় ঘর থেকে বেরোন না তরুণদা আর রিনাদি। রিনাদি লুকায়ে সাজে বুকের মাঝে, অজস্র কান্নার সুর। ওদের আজ সরিয়ে নিয়ে গেছে আনন্দ নদীর ওপারে। এই তো বছর পাঁচেক আগে পাড়ার পুজোর সব থেকে প্রাণোচ্ছল মুখ দুটি ছিল ওদের। একদিকে সফল ছেলের গল্পে অন্যদিকে, বিদেশি ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন আনা অরুণদা আর বৌদি যেন বীণার তারে শ্রেষ্ঠ স্বরলিপি। শুনেছি ওদের ছেলে-বউমা আমেরিকায় থাকে, গত পাঁচ বছরে কোনো না কোনো অজুহাতে বাড়িতে আসেনি। ওদের একটা ফুটফুটে মেয়েও হয়েছে। দেখতে যেতে চাইলে ইনফেকশন নাকি সব এর দোহাই দিয়ে আসতে মানা করেছে। ওদের বাড়ির আটটা ঘরে তাই একটাতেই টিমটিম করে আলো জ্বলে পুজোর দিনগুলোয়। বন্ধ থাকে জানালাগুলো শোনা যায় না—

"অন্তরে যার লুকিয়ে রাজে
অরুণ বীণায় সে সুর বাজে
সেই আনন্দ যজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ"।

শরতের আকাশে নবীন সুরের ঝংকারে যখন মাতিয়ে ওঠে মন, পড়ুয়া ছেলে মেয়েরা এখন রাস্তায়। চারিদিকের সমাজের অবক্ষয়, চরিত্রের নিম্ন অবতরণ ওদের বাধ্য করছে প্রতিবাদের হাতিয়ার তুলে নিতে। ছুড়ে ফেলে দিতে নখওলা মানুষরূপী হিংস্র নরখাদকগুলোকে।

যে মাটিতে রামকৃষ্ণ হেঁটেছেন , বিশ্বকবি লিখেছেন, সেলুলয়েডে এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়, রামমোহন দিয়ে গিয়েছেন নারীর অপমানের মুক্তি, বিদ্যাসাগর খুলে দিয়েছেন সমান অধিকারের যোগ্যতা, বিবেকানন্দ আর বীর সুভাষের প্রশ্বাস যে সমাজে পড়েছে, তোদের এই দৈন্যতা চোখে পড়ার মতো। মা তুই আসছিস ! আয়, অসুরগুলোকে মারার অভিনয় করিস না। সত্যি করে মার আর তোর ছেলেমেয়েগুলোকে বলে যা যেন সন্তানদের নিয়ে বিভেদ না করে, গর্ব করে শিক্ষা দেয়। সম্মান করে মায়ের জাতিকে। না হলে আমরাই তুলে নেব তোর ত্রিশূল। সমাজ থেকে নোংরা দূর করতে।

হাতজোড় করছি, তর্পণের জলের ফোঁটা প্রার্থনার রঙে মিশে যাচ্ছে জলে, মনে আশা রাখি সূর্যের ভোর উঠবেই

চোখ বন্ধ করে শুনছি---

ভোরের পাখি ওঠে গাহি
তোমারি বন্দন
বাজলো তোমার আলোর বেণু।

হ্যালুসিনেশন

তনিমা সাহা

রাত প্রায় দশটা বাজে। বনলতা অ্যাপার্টমেন্টের 'এ' নম্বর ফ্ল্যাটের কোণের আধা আলো আধা অন্ধকার ঘর থেকে একটা আলতো চিৎকার ভেসে আসছে।

কে, কে ওখানে? আমি জানি, আমি জানি তুমি এখানেই আছো? আমি... আমি ঘুমিয়ে পড়লেই আমাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছো; তাই তো!'

ঘরটার অধিকারিণী হলেন গার্গী দেবী। একজন ষাটোর্ধ্ব বয়স্কা বিধবা একা মানুষ। পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে গার্গী দেবীর ছেলে বিজয় এবং তাঁর স্ত্রী সুমনা। তাঁদের বিয়েরও প্রায় ছয় বছর হতে চলল। সুমনাদের কোনও সন্তানাদি নেই। হবে না যে এমন নয়। তাঁরা স্বামী স্ত্রী স্বইচ্ছাতেই কোনও সন্তান নেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সারাদিন সংসারের জন্য খেটেখুটে ক্লান্ত শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিতেই সুমনা গার্গী দেবীর চিৎকার শুনতে পেয়ে বলে, 'ওই দেখো, আবার শুরু হল বুড়ির চ্যাচামেচি। ওফ! নিজে সারাদিন ধরে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে। আর রাত হলেই ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে থাকবে।'

বিজয় কোলের ল্যাপটপটা বন্ধ করে পাশে রাখতে রাখতে বলে, 'আহ্! থাক না। বুড়ো মানুষ। বরং একদিকে ভালো। রাতে জেগে থাকলে বাড়িতে চুরির সম্ভাবনা কম।'

বিছানা থেকে উঠে চুলটা আঁচড়ে মুখে নাইট ক্রিমটা লাগাতে লাগাতে সুমনা বলে, 'মমম! উনি তো বলেই খালাস। সারাদিন গরু, মহিষের মতো খেটে রাতে যেই চোখের পাতা দুটোকে একটু বিশ্রাম দেব; ব্যস অমনি তাঁর চ্যাঁচানো শুরু হয়ে যায়।'

ঠিক এমন সময় আবার পাশের ঘর থেকে জোরে জোরে হুমকির স্বর ভেসে আসে, 'কে, কে ওখানে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে?'

হাতের কাজটা থামিয়ে সুমনা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠে, 'ওই দেখো আবার, আবার শুরু হয়েছে। দাঁড়াও! আজ এর একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়ব।'

পাশ বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বিজয় আকুতি জানায়, 'আহহ্! সুমনা ছেড়ে দাও না। বয়স্ক মানুষ। আর পাঁচটা বয়স্ক মানুষের মতো তো তার জামাকাপড় নোংরা করা বা খাওয়া দাওয়ার মতো সমস্যা নেই। আরে... দাঁড়াও সুমনা যেও না।'

কিন্তু সুমনা কোনো কথা না শুনে দুমদাম পা ফেলে পাশের ঘরে যায়। কিন্তু একটু পরেই বিজয় সুমনার চিল চিৎকার শুনতে পায়, 'আআআআআআআআ।'

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে বিজয় জিজ্ঞেস করে, 'কী হল? কী হল? সুমনা? তুমি এমন করে চিৎকার করলে কেন?'

ভয়ার্তকণ্ঠে সুমনা দেওয়ালে টাঙানো গার্গীদেবীর ছবিটার দিকে আঙ্গুল তুলে ইশারা করে বলে, 'বিজয় দেখ, দেখ চারদিকে কত রক্ত!'

বিজয় দু'হাতে সুমনাকে জড়িয়ে ধরে খুব মোলায়েম স্বরে বলে, 'সুমনা তুমি আবার হ্যালুসিনেট করছো। আজকের ওষুধটা খাওনি, তাই না।'

সুমনা যেন বিড়বিড় করে কী একটা বলতে চাইল কিন্তু বিজয় তাঁর কোনও কথা না শুনে জোর করে ঘরে এনে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। ওষুধের পাওয়ারে ঘুমিয়ে পরার সময় সুমনা বিজয়ের মুখের ক্রুর হাসিটা লক্ষ্য করল না। সুমনা ঘুমিয়ে পড়লে বিজয় সম্মোহিতের মতো মোবাইলটা তুলে নিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করে যান্ত্রিক স্বরে বলে ওঠে, 'শেষ ডোজটা দিয়ে দিয়েছি।'

সেই মুখটা

প্রবীর ব্যানার্জি

মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা তার জীবনে চিরদিনের জন্য দাগ রেখে যায়। আজ এমনই একটা ঘটনার কথা বলব। সালটা আজ আর মনে নেই। বার্ধক্যের চৌকাঠে এসে মনে করছি কৈশোর বা নব তারুণ্যের কথা। জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে কিছু ভয়াবহ, কিছু ঘৃণ্য, কিছু শোকের আবার কিছু অভূতপূর্ব। কলেজে একবার ফুটবল খেলতে গিয়ে চোট পেয়ে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের মাথাটা কালশিটে পড়েছিল, অসাড় হয়েছিল। দু'দিন পরে সোফায় পা ছড়িয়ে বসে একটা বই পড়ছিলাম, হঠাৎ অনুভব করলাম আঙুলটা শিরশির করছে। চেয়ে দেখলাম ব্যথা আঙ্গুলের মাথায় একটা মশা হুল ঢুকিয়ে রক্ত টানছে আর তাতেই আঙুলটায় অদ্ভুত শিরশিরে ভাব অনুভব করছি। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের অনুভূতি, কিন্তু তেমনটা আর কখনোই পাইনি।

আর একবার ধর্মতলা থেকে সল্টলেক যাচ্ছিলাম কোনও কাজে। বাস স্ট্যান্ডে বাসে বসে দেখলাম একজন অফিসযাত্রী আরেকটা চলন্ত বাসের সামনের দরজা দিয়ে নেমে পা ফসকে পিছনের চাকার তলায় ঢুকে গেল। আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে বসিরহাটে। সেখানকার একটা পোড়ো বাড়ির ভূতের বাড়ি বলে বদনাম ছিল। সেখানেও আমরা কয়েকজন বন্ধু রাত কাটিয়ে বেশ রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, যদিও পরে জেনেছিলাম যে সবটাই মানুষ ভূতের কাজ ছিল। তবে এই সব ঘটনারই কারণ আছে, ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু যেটা এখন বলব তার কোনো কার্যকারণ আজও পাইনি। সালটা মনে না থাকলেও এটা মনে আছে যে সেবারই বোর্ডের পরীক্ষা শেষ হয়েছে মানে স্কুল জীবন শেষ। কারণ উচ্চমাধ্যমিক তখন কলেজে পড়ানো হত। তাই চার বন্ধু ঠিক করলাম দু'দিন পরে কলেজস্ট্রিটের একটা দোকানে দেখা করে গ্রুপ ছবি তুলব আর একটা রেস্টুরেন্টে খাব। ছবির চারটে কপি চারজনের কাছে রাখব স্মৃতি হিসেবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় অন্যরকম।

পরদিন সকালেই মেজদি এসে হাজির, বাঁকুড়ায় ওদের দেশের বাড়ি যেতে হবে। চৈত্রমাসে সেখানে বড়ো করে গাজনের মেলা হয়, জামাইবাবু আগেই সেখানে চলে গেছেন, ভাগ্নের বয়স তখন মাত্র দু'বছর তাই বাবার নির্দেশে যেতেই হল। হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে বর্ধমান নেবে সেখান থেকে বাসে কিছুটা পথ গিয়ে নদী পেরোতে হয়, সেকথা অবশ্য পরে জেনেছি। যাইহোক জীবনে দ্বিতীয়বার লোকাল ট্রেনে চাপলাম। এর আগে বাবার সঙ্গে একবার ব্যান্ডেল চার্চ যেতে চড়েছিলাম।

বর্ধমান নেবে দেখলাম ওদের দেশের বাড়ি থেকে দিলীপ নামে বছর তিরিশের একটা ছেলে আমাদের নিতে এসেছিল। মেজদিকে 'বৌদি' সম্বোধন করে জানাল যে গাড়ি নদী পেরোনোর রাস্তায় রাখা আছে, এখন তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে বাস ধরতে হবে। আমি বুঝলাম না গাড়িটা স্টেশনে না এনে রাস্তায় রেখে এল কেন! কিন্তু অচিরেই সেটা বুঝতে পারলাম বাস থেকে নামবার পরে। বাস রাস্তাটা পার হয়ে দেখলাম পিচ রাস্তার পাশে কিছুটা নীচে ঢালু হয়ে মাটির রাস্তা চলে গেছে। সেখানে একটা গরুর গাড়ি দাঁড় করানো আছে। সেটা নাকি নদী পেরোতে লাগবে। ট্রেনে আসার সময় চৈত্র মাসের দামোদরকে দেখেছি, শুনলাম এবার আসবে শালী নদী। গরুর গাড়ি চড়ে মেঠো পথে যাত্রা শুরু হল। গরুর গাড়ি হলেও সেটা বেশ সাজানো গোছানো। বাবু হয়ে বসার জন্য মোটা করে চটের বস্তা পাতা, রোদ থেকে বাঁচতে নৌকোর আদলে মাথার ওপর ছাউনি দেওয়া, দু'পাশে দুটো বাঁশের খুঁটির মধ্যে আড়াআড়ি একটা লোহার রড লাগানো প্রয়োজনে ধরবার জন্য। মেজদির পাশে আরাম করে ভাগ্নেকে কোলে নিয়ে বসে গেলাম। দিলীপ গাড়োয়ানের পাশে বসে পড়ল। একটু পরেই শালী নদী দেখা গেল, সরু নদীর জলও অগভীর। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি বসার বস্তার নীচে একটা মোটা প্লাস্টিক পাতা। নদী আসতেই আমাদের বস্তার ওপর থেকে তুলে একটা চারপায়া তক্তার ওপর বসতে দেওয়া হল যেটা দেখতে অনেকটা নীচু বেঞ্চের মত। বস্তাগুলো বেঁধে ওপরে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। গাড়ি হেলতে দুলতে নদী খাতে নামল, তক্তায় বসার কারণে ভিজলাম না ঠিকই কিন্তু জল পায়ের তলায় ঠেকে গেল। আধ-ঘন্টাখানেক নৌকো বিহারের পর অবশেষে এসে গন্তব্যে পৌঁছালাম। উঁচু পাঁচিল ঘেরা বেশ বড়ো দোতলা বাড়ি। বড়ো উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। বাড়ির পেছনে বয়ে যাচ্ছে দামোদর। বর্ধমানে নেমে কিছু খেয়েছিলাম তাই খিদে তেমন ছিল না, সামান্য কিছু খেয়ে ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখতে লাগলাম। চারপাশে আমার কাছাকাছি বয়সের কিছু ছেলেমেয়েকে দেখলাম আমায় লক্ষ্য করছে। আমার ধারণা ছিল গ্রামের ছেলেমেয়েরা হয়তো লাজুক ও অন্তর্মুখী হয়, কিন্তু আমায় ভুল প্রমাণ করে ওরা নিজেরাই এগিয়ে এল আলাপ করতে। দেখলাম সকলেই বেশ স্মার্ট আর সপ্রতিভ। ওরাই আমাকে টেনে নিয়ে গেল নদীতে চান করতে। সাঁতার আমার ভালোই জানা ছিল কিন্তু সেটা লেকে। চৈত্রের দামোদর খুবইক্ষীণ, কোথাও কোমরের ওপর জল নেই। প্রায় দু'ঘন্টা সাঁতার কেটে চান করে খুব মজা পেলাম। এক পেট ক্ষিদে নিয়ে ফিরলাম। জামাইবাবুও এসে গিয়েছিল আমায় দেখে খুব খুশী হল। বলল, কয়েকদিন থেকে যেতে যাতে গাজনের মূল উৎসবটা দেখতে পারি। কিন্তু পরদিনই চলে যাব শুনে একটু দুঃখিত হল। দুপুরের খাওয়ায় পর বেশ ভালো একটা ঘুম হল। বিকেলবেলা মেলা ঘুরলাম, সন্ধ্যায় কয়েকজন বাউল এসে গান শোনাল। পরদিন সকালে উঠেই বাড়ি ফেরার বায়না ধরলাম। কিন্তু এবার বাধ সাধলেন মেজদির শাশুড়ি; তিনি বিধান দিলেন যে ব্রাহ্মণের ছেলে ভাত না খেয়ে যেতে পারবে না, তায় আবার কুটুম বাড়ির অতিথি। মেজদিও বোঝালো-বিকেল চারটের সময় বেরোলেই আটটার সময় বাড়ি ঢোকা যাবে। অতএব মানতে হল।

জলখাবার খেয়ে গ্রামের মধ্যে ক্ষেত দেখতে গেলাম, মেজদিদের বিশাল আলুর ক্ষেত ছাড়াও ট্যাঁড়স, বেগুন, লঙ্কা, লেবু ইত্যাদি নানান সবজির বিস্তীর্ণ ক্ষেত। আমার নতুন বন্ধুরা রাতটুকু বাদে সবসময়ই আমায় সঙ্গ দিয়ে চলেছে। এদিনও তাদের সঙ্গে নদীস্নানে গেলাম।

দু'ঘন্টারও বেশী নদীতে কাটালাম। একটু এগিয়ে গেলে শালী নদী আর দামোদরের সঙ্গমস্থলে পৌঁছানো যায়। পরে শুনেছিলাম কয়েক বছর পরে এখানে এসে এই বাড়িতে থেকে নদীসঙ্গমে 'ঘরে বাইরে' ছবির শ্যুটিং করেছিলেন। খেয়ে উঠতে প্রায় সাড়ে তিনটে। দু'চোখ ঘুমে জুড়ে আসছে কিন্তু কিছুতেই বিছানার কাছে গেলাম না। একবার শুলেই বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তাই বিছানা এড়িয়ে বেরোবার তাগাদা করতে লাগলাম। অবশেষে জানা গেল যে ওদের রোলসরয়েস গরুর গাড়ি পাশের গ্রামে গেছে কিছু মালপত্র আনতে, এলে তবেই যাওয়া যাবে। চারটের সময় এলেও গাড়ির চালকের খাওয়ার পর বেরোতে পাচঁটা বেজে গেল। আবার একইপথে দিলীপকে নিয়ে ফেরা শুরু। স্টেশনে পৌঁছালাম প্রায় সাতটায়। সাড়ে সাতটায় ট্রেন ছাড়ল। নিশ্চিত হলাম হাওড়ায় পৌঁছে ট্যাক্সি পেতে অসুবিধা হবে না, বাসও পাওয়া যাবে। পোস্তায় দিদির বাড়ি, বেশী রাত হলে সেখানেও যাওয়া যেতে পারে। মেজদি যথেষ্ট টাকা দিয়ে দিয়েছে, চেষ্টা করব টাকাটা যতটা সম্ভব বাঁচাতে। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন চোখ লেগে গেল আর সারাদিনের ক্লান্তি নিমেষে গ্রাস করল, গভীর ঘুমে ঢুলে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, একসময় অনুভব করলাম খুব গরম, সম্ভবত গরমের কারণেই ঘুমটা ভেঙে গেল, 'কোথায় আছি' এই ঘোরটা কাটতে একটু সময় লাগল। তারপর বুঝলাম একটা অন্ধকার কামরায় বসে আছি আর ট্রেনটা একটা ছোট্ট স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। কখন ট্রেন থেমেছে, কখন আলো-পাখা বন্ধ হয়ে গেছে কিছুই জানতে পারিনি। প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে বুঝলাম যে ব্যস্ত স্টেশন একেবারেই নয়। এমনিতেই ট্রেনে লোক বেশী ছিল না, যা ছিল তার খুব কম সংখ্যকই প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। জানা গেল, যারা কাছাকাছি যাওয়ার তারা অনেকে বাস বা ট্রেকার ধরে চলে গেছে। বেঞ্চে জায়গা না পেয়ে অনেকে প্ল্যাটফর্মের মেঝেতেই বসে আছে। ট্রেনে আমার পাশেই একজন মাঝ বয়সী ভদ্রলোক বসেছিলেন, আমায় দেখে একটু হেঁসে বললেন — "কি ঘুম ভেঙেছে? যা ঘুমোচ্ছিলে, কত ডাকলাম উঠলেই না।" ট্রেন আটকে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানালেন একটু দূরেই একটা ইঞ্জিনের সঙ্গে মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়েছে তাই লাইন বন্ধ, ওভারহেড তারেও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তবে কাজ হচ্ছে, আশা করা হচ্ছে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি সাড়ে নটা বাজে, তার মানে অন্ততপক্ষে দেড় ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। আমার সঙ্গে একটা ছোটো ব্যাগে দুটো জামা-প্যান্ট ছিল, সেটা হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত হাঁটলাম যদি বসার জন্য একটু জায়গা পাই, স্টেশন মাস্টারকে দেখলাম হন্তদন্ত হয়ে কারোর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আসছে। ট্রেন কখন ছাড়তে পারে জানতে চাওয়ায় বললেন, ট্রেন ছাড়ার আগে হুইসল দেবে এবং তিনি নিজেও বেল বাজিয়ে সকলকে সজাগ করবেন। বসার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে শেষপর্যন্ত একপ্রান্তে একটা বেঞ্চে দেখলাম একজন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কয়েকবার উঠে বসতে বললাম কিন্তু এমন বেঘোরে ঘুমোচ্ছে কোন নড়াচড়ার লক্ষ্মণ দেখলাম না। তবে ওর পায়ের তলায় দেখলাম একটু জায়গা আছে, সম্ভবত দেহের উচ্চতা খুব কম। তাই ওই স্বল্প পরিসরেই কোনরকমে বসে পড়লাম। প্রথমে ভাবলাম যে এত গরমে চাদর মুড়ি দিয়ে কী করে আছে কিন্তু একটু সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারলাম লাইনের ওপর দিয়ে বসন্তের ঠান্ডা হাওয়ায় আমারও বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। ব্যাগ থেকে একটা ফুল সার্ট বার করে গায়ে দিয়ে নিলাম। ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে তার ওপর থুতনিটা রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে থাকলাম। ট্রেনের অসমাপ্ত ঘুমটা চট করে চোখের পাতায় চলে এল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না হঠাৎ দেখি একটা কালো বেঁটে মতন লোক আমার সামনে এসে বলছে -"একটু সরে বসবেন", তাকিয়ে দেখলাম ছোটো করে চুল ছাঁটা মিশকালো একটা লোক, মুখে বসন্তের দাগ, গোঁফটা ঝাঁটার মতো, চোখ দুটো ছোটো ছোটো গোল গোল হলেও ভ্রু জোড়া খুবই পুরু, গলায় লাল সুতোয় একটা বড়ো তাবিজ ঝুলছে। কোনও কথা না বলে আমি সরে বসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু একটু

পরেই আবার শুনলাম আমায় বলছে - "আমার পাটা আপনার গায়ে লাগছে, আপনি তো ক্রমশই আমার গায়ে ঢলে পড়ছেন, সোজা হয়ে বসুন না"। এবারে ঘুমটা ভেঙে গেল, তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই আমার শরীরটা হেলে আছে ওঁর ওপর। যদিও চাদরে সমস্ত শরীরটা ঢাকা থাকার ফলে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। বুঝতেই পারলাম না আমি কি সত্যিই একটু আগে ওঁর মুখটা দেখেছি নাকি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছি। ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, ঠিক সেই সময় ট্রেনের আলো জ্বলে উঠল। যাত্রীরা তখনো প্ল্যাটফর্মে শুয়ে বসে আছে। স্টেশন মাস্টারকে দেখলাম দু'জন কুলি গোছের লোক আর একজন কালো কোট পরা রেল অফিসারের সঙ্গে আসছে। কাছে এসেই মাস্টারমশাই রাগত স্বরে বললেন — "সেই বিকেল থেকে একটা বডি পড়ে আছে, দানুকে দিয়ে খবরও পাঠিয়েছি আর তোমাদের কারোর দেখা নেই। ভাগ্যিস যাওয়ার আগে দানু চাদর দিয়ে লাশটা ঢেকে দিয়ে গিয়েছিল"। বেশ অবাকই হলাম, একটা অজানা অচেনা মৃত মানুষের গায়ে ঠেস দিয়ে এতক্ষণ বসেছিলাম আর আমার কোন সন্দেহই হল না। তারপরেই ভাবলাম তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলল কে? এর মধ্যে ট্রেনের হুইসেল বাজতেই যাত্রীরা উঠে কামরার দিকে ছুটল। আমি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কারণ জানতাম যে ট্রেন তিনবার হুইসেল বাজাবে আর স্টেশনমাস্টারও সিগন্যাল দেবে তাই ফাঁকা কামরায় উঠতে কোনও সমস্যা হবে না। অপেক্ষা করতে লাগলাম পুরো ব্যাপারটা বোঝার জন্য। মাস্টারমশাই একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন — "কিরে দানু, সেই যে গেলি নকুলের বাড়িতে খবর দিতে আর একজন লোক আনতে আর এলি রাত বারোটা বাজিয়ে! তা ওর বাড়ির লোকেরা কোথায়?" দানু বলল--স্যার ওর বাড়িতে দাদা-বৌদি ছাড়া আর কেউ নেই। ওর দাদার সকালে ডিউটি ছিল তাই বাড়ি এসে ঘুমোচ্ছিল আর বৌদি এসে বলল - নকুল যা মদ খেত ওর এই পরিণতিই অনিবার্য ছিল। ওরা কেউ আসেনি তাই ওর কাকার ছেলে অর্জুনকে নিয়ে এসেছি। ওরা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি মাচাটা ওখানে রাখল। দেহটা মাচায় শোয়ানোর আগে অর্জুন এসে লাশের মুখের কাপড়টা সরাল আর তখনি স্টেশনের আলোয় নকুলের মুখটা দেখা গেল। চমকে উঠলাম, একেবারে সেই মুখ। অবিকল আমার ঘুমের মধ্যে দেখা। যে বলেছিল সরে বসতে। সেই গোঁফ, কালো গায়ের রঙ, মুখে বসন্তের দাগ এমনকী গলায় তাবিজের লাল সুতোটাও দেখা যাচ্ছে। আমি দৌড়ে ট্রেনে উঠে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম যে লোককে আমি কখনও দেখিনি তার মুখ কী করে স্বপ্নে দেখলাম।

জীবনে বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেলেও এই প্রশ্নের সদুত্তর আজও পাইনি। এর বহু বছর পর একবার নিজের পরিবার নিয়ে লোকাল ট্রেনে বর্ধমান যাচ্ছিলাম বন্ধুর ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। একটা ছোটো স্টেশনে ট্রেনটা এক মিনিটের জন্য থামল। জানালা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন এখানে আগেও কখনও এসেছি, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলাম না। স্টেশনটার নাম চাচাই।

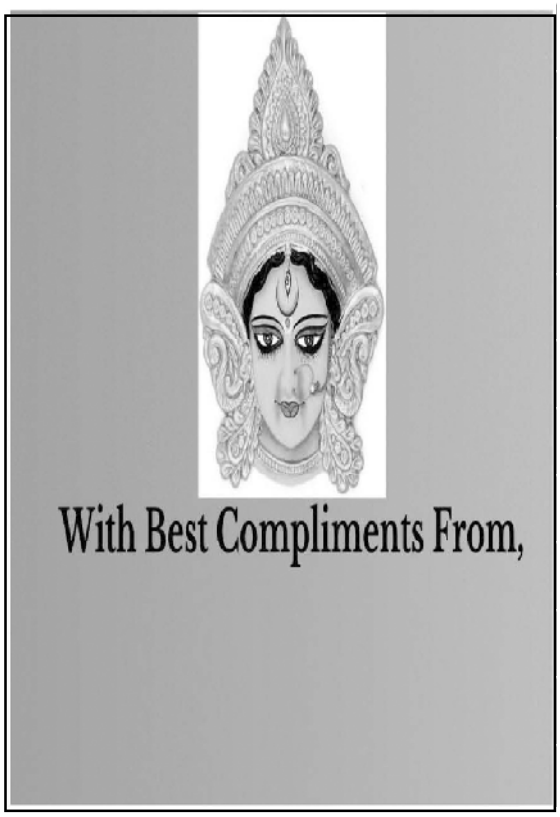

সুমন্ত্র

সৌমিত্র শংকর রায়

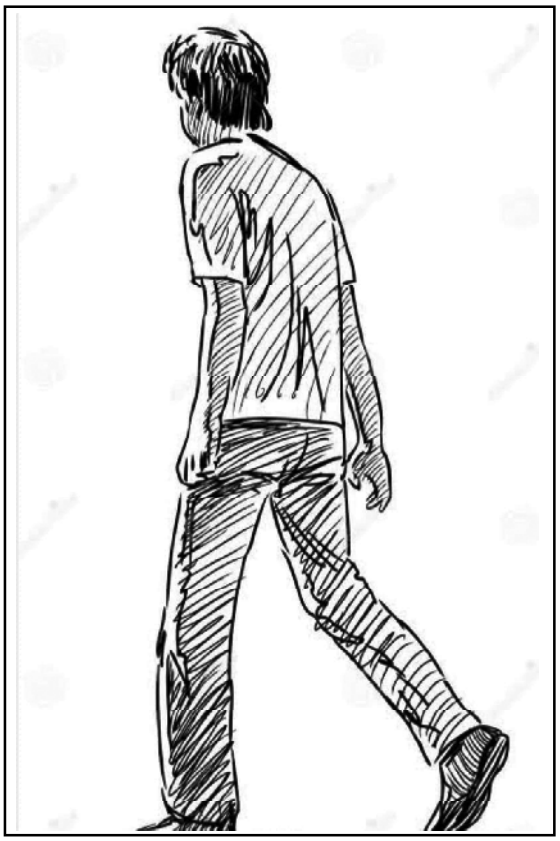

ছেলেটির নাম দুঃখীরাম। জন্মের তিন মাস আগে বাবা ও জন্মের পনেরো দিনের ব্যবধানে মা মারা যায় তাই ছেলেটির ওই রকম নামকরণ। থাকার মধ্যে ছিল বাল্য বিধবা এক পিসি নাম বাতাসি। দুঃখীরাম পিসির কাছে বড়ো হতে লাগল। বাতাসি গ্রামের জমিদার বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। আসলে গিন্নিমার ফাইফরমায়েস খাটে। তবে গিন্নিমার সুনজরে থাকার জন্য জমিদার বাড়ির ভালো-মন্দ খাবার গিন্নিমা দুঃখীরামের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। প্রতি পুজোয় একজোড়া জামা কাপড় ও শীতে গরম চাদর কিনে দিতেন বলতেন, আহা! বাপ, মা মরা ছেলে ওকে একটু যত্নে রাখিস।

জমিদারবাবুর একমাত্র ছেলে কোনো এক অজানা অসুখে মাত্র দেড় বছর বয়সে মারা যায়। তারপর থেকে জমিদারবাবু সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন। নায়েব মশাই অত্যন্ত সততার সাথে ও দক্ষ হাতে জমিদারি পরিচালনা করেন বলে জমিদারি এখনো টিকে আছে না হলে কবেই লাটে উঠত।

দুঃখীরাম আদরে যত্নে বড়ো হতে থাকে। সে যতই দরিদ্র বাপ মায়ের সন্তান হোক না কেন দেখতে অত্যন্ত সুশ্রী। শ্যামলা চেহারায় দুটো বড়ো বড়ো মায়াবী চোখ, তীক্ষ্ণ নাসা, মাথাভর্তি কালো চুল যে দেখত সেই প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। যখন দুঃখীরাম সাত বছরের তখন একদিন বাতাসি জমিদার গিন্নিকে গিয়ে ধরে বসল যে দুঃখীরামের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। জমিদার গিন্নি বললেন, ওইটুকু ছেলে ও আবার কী কাজ করবে আর পারবেই বা কীভাবে! বাতাসি বলল, নিশ্চয়ই পারবে, গরিব ঘরের সন্তান ক্ষিদে সহ্য করতে পারে, দুঃখ সহ্য করতে পারে, কষ্ট সহ্য করতে পারে আর সামান্য একটা কাজ করতে পারবে না। যাইহোক, গিন্নির কথায় জমিদার বাবু দুঃখীরামকে জমিদার বাড়ির গরু চরানোর কাজে বহাল করলেন। কাজটা খুব একটা কঠিন না। গরুগুলো নিজেরাই চরতো, শুধু একটু চোখে চোখে রাখা বিনিময়ে জমিদার বাড়িতে দুবেলা খাওয়া ও মাস ফুরালে কিছু টাকা হাতে পাওয়া। এই ভাবে তিন বছর ধরে বেশ চলছিল। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা গেল সব কটা গরু গোয়ালে ফিরে এসেছে কিন্তু দুঃখীরাম ফেরে নাই। অনেক থানা পুলিশ করেও দুঃখীরামের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। শুধু বাতাসির হাহাকার ও বিলাপ বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল।

এই ঘটনার মাসখানেক কেটে যাওয়ার পর একদিন হঠাৎ করে কিছু রাখাল বালক জমিদার বাড়িতে গিয়ে খবর দিল তারা দুঃখীরামকে দেখেছে একটা গাছতলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেল। বাতাসি আকুলিবিকুলি করে ছুটে গেল। জমিদারবাবু নিজে পাইক পেয়াদা নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দুঃখীরামকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। কয়েকদিন সেবা শুশ্রূষার পর দুঃখীরাম চোখ মেলে তাকাল। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মাঠে গরুগুলোকে চরতে দিয়ে একটা গাছতলায় বসে তাদের দিকে লক্ষ্য রাখছিল এমন সময় হঠাৎ করে একটা অদ্ভুত আলো তার উপর এসে পড়ল। তারপর থেকে সে আর কিছু জানে না। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর থেকে নানা জনে নানা কথা বলে বেড়াতে লাগল। কেউ বলল দুঃখীরামকে ভূতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারপর যখন দেখেছে ও একটা গেঁয়ো কেলে ভূত তখন আবার ফেরত দিয়ে গেছে। কেউ বলল না না কোনো ভিনগ্রহের প্রাণি ওর ওপর গবেষণা করবে বলে ওকে নিয়ে গিয়েছিল। অনেকে আবার এর প্রতিবাদ করল যে ওর মতো একটা গবেটকে

কেন নিয়ে যাবে! নেওয়ার হলে কোনো বুদ্ধিমান মানুষকে ওরা নিয়ে গিয়ে তার ওপর গবেষণা করে দেখত যে মানুষের বুদ্ধির কতটা বিকাশ হয়েছে সেইভাবে পরিকল্পনা করে ওরা পৃথিবীর দখল নেওয়ার চেষ্টা করত। যাইহোক, দিনকতক এইসব মুখরোচক আলোচনা করে সময় কাটল, তারপর যথারীতি নিজেদের সমস্যার চাপে সবাই সব কিছু ভুলে গেল।

দুঃখীরাম ও তার পিসি দু'জনেই জমিদার বাড়িতেই থাকে। তাকে আর কোনো কাজ করতে হয় না, জমিদারবাবু পিসির অনুমতিসাপেক্ষে ওকে দত্তক নেওয়ার জন্য স্থির করে। গিন্নির সাথে আলোচনা করে এক শুভদিন দেখে পুরোহিত ডেকে যথারীতি মন্ত্র পাঠ ও হোম যজ্ঞের মাধ্যমে দুঃখীরামকে দত্তক নিলেন আর তার নতুন নামকরণ করা হল "সুমন্ত্র"। আমরাও এখন থেকে দুঃখীরামকে সুমন্ত্র বলেই ডাকব। সুমন্ত্রর অভাবনীয় উন্নতিতে গ্রামের লোক হিংসায় জ্বলে মরতে লাগল। বলাবলি করতে লাগল যে ওই বাতাসি বুড়ি নিশ্চয়ই জমিদারকে তুকতাক করেছে না হলে এটা অসম্ভব।

সুমন্ত্রকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। ক্লাসে মাস্টারমশাইরা লক্ষ্য করলেন সুমন্ত্র তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র যেটা একবার শোনে বা পড়ে সেটা ভোলে না। কথাটা জমিদারবাবুর কানে উঠল। তিনি সুমন্ত্রকে ডেকে বললেন, তোমার উন্নতিতে আমি ভীষণ খুশি। আমার এই জমিদারির ভবিষ্যৎ তোমার হাতে সুরক্ষিত থাকবে এই বিশ্বাস আমার আছে। উত্তরে সুমন্ত্র একটা কথাই বলল, কুড়ি বছর পর ওরা আমাকে নিতে আসবে, বলে দৌড়ে খেলতে চলে গেল। জমিদারবাবু কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থাকলেন। তারপর বালকের খেয়াল মনে করে চিন্তামুক্ত হলেন।

সুমন্ত্র এখন চোদ্দ বছরের কিশোর, সে আগে ছিল সুশ্রী এখন রীতিমতো সুন্দর, গায়ের রং আগে ছিল শ্যামলা এখন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। গালে হালকা গোঁফ, দাড়ি থাকার জন্য আরো সুন্দর দেখায়। সুমন্ত্র বরাবর মেধাবী ছাত্র সুতরাং ম্যাট্রিক ও হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় দুর্দান্ত রেজাল্ট করবার পর এন্ট্রান্স দিয়ে বোম্বাই আইআইটিতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে গেল। সেখানেও বি টেক পরীক্ষায় ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করার পর তার বাবা অর্থাৎ জমিদারবাবু তাকে ডেকে বললেন, তুমি আমাদের একমাত্র ছেলে। তোমাকে আর পড়াশুনা করতে হবে না বরং তুমি যদি তোমার পছন্দের কোনো ব্যবসা করতে চাও তার সবকিছুর ব্যবস্থা আমি করে দেব। কিন্তু যাই কারো শুধু তুমি আমাদের চোখের সামনে থাকবে। অতএব সুমন্ত্র কেমিক্যাল কনসালট্যান্ট হিসেবে তার কর্মজীবন আরম্ভ করল এবং অচিরেই একজন দক্ষ, সৎ ও সফল পরামর্শদাতা হিসেবে নাম করল। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কোম্পানি থেকে, সে তেল কোম্পানি হোক বা ফার্টিলাইজার কোম্পানি, তার সুপরামর্শ নেওয়ার জন্য ভিড় লেগেই থাকে। সুমন্ত্রর বাবা ও মা ভীষণ খুশি।

এর মধ্যে সুমন্ত্রর পিসি বাতাসির বয়সজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে। সুমন্ত্র যখন পঁচিশ বছর বয়স। এক সুন্দরী সুলক্ষণযুক্তা মেয়ের সাথে তার খুব ধুমধাম করে বিয়ে দেওয়া হল। জমিদারগিন্নি লক্ষ্মীমন্ত বউ পেয়ে ভীষণ খুশি। একবছর পর সুমন্ত্রর যখন ছেলে হল তখন জমিদারবাবু ও জমিদারগিন্নি আনন্দের সাগরে ভাসতে লাগলেন। ছয় মাস পরে নাতির অন্নপ্রাশনও খুব ধুমধাম করে দেওয়া হল। গোটা গ্রামের লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হল ও প্রত্যেক গ্রামবাসীকে একটা করে কম্বল পুরুষদের ধুতি শার্ট ও মহিলাদের শাড়ি দেওয়া হল। সবাই নাতির নামে জয়ধ্বনি করে আনন্দের সাথে বিদায় নিল।

সুমন্ত্র এখন তিরিশ বছরের যুবক। তার চার বছরের ছেলে সুমঙ্গল গাড়িতে করে স্কুলে যায়। সুমন্ত্রর স্ত্রী লক্ষ্য করল সুমন্ত্র মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে থাকে। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে একটা কথাই বলে, সময় হলে সব জানতে পারবে। সেদিন সকালে সুমন্ত্র রোজকার মতো বাগানে পায়চারি করতে গিয়েছে, বউ রোজ চা নিয়ে অপেক্ষা করে সুমন্ত্র ফিরলে একসাথে চা খায়। তারপর কিছুক্ষণ সুমন্ত্র ছেলেকে আদর করে ও দশটার মধ্যে স্নান খাওয়া করে বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের অফিসে যায়। কিন্তু সেইদিন সুমন্ত্রর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে বউ উদ্বিগ্ন হয়ে বাগানে গেল। কিন্তু সুমন্ত্রকে কোথাও দেখতে পেল না। শ্বশুর-শাশুড়িকে খবর দেওয়া হল তাঁরাও সুমন্ত্রকে খুঁজে না পেয়ে যে ছ'জন দারোয়ান ছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তারা ছোটবাবুকে বাগানে একবার মাত্র দেখেছে এবং দেখে মনে হয়েছে তিনি উপর দিকে তাকিয়ে কারো সাথে কথা বলছেন। কিন্তু তিনি বাগানের বাইরে কোনোমতেই যাননি। তিরিশ ফুট উঁচু প্রাচীর, প্রকাণ্ড লোহার দরজা ও ছ'জন দারোয়ানের নজর এড়িয়ে বাইরে বেরোনো অসম্ভব। থানা, পুলিশ গোয়েন্দা সবাই হার মেনে গেল কিন্তু সুমন্ত্রকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

জমিদারবাবু ও গিন্নি দ্বিতীয়বার পুত্র শোক পেলেন। একদিন বিমর্ষ চিত্তে নিজের মন্দ কপালের কথা চিন্তা করছিলেন হঠাৎ সুমন্ত্রর একটা কথা বিদ্যুৎ চমকের মতো জমিদারবাবুর মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল, কুড়ি বছর পর ওরা আমাকে নিতে আসবে। কিন্তু ওরা যে কে তার জবাব হয়তো আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না।

অনুগল্প—

পোস্টমর্টেম

পার্থসারথি গুহ

আবারও এক অপরূপার শবচ্ছেদের ভার এসেছে তাঁর হাতে। মানব-মানবীর দেহ নিমেষে চিরে ফেলা যাঁর বাঁ হাতের খেল তিনিই আজ থমকে যাচ্ছেন। মৃতার মুখটা খুব পরিচিত কাউকে মনে করাচ্ছে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? সে তো কোন যুগেই....

অন্য এক পোস্টমর্টেমে ক্রমে বুঁদ হচ্ছেন ডাক্তার মিলন চৌধুরী।

চিকিৎসক জীবনে দীর্ঘদিন ধরে মর্গের দায়িত্ব সামলে আসছেন। কত সুন্দরীর উন্নত যৌবন হাতের নাগালে এসেছে। এই হাতেই ফালাফালা হয়েছে বহু মানুষের হৃদয়ে পুলক জাগানো কত নগ্ন শরীর।

এই তো বছর দুয়েক আগে এরকমই একটি মৃতদেহের পোস্টমর্টেমের ভার পড়েছিল তাঁর হাতে। অপরূপ সুন্দরী সেই যুবতীর মুখের দিকে তাকালেই প্রেমে পড়ে যেতে ইচ্ছে হয়। মনে হচ্ছে যেন কোনও চিত্রাভিনেত্রীর পোর্ট্রেইট আঁকার ভার পড়েছে। ডাক্তার চৌধুরী যেন নিমেষের মধ্যে পিকাসো হয়ে উঠেছিলেন। উন্মুক্ত এই যৌবনের স্পর্ধা ধরে রাখার গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করছেন।

শুধু হাতে তুলির বদলে ছুরি-কাঁচি আর গুচ্ছের ব্যবচ্ছেদের সরঞ্জাম। মেয়েটির বয়স কত হবে? বড়জোর পঁচিশের মধ্যে। গড়িয়াহাটের ব্যস্ত রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে একটা দ্রুতগামী বাসের ধাক্কা। ব্যস। সব শেষ। পুজোর ঠিক আগে। হয়তো বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। কিংবা স্লগ ওভারে চালিয়ে খেলার মতো শেষ দফার কেনাকাটি।

ঘাতক বাসের ধাক্কায় নিমেষেই সব আশা কর্পূরের মতো উবে যায়। তাও এই স্বপ্নিল সুন্দরীর মুখ কিন্তু অবিকৃতই থেকে গিয়েছে। বাসের ধাক্কাটা মাথায় লাগলেও সেভাবে ব্লিডিং হয়নি। মস্তিষ্কের ভেতরে রক্তের অনুরণন ঘটেছে। ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে ইন্টারনাল হ্যামারেজ। হ্যাঁ, ডেথ সার্টিফিকেটেও তারই উল্লেখ আছে। আর সেই চোরা রক্তস্রোতের লাভা মেয়েটির অণু-পরমাণু সবেতেই বিকিরণ ঘটিয়েছে।

আজকের এই অন্যধারার পোস্টমর্টেমে অবশ্য ডাক্তারবাবু মোটেই পিকাসো নন। একজন দক্ষ কসাইয়ের মতো নিজের জীবনের একটা পর্বের কাঁটাছেড়া করছেন।

প্রবল উচ্চাকাঙ্খী মিলন তখন ডাক্তারি পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সত্যি বলতে কী এই ব্যয়বহুল পড়াশুনার খরচ বইবার সাধ্য বা সামর্থ্য কোনওটাই ছিল না তার হতদরিদ্র দিনমজুর বাবার। এরমধ্যে মায়ের মারণরোগ ধরা পড়েছে।

এত কিছু প্রতিকূলতা নিমেষে কাটিয়ে তুলেছিল অনুত্তোমা। তাঁর প্রথম প্রেম। বড়লোক বাবা-মায়ের অজান্তেই নিজের দামি গয়না তুলে দিয়েছিল মিলনের ডাক্তারি পড়ার জন্য।

ডাক্তারিতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে অনুত্তোমাকে ঘরে তোলার কথা ছিল। কিন্তু উচ্চাভিলাষী মিলন তখন বিদেশি ডিগ্রির জন্য হাঁকপাক করছে। সেই সেতুবন্ধন ঘটিয়েছিল আরও এক বিত্তশালী ব্যবসায়ীর রূপসী কন্যা উপমা। মিলন উড়ে গিয়েছিল বিলেতে।

আর অনুত্তোমা ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়েছিল। ছিটকে গিয়েছিল অত্যন্ত দ্রুতগামী ট্রেনের ধাক্কায়। সেই ইন্টারনাল হ্যামারেজেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল অনুত্তোমার অভ্যন্তর। তাঁর সুন্দর শরীরটার ব্যবচ্ছেদের ভার পড়েছিল মিলনেরই এক ডাক্তার বন্ধুর হাতে।

রম্য রচনা—

সংসার জীবন

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

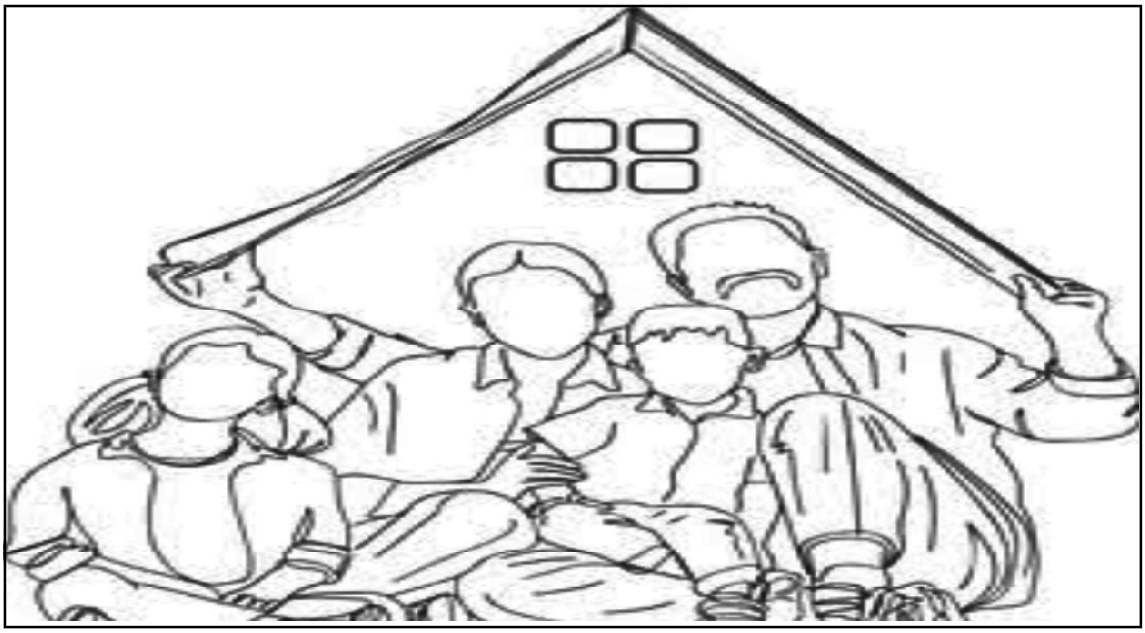

ধ্যাৎ তেরিকা, এটা একটা জীবন হল! দিনরাত গাধার মতো খাটছি। কার জন্য খাটছি জানি না। কেউ কারোর নয়। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে পর হয়ে যাবে। আদর করে মানুষ করলাম। গায়ে যেন আঁচড়টি না লাগে। তার সব কথা মেনে নিয়ে তাকে একেবারে চোখের মণি করে রাখলাম। যাঃ শালা! একদিন দেখি নিজের ঘরে রাত দুপুর পর্যন্ত ফোনে হাসাহাসি, ফিসফিস শব্দে কথাবার্তা। আমি বউকে বললুম, মেয়ের ঘরে শোবার চেষ্টা করো, গতিক ভালো ঠেকছে না। দিনকালকে বিশ্বাস নেই। বউ বলল, ওকে ওর ভালোটা বুঝতে দাও। আমি চুপ করে গেলাম। সংসার জীবনে কম কথা বলা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

সময় কেটে যায়। মেয়ে বড়ো হয়ে গেল। তার আলাদা জগৎ তৈরি হল। বেশিরভাগ কথাই জানতে পারি না। ডিগ্রি কোর্স শেষ করে চাকরি খুঁজতে লাগল। আমি বললাম, কী দরকার চাকরির? ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দেব। ওমা, মেয়ে বলল, ও কথা বলো না বাবা। আমি বললাম, কেন? মেয়ে বলল, তুমি রাগ করবে না তো? আমি বললাম, তোমার ওপর কবে রাগ করেছি হিসাব দাও। মেয়ে হাসি মুখে বলল, সেই জন্যই তো কথাটা বললাম বাবা। আমায় চাকরি পেতেই হবে। কারণ যাকে ভালোবাসি সে অতি সাধারণ একটা চাকরি করে। সংসার চালানো যাবে না। আমি অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকালাম মাত্র। পাশে বউ ছিল, তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, যত বড়ো মুখ নয়, তত বড় কথা! তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? ছোটো থেকে মাথাটা খেয়েছ। বিরাট চেঁচামেচি শুরু করল বউ। মেয়ে চুপ করে আছে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। রাতে বউ বলল, আমি অবাক হচ্ছি ভেবে, তুমি মেয়েটাকে কিছু বলছ না কেন? প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন? আমি চুপ করে রইলাম। কারণ আমি যা বলব বউ বুঝবে না। ভাবলাম, কোনওভাবেই মেয়েটার সুন্দর মনে আমি আঘাত দিতে পারব না। অনেক স্বপ্ন

নিয়ে সে ছেলেটাকে ভালোবেসেছে। এটাই তো ভালোবাসা, ভালোবেসে সব করতে চাইছে। মনে মনে বললাম, সুখী হোস মা।

ছেলেটা বড়ো হয়ে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ থেকে চাকরি পেয়ে বাইরে চলে গেল। প্রথম প্রথম খুব আসত। আস্তে আস্তে কমিয়ে দিল। পরে ফোনে জানাল মাকে, একটা মেয়েকে ভালোবেসেছে। তাকেই বিয়ে করতে চায়। আর বিয়েটা হবে ওখানেই। দক্ষিণী মেয়ে, তাদের পরিবার চাইছে ওখানেই বিয়ে হোক। বউ তো কেঁদেই অস্থির। আমি বললুম, চলো, ঘুরে আসি। ছেলেমেয়েরা বড়ো হলে তাদের মতন থাকতে দাও। নিজের জীবনটাকে ওদের বুঝে নিতে দাও। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। একবার আমার এক আত্মীয় এসে বললেন, ছেলেটার বিয়ে দিলাম, এখন খুব বেগোড়বাই করছে। দিনরাত অশান্তি করছে আমার বউ। আমি বললাম, একটা প্ল্যান দিচ্ছি করে দেখো। আত্মীয় বললেন, কী বলো? আমি বললাম, ছেলে-বউমাকে আলাদা করে দাও। ওরা ভালো থাকুক তোমরাও ভালো থাকো। কয়েক মাস পরে ওই আত্মীয় আর বৌদি এসে হাজির। হাতে ইয়া বড়ো মিষ্টির বাক্স। আমি বললাম, কী ব্যাপার গো? আত্মীয় হেসে বললেন, খুব আরামে আছি। বউমা আর শাশুড়ির খুব ভাব এখন। আলাদার ফল। আমি বউকে বললাম, যেচে অশান্তি নিও না। প্রথমদিকে রাজি হয়নি বউ। শেষে বউ, মেয়ে জামাইকে নিয়ে আমি হাজির হলাম ওদের ওখানে। ছেলে খুব খুশি আমাদের পেয়ে। বউ মিশে গেল ওদের সঙ্গে। আমি একধারে বসে ভাবলাম, ছেলেমেয়ের মুখের এই তৃপ্তির হাসিটাই তো আমরা সারা জীবন ধরে চাই। ওরা সুখী হোক। বিয়ে মিটে যাবার পর আসার সময় ছেলে বলল, বউ নিয়ে যাব বাবা। আমি বললাম, তোমাদেরই তো বাড়ি বাবা। অবশ্যই এসো, থাকো। আমরা তো চাই।

সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়। কখন যে আমরা একেবারে বুড়িয়ে গেলাম কে জানে। এখন আর তেমন কিছু ভালোলাগে না। দিনরাত ঘড়ির দিকে তাকাই, ক'টা বাজে? নিজেকেই প্রশ্ন। তবু মাঝে মাঝে মেয়েটা আসে, নাতিটা আসে তাতে একটু মুখরিত হই দু'জনে। তারপর যে কে সেই। হাঁ করে চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসে থাকি। পায়ে পায়ে হেঁটে যাব কবে সেই নদীর ধারে? ভয় হয়, কার জন্য এত কিছু করলাম? জীবনটাই বা কী! বউয়ের জন্য চিন্তা আসে। সে তো সবসময় মেয়ের সঙ্গে বকবক করছে। এই আজকে বিগ বাজারে তো কালকে আইনক্সে। কী একটা ছবি এসেছে। তোলপাড় চলছে চারিদিকে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে মানুষ সমব্যথী হয়ে চোখের জল ফেলছে। ছবি শেষ হলে, আলো জ্বলে উঠলেই বদলে যাবে মুখোশের মুখগুলো। এরই নাম জীবন, এরই নাম সংসার।

অন্ধকার এখন খুব ভালোলাগে। চুপিচুপি ভাবনায় ছন্দপতন ঘটায় না। বউ বাড়িতে এসে খাবার টেবিলে কী ছবি দেখল, মুখস্থের মতো বলে যায়। ছেলেটা আসে না ওর বোধহয় মনেই নেই। অথবা নিদারুণ যন্ত্রণাকে বুকে চেপে রেখেছে। মেয়েরা সব পারে। মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তখন ভীষণ ওকে অসহায় মনে হয়। আমি জিজ্ঞেস করি, কিছু বলবে? ও ঘাড় নাড়ে, তার মানে নয়। ভাগ্যিস মেয়েটা ছিল নইলে কী নিয়ে বাঁচত ও?

কী আশ্চর্য আজ বিছানায় শুতেই আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। অন্যদিন তো পায় না! একি সত্যিই ঘুম নাকি রবি ঠাকুরের গানে বললে, 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ...'। হায় আমি তলিয়ে যাচ্ছি নতুন দেশে।

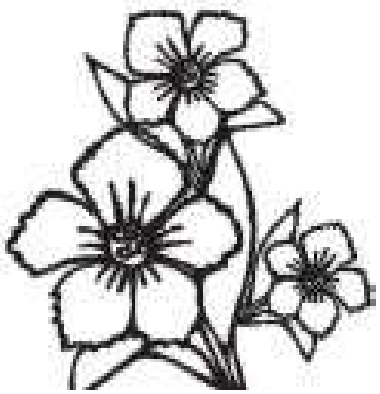

সামাজিক দায়বদ্ধ যে কোনো পেশায় নিয়োগে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট জরুরি

অভিষেক হংস, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট

সোশাল মিডিয়ার নানা সাইটের তথ্য অনুযায়ী, আরজি করের ধর্ষিতার ভিডিয়ো দেখার চাহিদা 'তুঙ্গে'বলে যে পরিসংখ্যান দেখানো হচ্ছে তা আমাদের জনসংখ্যার একটা ভগ্নাংশ মাত্র। পাশাপাশি এটাই বলতে চাই সোশাল মিডিয়ায় সব তথ্য সবসময় নির্ভরযোগ্য হয় না। অনেকে রিসার্চ বা ডেটা জোগাড়ের জন্য 'সার্চ' করেন। এরা নানা রূপে নানা পেশায় রয়েছেন। মনোবিজ্ঞানে একে বলা হয় সেক্সুয়াল পারভাসন, আর ওই শ্রেণির লোককে বলা হয় 'সেক্সুয়াল পারভার্টেড'। এরা গোপনে লুকিয়ে যৌন ছবি দেখে, মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গম করে, এমনকী নিজের নগ্ন দেহের ছবি দেখে যৌন আনন্দ উপভোগ করে। এটা নিঃসন্দেহে সামাজিক অবক্ষয়ের একটা দিক। আর্মি-নেভি বা ইউপিএসসি'র উঁচু পদে লোক নেওয়ার সময় একটা সাইকোলজিক্যাল টেস্ট নেওয়া হয়। যাতে দেখা হয় প্রার্থীর মানসিক ব্যক্তিত্ব,তিনি ওই পদের কাজের যোগ্য কিনা। আমার মনে হয় সামাজিক দায়বদ্ধ যেকোনো পেশায় নিয়োগের ক্ষেত্রে এ ধরনের সাইকোলজিক্যাল টেস্ট খুব জরুরি। সামাজিক দায়বদ্ধতার পেশা মানে ডাক্তার,পুলিশ, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী অর্থাৎ যে সব পেশার সঙ্গে সরাসরি জনগণের স্বার্থ জড়িয়ে। এক্ষেত্রে সরকারি গাইডলাইন চালু করা দরকার। অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে নজর দেওয়া হচ্ছে।

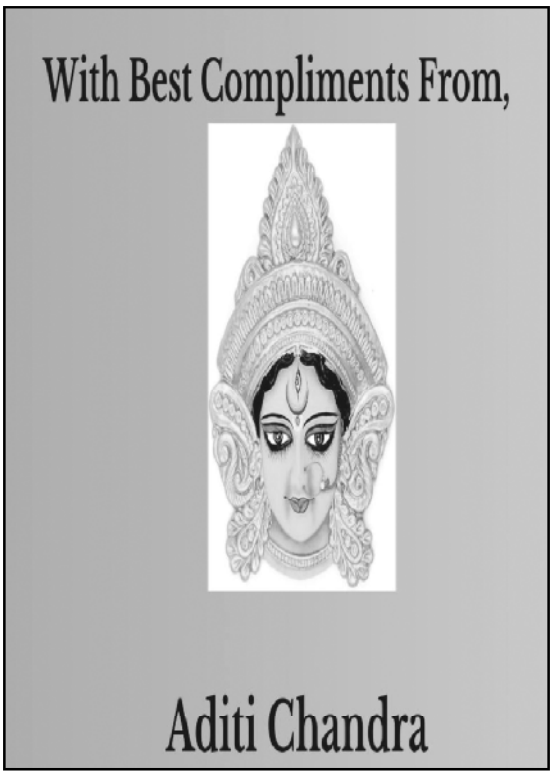

সমাজ সেবা —

সামাজিক উদ্যোগের সারথী

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্যে যারা কাজ করে চলেছেন, তাদের কথা তুলে ধরা হল।

জগৎ মুখার্জি পার্কে ‘গাছকাকু’র উদ্যান গ্রন্থাগার

শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের কাছে জগৎ মুখার্জি পার্ক। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে এখানে লোকরা আসেন প্রাতঃভ্রমণে। একটু মুক্ত বাতাস পেতে। শুধু সকাল ও সন্ধে বেড়ানো বা আড্ডার জায়গা নয়। এই পার্কের অন্যতম আকর্ষণ ‘উদ্যান গ্রন্থাগার’। এখানে রয়েছে প্রায় ১২, ০০০ বই। স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই থেকে গল্প-উপন্যাসের বই। তার সঙ্গে রয়েছে নানান পত্র-পত্রিকা। ডিজিটাল যুগে যেখানে লোকদের বই পড়া আর লাইব্রেরিতে আসা কমে যাচ্ছে, সেখানে উদ্যান গ্রন্থাগারে রোজ অন্তত ৩০ থেকে ৪০ জন পাঠক-পাঠিকা থাকেন।এই গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে জগৎ মুখার্জি পার্কের নিরাপত্তাকর্মী সত্যরঞ্জন দোলইয়ের উদ্যোগে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার লোক সত্যরঞ্জন। আটের দশকে মাধ্যমিক পাশ করার পর কলকাতায় আসেন কম্পিউটারের ট্রেনিং নিতে। তারপর অনেকদিন কম্পিউটারের কাজ করেন। ২০১০ সালে এই পার্কের নিরাপত্তারক্ষীর কাজ পান। নিজের লেখাপড়া বেশিদূর হয়নি বলে তিনি চাইতেন অন্যরা লেখাপড়া করুক। বইয়ের প্রতি ভালোবাসা থেকে পার্কে গড়ে তোলেন এই লাইব্রেরি। নাম দেন ‘উদ্যান গ্রন্থাগার’। সত্যরঞ্জন জানান, ‘অল্প কিছু পত্র-পত্রিকা নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। এরপর বইপ্রেমীরা ও স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বই দান করেন।’ তিনি জানান, ‘পার্কের আশপাশে রয়েছে শ্যামবাজার এভি স্কুল, নিবেদিতা স্কুল, গিরিবালা স্কুল আর শৈলেন্দ্র সরকার স্কুল। ওইসব স্কুলের অভিভাবকরা এই লাইব্রেরিতে পড়তে আসেন। তাছাড়া এখানের ‘মোদি হাউস’এ অনলাইন পরীক্ষা দিতে আসা ছেলেমেয়েরাও এই লাইব্রেরিতে আসেন। বইপড়া ও সদস্য হওয়ার জন্য কোনো চাঁদা লাগে না।এই পার্কে শুধু লাইব্রেরি নয়, সত্যরঞ্জন চালু করেছেন ফুটপাতের গরিব ছেলেমেয়েদের জন্য ‘পাঠশালা’। যেখানে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিখরচায় পড়ানো হয়। তিনি নিজে ছাড়াও প্রাতঃভ্রমণকারীরা বাচ্চাদের পড়ান। উদ্যানে রয়েছে অন্তত ১,০০০ গাছ। তার মধ্যে রয়েছে বাহারি ক্যাকটাস, বনসাই, বনৌষধি আর নানারকমের গাছ। সত্যরঞ্জন নিজের হাতে আম-জামসহ নানা গাছের চারা তৈরি করেন। পরিবেশ দিবসে নিখরচায় গাছ বিলি করা হয়।গাছের প্রতি ভালোবাসার জন্য সত্যরঞ্জনকে স্থানীয় ছেলেরা ডাকে ‘গাছকাকু’ বলে। এই উদ্যানের গাছের পরিচর্যার পাশাপাশি রবীন্দ্রসদনের পাশের বাগানেও তিনি গাছের পরিচর্যা করেন। নিজের মাইনের পয়সায় তিনি যাবতীয় কাজ করেন। ‘গাছকাকু’ জানান, ৮ নং ওয়ার্ডের পুর কাউন্সিলার পূজা পাঁজা তাঁকে কলকাতা পুর নিগমের এই জমিতে যাবতীয় সামাজিক কাজের অনুমতি দিয়েছেন আর তিনি সবসময়ে পাশে থাকেন। গ্রন্থপ্রেমী ও বাগানবিলাসী এই মানুষটির একটাই স্বপ্ন পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও তাঁদের মধ্যে সবুজায়নের বীজ বোনা। আর তার সঙ্গে পড়ুয়াদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলা।

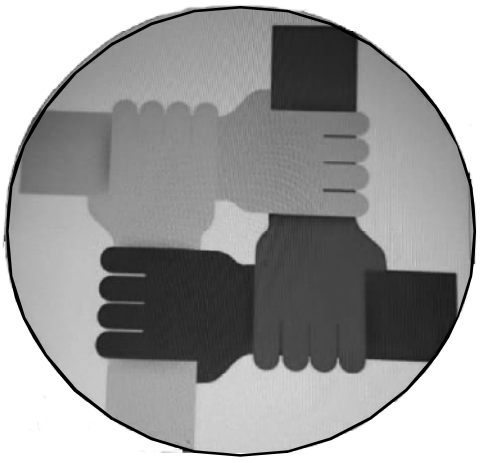

রক্ত সংকটের পাশে

বারুইপুর নড়িদানা স্বপ্ন সন্ধান

প্রায় ৩ দশক ধরে মুর্মুষু রোগীদের রক্তের জোগান দিয়ে চলেছে বারুইপুরের ‘নড়িদানা স্বপ্ন সন্ধান’, রক্তের জোগানে

প্রতিমাসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এই সংস্থা। এ পর্যন্ত ৩০০ থেকে ৪০০ রক্তদান শিবির করেছে। সংস্থার স্লোগান 'অবিরাম রক্তদান'। রক্ত দিয়ে কয়েক হাজার মুর্মুষু রোগির জীবন বাঁচিয়েছে। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য রক্তের সংকট মোচন আর রক্তদান সম্পর্কে সাধারণ লোককে সচেতন করা। যাতে তাঁরা আরো বেশি করে রক্তদানে এগিয়ে আসেন। নড়িদানা স্বপ্ন সন্ধান- এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ সুমিত মন্ডল পেশায় সরকারি কর্মি কিন্তু তাঁর নেশা সমাজসেবা। লোকের পাশে থাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নানা এলাকায় রক্তের সংকট দেখে তাঁর এই উদ্যোগ নেওয়া। ফেসবুকে প্রতিটি রক্তদাতার নাম ও পদবির সঙ্গে রক্তের গ্রুপ যোগ করে একটা ভার্চুয়াল ব্ল্যাডব্যাঙ্ক তৈরি করেছেন। যাতে রক্ত লাগলে বোঝা যায় কে কোন গ্রুপের রক্তদাতা। আর এই অভিনব কাজের জন্য আপওয়ার্ড-এর পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সম্মান আর এবিপি গ্রুপের পক্ষ থেকে 'আমি আমার মত সম্মান' পেয়েছেন। সুমিত মণ্ডল জানান,' আগের চেয়ে অনেক সচেতনতা বাড়ায় সাধারণ লোক আরো বেশি করে রক্ত দিতে এগিয়ে আসছেন। বিশেষ করে অতিমারির সময় থেকে এই জেলার নতুন ছেলেমেয়েরা রক্তদানে শামিল হচ্ছেন। রক্তদান নিয়ে এখনো কিছু লোকের ভুল ধারণা বা সামাজিক ট্যাবু রয়েছে। সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে তা ধীরেধীরে কেটে যাচ্ছে'। তিনি আরো জানান, 'এ রাজ্যে রক্তের যা চাহিদা সেই তুলনায় জোগান কম থাকায় রক্তের সংকট দেখা যায়। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই সমস্যা বেশি হয়। এ সময়ে রক্তদান শিবির কম হয়।' এই সংস্থা কীভাবে রক্তের সংকটে রোগীর পাশে থাকে? সুমিত মণ্ডল জানান, 'রক্তের দরকারে যে কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। রক্তের গ্রুপ জানলে আমরা কার্ডের ব্যবস্থা করে দিই। সবসময়ে মুর্মুষু রোগীর পাশে থাকি। এখানে কোনো আর্থিক লেনদেনের ব্যাপার নেই'। **যোগাযোগ ঃ** নড়িদানা স্বপ্ন সন্ধান, নড়িদানা, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

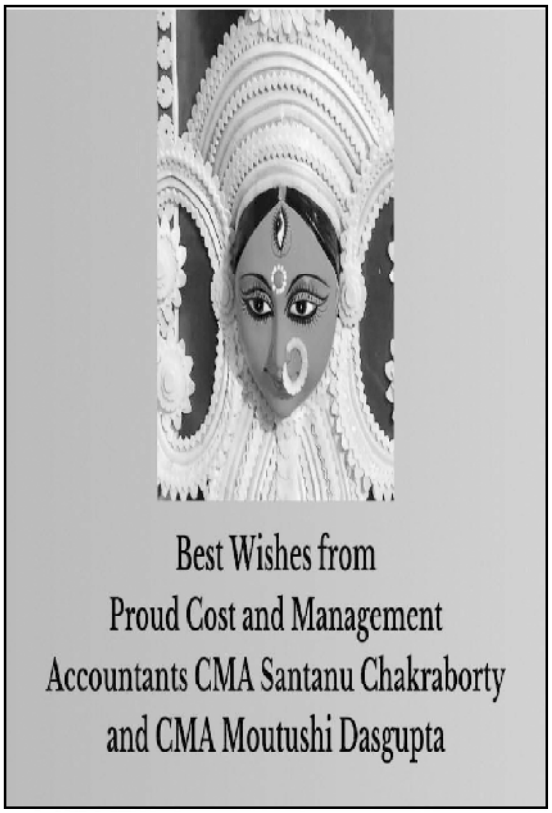

উদ্যোগ—

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ভবিষ্যৎ ও এআই'র ব্যবহারিক প্রয়োগ

দেবজ্যোতি ঘোষ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) সমাজের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসাবে পরিচিত। এমএসএমই হল এমন এক ধরনের উদ্যোগ বা ব্যবসা, যা তার আকার, মূলধন বিনিয়োগ এবং কর্মী সংখ্যা অনুযায়ী ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র বা মাঝারি শ্রেণিতে পড়ে। এমএসএমই দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বড়ো সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়ক এবং দেশীয় উৎপাদন ও রফতানি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ত্তত্রত্ত উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর সুযোগ তৈরি হয়।

এমএসএমই ক্ষেত্রকে সরকারি ও বেসরকারি ভাবে নানা ধরনের সাহায্য করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে, আর্থিক সাহায্য, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির উন্নয়ন, বাজারের সুযোগ তৈরি। ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এমএসএমই'র সংজ্ঞা বদল করে, যাতে আরও বেশি উদ্যোগকে এই খাতে আনা যায় আর তাদের সাহায্য করা যায়। এখন দেশের আর্থিক অবস্থা এমন যে বড় শিল্পের সম্ভবনা কম অথচ ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায় সুযোগ আর সম্ভাবনা বেশি। আগামীদিনে এই প্রবণতা আরো বাড়বে বলে মত অর্থনীতিবিদদের।

ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের সম্ভাবনা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ভারতের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভবিষ্যতে এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। ভারতের অর্থনীতিতে এমএসএমই'র ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু কারণ উল্লেখ করা হল :

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা : এমএসএমই ভারতের বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে একটি। এটি গ্রামীণ আর শহুরে উভয় এলাকায় লাখ লাখ মানুষের জীবিকার সংস্থান করে। ভবিষ্যতে, এমএসএমই আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরিতে সাহায্য করবে, যা বেকারত্ব কমাতে সহায়ক হবে। পরিসংখ্যান বলছে, শ্রমিকের সংখ্যা গত বছরের জুলাই মাসে ১২.১ কোটি ছিল যা এই বছর ৬৬ শতাংশ বেড়েছে। তার মধ্যে ৪.৫৪ কোটি মহিলা কর্মী রয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন : ভারতের বেশিরভাগ জনসংখ্যা এখনও গ্রামীণ এলাকায় বাস করে। এমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামীণ অঞ্চলে শিল্পায়নের প্রচার করে এবং স্থানীয় জনগণকে জীবিকার সুযোগ দেয়। ভবিষ্যতে, এমএসএমই'র মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির আরও উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। গ্রামীণ এলাকায় ৫১.২৫ শতাংশ গ্রামীণ ইউনিট রয়েছে আর শহর এলাকায় রয়েছে ৪৮.৭৫ শতাংশ এমএসএমই ইউনিট।

রফতানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা : ভারতের এমএসএমই বিশ্ববাজারে উল্লেখযোগ্য রফতানি সামগ্রী সরবরাহ করে। উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে এমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো ভবিষ্যতে ভারতের রফতানি বাড়াতে সাহায্য করবে, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বাড়াবে।

উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন : এমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্ভাবনী আর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। ভবিষ্যতে এআই, মেশিন লার্নিং ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এমএসএমই খাতে আরও বেশি উদ্ভাবনী ও দক্ষ করে তুলবে।

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি এবং সাম্যতা : এমএসএমই দেশের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক আর অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভবিষ্যতে, এমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্যতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যা সমাজে আর্থিক বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে।

আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে সহায়ক : ভারতের সরকার 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগকে সফল করতে এমএসএমই বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ভবিষ্যতে, এমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো দেশীয় উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানি নির্ভরতা কমাতে এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ২০২৪-২৫ বাজেটে এমএসএমই জন্য ২২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যাতে যুবসমাজ উৎসাহিত হয়

স্মার্ট-আপ উদ্যোগী হিসেবে কাজ শুরু করতে।

আজকের প্রযুক্তি-বান্ধব বিশ্বে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এমএসএমই ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এআই-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্র আলোচনা করা হল:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল এমন এক ধরনের প্রযুক্তি যেখানে কম্পিউটার এবং মেশিনগুলো মানুষের মতো চিন্তা আর কাজ করতে পারে। এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে মেশিনগুলো ডেটা বিশ্লেষণ, সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে যেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়।

এআই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যেমন স্বয়ংক্রিয় গাড়ি, ভাষা অনুবাদ, স্বাস্থ্যসেবা, গ্রাহক সেবা আরও অনেক ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার হচ্ছে। এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠছে এবং প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে আরও সহজ এবং কার্যকর করে তুলছে। এআই-এর মাধ্যমে নানা সমস্যার সমাধান করা যায়।

গ্রাহক সেবা ও সমর্থন : এমএসএমই কোম্পানির চ্যাটবট ও ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে এমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত ও কার্যকর গ্রাহক পরিষেবা দিতে পারে। বাংলা ভাষায় চ্যাটবট তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় গ্রাহকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখা সহজ হয়।

বিপণন ও বিজ্ঞাপন : এআই-এর মাধ্যমে গ্রাহকদের পছন্দ, আচরণ এবং বাজারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে কাস্টমাইজড বিপণন ক্যাম্পেইন তৈরি করা যায়। এর ফলে এমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলি কম খরচে আরও বেশি গ্রাহকের কাছে পৌঁছোতে পারে।

উৎপাদন ও সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এআই-এর ব্যবহার করলে তা আরও দক্ষ ও কার্যকরী হয়। এছাড়া, সাপ্লাই চেনের বিভিন্ন স্তরে এআই প্রয়োগ করে মজুত ব্যবস্থাপনা, ডেলিভারি এবং সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা যায়। কিন্তু এটাও বলা বাহুল্য যে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ খুব জরুরি।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা : এমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অর্থনৈতিক ডেটা বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এআই-এর মাধ্যমে এই বিশ্লেষণ আরও নির্ভুল ও দ্রুতগতিতে করা সম্ভব, যা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঝুঁকি কমাতে এবং ভালো ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

কর্মী দক্ষতা উন্নয়ন : এআই ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন করতে পারে। এতে কর্মীরা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। যাতে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সক্ষম হয়।

এআই-এর সঠিক প্রয়োগ এমএসএমই ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে। বাংলাভাষী এমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এআই-এর সম্ভাবনা অপরিসীম, যা তাদের ব্যবসা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে।

উদ্যোগীর কথা: স্বপ্নপূরণে উদ্যমী অর্চিস্মান
নামি কর্পোরেট সংস্থার দামি চাকরি ছেড়ে এখন
সফটওয়্যার সংস্থার সফল উদ্যোগী অর্চিস্মান পাল।

খড়গপুরের ছেলে। খড়গপুর সিলভার জুবিলি স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ। এরপর কলকাতার হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ২০০৯ সালে বি টেক পাশ করে ইনফোসিসে চাকরি পান অর্চিস্মান। সংস্থার ভুবনেশ্বর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাখায় সুনামের সঙ্গে প্রায় ১০ বছর চাকরি করেন। ২০১৯ সালে কলকাতায় ফিরে ৪ বছর আরেক নামি কোম্পানিতে চাকরি করেন। তবে ওই পর্যন্তই। চাকরির একঘেয়ে ঘেরাটোপে ক্লান্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে ২০২২ সালে নিজেই গড়ে তোলেন আইটি কনিয়া সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড। বাবা, মার কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়ে তাঁদের নামে এই কোম্পানি খোলেন অর্চিস্মান। স্টার্ট আপ গড়ে তুলতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন আইসিএআই'র প্রাক্তন সভাপতি মানস কুমার ঠাকুর। তাঁর সংস্থায় কাজ করেন চার কর্মী। তৈরি হয় আইটি সংক্রান্ত প্রোডাক্ট। তার মধ্যে রয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর অ্যানালিটিক্যাল। এই সব প্রোডাক্ট যায় মার্কিন দেশে। সংস্থার কর্ণধার অর্চিস্মান জানান, 'প্রথম বছর ২০২২ সালে কোম্পানির টার্নওভার ছিল ৩০ লাখ টাকা। পরের বছর একটু মন্দা যায়, আর এই বছর টার্নওভার ১ কোটি টাকা। আমার লক্ষ্য ওই টার্নওভার আগামী বছর ৫ কোটিতে নিয়ে যাওয়া।' অর্চিস্মানের কথায়, 'খুব উচ্চ শিক্ষিত বা মেধাবী নয়। সাধারণ মেধার ছেলেমেয়েকে নিয়ে কাজ করতে চাই। নিজের ব্যবসা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুনদের কাজের সুযোগ তৈরি করতে চাই।'

অভিমত —

বাঙালিকে বাণিজ্যমুখী করতে শিল্পের নার্সারি করতে হবে

দিব্যেন্দু নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট

বাঙালির সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কী বদল হচ্ছে ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের ছোটবেলার দিনগুলোয় ফিরে যেতে হবে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত স্কুলের পাঠ চুকিয়ে, কিছু জলখাবার খেয়ে মাঠে ময়দানে ছোটাছুটি করে খেলা আর তারপর বাড়িতে সন্ধ্যে নামার আগে পড়তে বসা। এরমধ্যে বিনোদনের সময় বলে আলাদা তেমন কিছু ছিল না। বিনোদন বলতে তখন একমাত্র আকাশবাণী। শুক্রবারের সন্ধ্যায় নাটক। আর শনিবার ও রবিবার " অনুরোধের আসর"। রেডিওর গল্পদাদুর আসর, বিকেলে খেলার সময়ই থাকত। আর বাইরের যোগাযোগের জন্য অবশ্যই থাকত খবরের কাগজ। তখন ছিল দি স্টেটসম্যান এর যুগ। ইংরিজি শেখার জন্য।

আজকের দিনে ইন্টারনেট মিডিয়ার রমরমা সময়। সোশাল মিডিয়ার বিশেষ প্রভাব পড়েছে এই সময়ের ছেলেমেয়েদের ওপর। এই মশলাদার বিনোদনের মধ্যে কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ তা বোঝার মত মানসিকতা তাদের হয়নি। তাদের চিন্তাধারায় যে প্রভাব পড়েছে তাতে খারাপের দিকটাই বেশি আসছে। সেই পুরোনো দিনের প্রভাত ফেরি, বিজয়ার কোলাকুলি, বয়স্কদের প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধা বাঙালির সংস্কৃতি থেকে প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। তবে নতুন প্রজন্মের সবকিছুই যে খারাপ তা বলব না। পৃথিবী কেমন এগোচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই নতুন প্রজন্ম জানছে। কিন্তু তাদের মনের কোমল ভাব শুকিয়ে যাচ্ছে। এখন কেউ রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল কে নিয়ে ভাবে না। তার জায়গায় স্থান পেয়েছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। চারদিকে বৃদ্ধাশ্রম। আর এই স্রোতে গা ভাসাতে পারলে আপনি সুখী, না হলে এ পরিস্থিতি খুব কঠিন ও নিষ্ঠুর।

—বাঙালি কী ব্যবসাবিমুখী—

সেভাবে বলতে গেলে বাঙালি তেমনভাবে বড় শিল্প উদোগী কখনই ছিল না। স্যার বীরেন (উনি অবশ্য সাধারনভাবে আধা সাহেবই ছিলেন) ছাড়া তেমনভাবে বড় শিল্প কেউ গড়েননি।। দাসনগর, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ক্যালকাটা কেমিক্যাল,বেঙ্গল কেমিক্যালস ইনটেক সেনরোলে ইত্যাদি কিছু সংস্থার নাম করা যায়। কিন্তু প্রায় সবগুলো উর্বর মস্তিষ্কের অভাবে বিরাট হয়ে উঠতে পারিনি। তারপর সেই ঘেরাও জমানা শিল্পের শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। যুব সমাজের মধ্যে জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক মানেই শ্রেণীশত্রু এইসব চিন্তা ঢুকে গেল। পড়াশোনার শেষে একটা চাকরি পাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে গেল। এখনো তাই চলছে। ক্ষুদ্র শিল্পে কারোর উৎসাহ নেই। তার একটাই কারন বাঙালির পরিশ্রম বিমুখতা। স্টাট আপ - আমাদের বাংলায় হয়ই না বলা চলে। এখন শুরু হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে তোলাবাজি, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির চাপ।

আর এর থেকে বেরোনোর একটাই উপায় হল সরকার কে শিল্পের নার্সারি তৈরি করতে হবে। নিজেদের ছাতার তলায় ছোটো ছোটো শিল্প তৈরি করতে হবে। একটু সচল হলে আগ্রহী দের বিক্রি করতে হবে। তার জন্য চাই যথেষ্ট।পরিশ্রম, বিজ্ঞাপন ও তার সঙ্গে যুব সম্প্রদায় কে শিক্ষিত করতে হবে। তাদের মনে ঢোকাতে হবে যে তারা চাকরির খোঁজে না থেকে অন্যকে চাকরি দেওয়ার কথা ভাবুক।

মুক্তচিন্তা—

বাঙালি তাঁর সংস্কৃতি ধরে রেখেছে

অভীক রায়, ডেপুটি সেক্রেটারি, ভারত চেম্বার অফ কমার্স

বাঙালির সংস্কৃতি বদলায়নি। বাঙালি যেখানে যা কিছু ভালো দেখেছে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছে। নতুন যা কিছু দেখেছে সাদরে গ্রহণ করেছে। বাংলা শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে তার প্রভাব পড়েছে। বাংলা ভাষায় নানা বিদেশি এসেছে। যেমন, মা দুর্গা অসুর কে বধ করে অশুভ শক্তির বিনাস করেন। এই অসুর শব্দ এসেছে অহুর থেকে। যা পার্সি শব্দ। এভাবে বাংলা ভাষায় নানা বিদেশি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের বর্ণ পরিচয় শিখিয়েছেন। তিনি বিসর্গ বা চন্দ্রবিন্দু ব্যঞ্জনবর্ণে এনেছেন, আসলে এগুলো তো স্বরবর্ন। যেমন, অকালবোধন এর উল্লেখ পাওয়া যায় বাল্মীকির রামায়ণে কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়নে সে ভাবে উল্লেখ নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির রূপান্তর হয়েছে কিন্তু বদল হয়নি।

নয়ের দশকে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের সময় থেকে বাঙালি হয়েছে গ্লোবাল সিটিজেন বা বিশ্বনাগরিক। কিন্তু বিশ্বের যেখানেই বাঙালি থাকেন দুর্গা পূজায় মেতে উঠেন। ঐতিহ্য মেনে পূজো করেন। গত কয়েক বছরে বাঙালি পুরোহিতদের ভিসার চাহিদা বেড়েছে। এমনকি নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ও দেখা যায় বিদেশ থেকে পুজোর সময় বাড়ি ঘিরে অষ্টমীতে ধুতি পাঞ্জাবি বা শাড়ি পরে ভক্তি ভরে অঞ্জলি দেয়। নিজেদের শিকড় খুঁজে পেতে চায়। এরপর কী বলা যায় বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বদল হয়েছে?

নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মুখের ভাষা বাংরিজি। তারা বাংলা ও ইংরিজি মিশিয়ে কথা বলে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করায় ও ইংরিজি কাজের ভাষা হওয়ায় তাদের মধ্যে ইংরিজিতে কথা বলার প্রবণতা দেখা যায়। দোষ তাদের নয় বরং আমাদের বড়দের। সন্তানদের বাংলা শেখাতে পারছি না। তাদের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করতে পারছি না। অনেক বাবা মা ও গর্বের সঙ্গে বলেন, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না।

সাড়ম্বরে দুর্গা পুজো করাই বলে দেয়, বাঙালির সংস্কৃতির বদল হয়নি। শারদ উৎসব বাঙালির আবেগ ও ভালোবাসার। উৎসবের চার দিনের জন্য বাঙালি সারা বছর অধীর অপেক্ষায় থাকেন।

পরামর্শ—

বাঙালি ছেলে মেয়েদের প্রতিযোগিতার মনোভাব কমছে

রামকমল সাহা, জেনারেল ম্যানেজার (ফাইন্যান্স), সেইল

গত ৩- ৪ বছর ধরে দেখছি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় নিয়োগের ক্ষেত্রে বাঙালি ছেলে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। ইন্টারভিউয়ে বাঙালি ছেলে মেয়েদের খুঁজে পাওয়া কঠিন হচ্ছে। সে তুলনায় অন্য রাজ্যের ছেলেমেয়েদের নাম বেশি পাওয়া যায়। শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় নয়, সর্ব ভারতীয় চাকরির পরীক্ষায় ও বাঙালিরা পিছিয়ে পড়ছে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বা অন্য রাজ্যের ছেলে মেয়েরা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় যতটা সাফল্য পাচ্ছেন বাঙালিরা ততটা পাচ্ছে না। ।একটাই কারণ, বাঙালি ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব কমছে। সরকারি চাকরিতে শূন্য পদের তুলনায় কর্ম প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা হয়। সাফল্য পেতে চাইলে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। বাঙালি ছেলে মেয়েরা চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পায়। সেইল, ভেল, ও এনজিসি ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় নিয়োগা করা হয় নিধারিত পরীক্ষার মাধ্যমে। রীতিমতো পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পেতে হয়।

সরকারি বনাম বেসরকারি চাকরি

আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার দিক থেকে সরকারি চাকরি অনেক এগিয়ে। হাতে গোনা নামমাত্র নামি বেসরকারি সংস্থায় উচু পদের ক্ষেত্রে বেতন ভালো। তবে বেশিরভাগ সংস্থায় নিচু পদের কর্মীদের বেতন বেশ কম। তেমনভাবে সুযোগ সুবিধাও নেই।অন্যদিকে,প্রতি মুহূর্তে কাজ হারানোর ভয় থাকে।

কমার্স নিয়ে পড়লেও উজ্জ্বল কেরিয়ার

সবার ধারণা, শুধুমাত্র সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করলে উজ্জ্বল কেরিয়ার করা যায়। আর এই আপ্তবাক্য মেনে অভিভাবকরাও ছেলে মেয়েকে সায়েন্স নিয়ে পড়তে চান। হ্যাঁ,সায়েন্স নিয়ে পড়ার পর নানা দিকে যাওয়া যায়। কিন্তু এখন কমার্স নিয়ে পড়ার পরও ব্রাইট কেরিয়ার করা যায়। পেশাদারি ক্ষেত্রে কেরিয়ার গড়তে চাইলে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কষ্টিং, কস্ট ম্যানেজমেন্টবা কোম্পানি সেক্রেটারি কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। কমার্স নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশ করার পর মাস্টার ডিগ্রি যেমন করতে পারেন, তেমনি ম্যানেজমেন্ট, ফরেন ট্রেড ইত্যাদি প্রফেশনাল কোর্স ও করা যায়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরীক্ষায় বসা যায়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের পরীক্ষায় শুধুমাত্র কমার্স শাখার ছেলে মেয়েরা যোগ্য। ব্যবসার ক্ষেত্রে জি এসটি বাধ্যতামূলক হওয়ায় কমার্স শাখার ছেলে মেয়েদের কাজের সুযোগ অনেক বেড়েছে। সাধারণ কমার্স গ্র্যাজুয়েটরা ট্যাক্স বিষয়ে শর্ট কোর্স করেও পেশাদারি কাজ করে ভালো রোজগার করতে পারেন। পেশাদারী কাজের জন্য হাতে কলমে কাজের দক্ষতা(স্কিল) অর্জন করা খুব জরুরি।

কৃতীর কথা

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কাজের ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা

সৈকত গুপ্ত, ভাইস প্রেসিডেন্ট (হিউম্যান রিসোর্স) মেট্রিক্সনিউমেরো টেকনোলজি প্রা লি এমসিএ আর মানবসম্পদ বিষয়ে এমবিএ কোর্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ২০০০ সালে আমার কেরিয়ার শুরু হয় ওয়েবেল ইনফর্মেটিক্স লিমিটেডে। তারপর একে একে এইচসিএল ইনফোসিস্টেমস, আলফা নিইমেরো, ট্রানসাসিস টেকনোলজিসহ নানা সংস্থায় চাকরি করার পর, এখন হায়দরাবাদের এই বহুজাতিক সংস্থায় ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব সামলাচ্ছি। আমার দায়িত্ব একদিকে যেমন রিক্রুটমেন্টের, অন্যদিকে তেমনি কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়া আর সংস্থার প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানো। দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কাজের বাজার ওঠানামা করে। দক্ষতা থাকলে কাজের অভাব হয় না। এই শিল্পে কাজের ক্ষেত্রে নানা সুবিধা রয়েছে। যেমন— সপ্তাহে ৫ দিন কাজ করতে হয়, অফিসে বসে কাজের পাশাপাশি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করা যায়, অন্য জায়গায় গেলেও সেখানে বসে কাজের সুযোগ রয়েছে, নামি সংস্থায় চাকরি করলে কর্মীদের রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়, বার্ষিক বোনাস ছাড়াও অনেক কোম্পানি প্রফিট অনুযায়ী বোনাস, এমনকী জয়েনিং বোনাস দেওয়া হয়।

মনে মনে —

চেনা মানুষের অজানা কথা

আইসিএআই এর পদাধিকারী থাকার সময় কাজের সূত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কে খুব কাছ দেখার অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছেন ICMAI'এর প্রাক্তন সভাপতি ও মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মানস কুমার ঠাকুর

দেশ-বিদেশে কৌটিল্য ছিলেন প্রণব মুখার্জি

দেশে ও বিদেশে কৌটিল্য নামে পরিচিত ছিলেন প্রণব মুখার্জি। ওঁনার সঙ্গে আমার কতবার কথোপকথন হয়েছে তা বলা মুশকিল। আমার হিসেবে অন্তত ৩০বারের বেশি। তাঁকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আজ অনেক কথা মনে পড়ছে। ২০০৪ সালে ভোটে জিতে আমি পূর্ব ভারতের সদস্য হলাম (আইসিএম এর)। তখন আমার ক্ষমতা অনুযায়ী খুঁজতে লাগলাম এমন কোনো মন্ত্রী বা সরকারি আধিকারিক যার সঙ্গে আমার জানাশোনা রয়েছে। প্রথমেই মনে পড়ে দাদার বন্ধু ও আমার খুব কাছের মানুষ মুক্তিদার (মুক্তি ধর) কথা। যাঁর সঙ্গে প্রণব মুখার্জির খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সেই থেকে যতবার প্রণব মুখার্জির সঙ্গে দেখা করেছি উনি আমাকে মুক্তির ভাই বলতেন। ২০০৪-২০০৭ সালে জঙ্গিপুরে প্রণব মুখার্জির সঙ্গে বেশ কয়েকবার আমার দেখা করিয়ে দেন মুক্তিদা। তখন বুঝেছিলাম শুধু কাউন্সিল সদস্য হলে হবে না, দরকার বড়ো পদ। ২০০৭ সালে ফের ভোটে লড়লাম ও আইসিএআই-র সেক্রেটারি হলাম। চেয়ারম্যান হন কে কে সরকার। সর্বভারতীয় সভাপতি হন দিল্লি থেকে চন্দ্র ওয়াধার। আমার বেশ মনে আছে, ওই সময় সভাপতির এক অনুষ্ঠানে প্রণব মুখার্জিকে প্রধান অতিথি করার কথা ভাবা হয়। আর তার ব্যবস্থার দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। এটাই ছিল আমার টাস্ক। আমি সেই চেষ্টা করি। ওই সময় আমাদের সংস্থার যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন (আমার বিরোধীপক্ষ), উনি আচমকা প্রচার করে দেন এটা মানসের কাজ নয় । প্রণব মুখার্জি তখন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। মুক্তিদার মাধ্যমে প্রদ্যুৎ গুহর সঙ্গে আমার খুব ভালো পরিচয় ছিল। আর প্রদ্যুৎ গুহ ছিলেন প্রণব মুখার্জির ব্যক্তিগত সচিব। যাই হোক, অনুষ্ঠানের দিন আমি নিজে প্রণব মুখার্জির ঢাকুরিয়ার বাড়িতে যাই । উনি তখন পিয়ারলেস ইন-এর (যেখানে তাঁর অনুষ্ঠান ছিল) দিকে রওনা দিচ্ছিলেন। আমায় দেখে বলেন, 'এই যে মুক্তির ভাই আমার সঙ্গে গাড়িতে এস'। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে কথা! তাঁর সঙ্গে আমি এক গাড়িতে পাশাপাশি বসে। মাঝে শুধু একটা বালিশ । আমাদের অনুষ্ঠানে আসার সময় উনি গাড়িতে জানতে চান, কী কী বলতে হবে। মজার কথা গাড়িটা যখন পিয়ারলেস ইন-এ ঢুকছে তখন আমাদের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির চোখ ছানাবড়া! এই মজা বেশ উপভোগ করি। এরপর প্রোটোকল অনুসারে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি প্রণব মুখার্জিকে নিয়ে অনুষ্ঠানে চলে যান। আমি পড়ে থাকলাম। ওদিকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। আচমকা আমাদের সভাপতি কাছে এসে বলেন, মানস তুমি একটু বলে দাও আমাদের দিল্লিতে অনুষ্ঠানের জন্য। আমি বললাম, স্যার আপনি পাশে বসে রয়েছেন। আপনি বলুন, পরে আমি বলে দেব। ওই অনুষ্ঠানে প্রণব মুখার্জি বলেন, কস্ট অ্যাকাউন্টিং এমন এক পেশা যার সঠিক প্রয়োগ করলে ভারতের মতো গরীব দেশ আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হবে। আর একটা কথা খুব মনে পড়ে। ২০০৯ সালে ভারত সরকারের দু'বার বাজেট হয়। আমি যখন জঙ্গিপুরে ওঁর সঙ্গে দেখা

করতে গেলাম । তখন উনি আমাকে বলেন, শুধু পদ নিয়ে বসে থাকলে হয় না, কাজ করতে হয়। প্রফেশনটা দেখো যাতে সমাজের কল্যাণে কাজে লাগানো যায়'। ওঁর কথা শুনে অবাক হই। বাইরে এসে প্রদ্যুৎদাকে প্রশ্ন করলাম, কী হয়েছে? তখন প্রদ্যুৎদা বলেন, তোদের প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের সর্বভারতীয় সভাপতি এসে এক্সাইজ অডিট নিয়ে কথা বলেছিলেন। ওরা কত রিসার্চ করেছে যাতে সরকার বা শিল্পের কাজে লাগে। বলাবাহুল্য, তখন এক্সাইজ অডিট শুধু কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টরা করতে পারতেন। বাড়ি ফিরে এসে ওই সময়ের সভাপতি কুণাল ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলি। সর্বভারতীয় সভাপতি কুণাল ব্যানার্জি আইসিএআইএ-র সদস্যদের বলেন, সিএ রা চাইতেই পারে কিন্তু কোনোদিন এক্সাইজ অডিট করতে পারবে না। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে যখন প্রণব মুখার্জি বাজেট পেশ করেন, তখন দেখা গেল এক্সাইজ অডিট শুধু আমাদের পেশার লোকেরা নয়, সিএ-রাও করতে পারবেন। দু'টো ইনস্টিটিউটের সভাপতির মধ্যে একটা সমঝোতা হয়। পরের মিটিংয়ে আমি প্রণব মুখার্জিকে প্রশ্ন করেছিলাম, এটা কেন করলেন? তাঁর জবাব ছিল, 'আমার কাছে আগে দেশ, সমাজ । তারপর ব্যক্তি'। নিয়ম অনুসারে একদিন সংস্থার পূর্ব ভারতের সভাপতি হলাম। তখন প্রণব মুখার্জি ভারতের রাষ্ট্রপতি। কোনও অনুষ্ঠানে তাঁকে আনা সহজ নয়। ২০১৭ সালের ২২ মে আমার বাবা প্রয়াত হন। প্রদ্যুৎ গুহ পরের দিন আমাকে সমবেদনা জানিয়ে ফোন করেন। তখন আমি প্রদ্যুৎদাকে বলি, দাদার সঙ্গে (প্রণব মুখার্জি) আমার একসঙ্গে মঞ্চে বসা হলো না । তখন প্রদ্যুৎদা আমায় বলেন, জুন মাসের শেষে দাদা কলকাতায় আসবেন, তোরা রেডি থাক। জুনের শেষ সপ্তাহে আমরা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল কনফারেন্স করি। সেখানে ছিলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি, রাজ্যের ওই সময়ের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী আর ওই সময়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম মেঘওয়াল। আমার মনের ইচ্ছা সেদিন প্রদ্যুৎদা পূরণ করেন। প্রণব মুখার্জিকে বলা হত সংকটত্রাতা। যে কোনও সমস্যার সমাধানে তিনি ছিলেন মধুসূদন। ১৯৮৪ সালে, যুক্তরাজ্যের ইউরোমানি পত্রিকার এক সমীক্ষায় তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ৫ অর্থমন্ত্রীর অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হন। দেশের প্রতি অবদানের জন্য তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ আর দ্বিতীয় অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন ও পদ্মভূষণ দেওয়া হয়। প্রণব মুখার্জির কেরিয়ার শুরু শিক্ষকতা দিয়ে। পরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেন। ইন্দিরা গান্ধীর হাত ধরে ১৯৬৩ সালে রাজ্যসভার সাংসদ হন। তাঁর হবি ছিল বই পড়া। একসঙ্গে ৩টে বই পড়তে পারতেন । মঙ্গলবার ছাড়া তাঁর খাবারের তালিকায় থাকত আপেল, মাছের ঝোল ও সাদা ভাত। প্রতিবার পুজোয় নিজের জেলা বীরভূমে আসতেন। খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ ছিলেন। ৪০ বছর ধরে ডায়েরি লেখেন আর বলে যান তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশ করতে। রোজ রাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেন শুয়ে শুয়ে। প্রণব মুখার্জি বারবার একটা কথা বলতেন, পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি দেশে কস্ট কনসেপ্টকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। কোনো জিনিসের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য পণ্যের কস্ট ম্যানেজমেন্ট জানা খুব জরুরি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটা সব জায়গায় করা হয় না। দেশের সামাজিক-আর্থিক পরিকল্পনা আর উন্নয়নের জন্য কস্ট ম্যানেজমেন্ট খুব দরকার। প্রণব মুখার্জি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন। আমার প্রণাম রইল।

অতি সাধারণ হয়েও ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

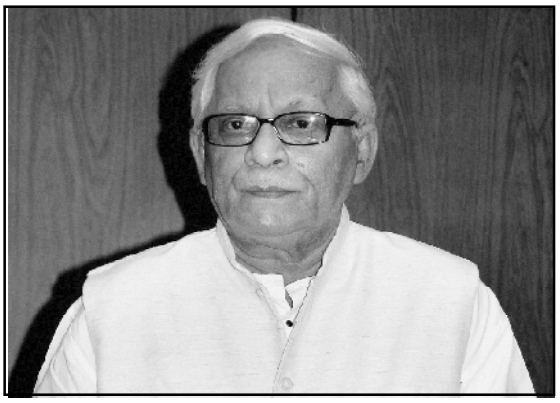

সাল ২০১২ সেপ্টেম্বর মাস, আমাদের প্রফেশনে Cost Audit নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সেন্ট্রাল গভমেন্ট থেকে একটা নোটিশ জারি করা হয় যে, Cost Audit ব্যবসার ক্ষেত্রে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই জন্য Cost Audit তুলেও দেওয়া যেতে পারে। আমি তখন 'ইনস্টিটিউট অফ কস্ট একাউন্টেন্ট অফ ইন্ডিয়া'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা চালাচ্ছিলাম বিশেষ বিশেষ লোকের সাহায্য ও পরামর্শ নেওয়ার জন্য। সেইমতো আমিও সারা ভারতে আমার পরিচিত এমপি, টপ বিজনেসম্যান, বা চিফ মিনিস্টারদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেইরকম একবার আমি দেখা করতে যাই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাথে। আমার খুব প্রিয় লোক ছিলেন তিনি। এত

অতি সাধারণ লোক যে থাকতে পারে সেটা ওনার বাড়িতে গিয়েই দেখলাম । পরনে শুধু ধুতি ও পাঞ্জাবি ধবধবে সাদা। সেদিন আমার সাথে উনি অনেক কথা বলেন এবং কিছু যোগাযোগের ভালো রাস্তা দিয়েছিলেন । তিনি বলেন,"আমাদের দেশে কিছু ভালো হওয়া খুব মুশকিল, এখানকার লোক প্রচার এবং কোট প্যান্টকে বেশি বিশ্বাস করে। আমি মনে করি Cost Management এর প্রকৃত প্রচার এবং ব্যবহার আমাদের দেশ ও পৃথিবী কেউ বুঝতে পারেনি এখনো পর্যন্ত। Young friend try and try again but it is too two tuff as it is actual fact"। আপনারা বোঝান সবাইকে এটার গুরুত্ব-"A strategic approach to maximize efficiency and value creation in business which is cost synergy" ।বাঙালির দুর্ভাগ্য আমরা আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। আপনি ভালো থাকুন, আপনাকে লাল সেলাম জানাই।

অনন্য দূরদৃষ্টির শোভন দেব

২০১৪ সাল। ওই সময় আমি দ্য ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফ ইন্ডিয়ার কাউন্সিল মেম্বার ও রিসার্চ অ্যান্ড জার্নাল কমিটি'র চেয়ারম্যান। আমাদের আঞ্চলিক কেন্দ্রের এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান উদ্বোধনে রাজ্যের একজন মন্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হল। মাত্র ২ দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক চেষ্টা করে একজনের কাছে পৌঁছলাম। তখন হাতে আর মাত্র ১ দিন সময়। অনুরোধ করার পর বিভাগীয় মন্ত্রী জানান, মিস্টার ঠাকুর, আমি আপনাদের সংস্থাকে খুব সম্মান করি, অন্যভাবে দেখি। কিন্তু আমি অসহায়। ওই সময় আমার একটা মিটিং ঠিক করা রয়েছে। পরের বার একটু আগে বলবেন, নিশ্চয় যাব।' আমি ব্যর্থ হলাম কিন্তু আশা ছাড়িনি। পরের এক অনুষ্ঠানে ওনাকে পেলাম। উনি মঞ্চে এসে যা বললেন, তাতে আমি স্তম্ভিত হলাম। উনি বললেন, ২টো প্রফেশন যে কোনও ব্যবসাকে বাঁচাতে পারে। আবার মারতে পারে। কর্মীদের ক্ষতি না করে সংস্থাকে দীর্ঘমেয়াদী করতে পারে ও মুনাফা বাড়াতে পারে। এই দুই প্রফেশন হল, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং। ওই অনুষ্ঠানে ৪০০'র বেশি লোক এসেছিলেন। তাঁরা সবাই হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান। আর ওই বক্তা ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ওই সময় তিনি ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী।এরপর আমাদের অনেক অনুষ্ঠানে উনি এসেছেন। ওনার সঙ্গে ধীরে ধীরে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়। একটা সময়ের পর সবাই বলত, আমি অনুরোধ করলেই উনি আসবেন। হয়েছেও তাই। আমার অনুরোধে ব্যস্ততার মধ্যেও উনি অনুষ্ঠানে এসেছেন, বলেছেন একটু হয়তো দেরি হবে যেতে।

আমি এমন ভদ্র ও কস্টিং সম্পর্কে জ্ঞান থাকা মন্ত্রী খুব কম দেখেছি। উনি আমার সঙ্গে অনেকবার আলোচনা করেছেন। কীভাবে খরচ কমানো যায় বা কস্ট এফিসিয়েন্সি করা যায়। ওনার কথায় বার বার উঠে এসেছে 'কস্ট ম্যানেজমেন্ট'র প্রয়োগ যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে বিদ্যুৎ পরিষেবা ও তার খরচ গ্রাহকের সাহায্য করবে। ভারতের মতো দেশে কৃষি ও ক্ষুদ্র-ছোটো-মাঝারি শিল্প মন্ত্রকেকস্ট ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগ খুব দরকার।

ওনার মতে, সরকারি দফতর বা মন্ত্রিসভার উপদেষ্টামণ্ডলীতে বা 'স্বাধীন ডিরেক্টর' হিসাবে কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট থাকলে অনেক সুবিধা হতে পারে। একবার শোভনদেব আমাকে আলোচনায় ডাকেন। বলেন, মিস্টার ঠাকুর, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ, পরিবেশন ইত্যাদি পর্যায়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ নষ্ট হয় তা কমাতে পারলে আমরা বিদ্যুতের দাম কমাতে পারি। তিনি আরও একটা প্রশ্ন তোলেন, সৌরশক্তির উৎপাদন খরচ এত বেশি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা সৌরশক্তিকে বিকল্প কীভাবে ভাবব? জবাবে বলেছিলাম, সৌর প্যানেল বোর্ড যত তৈরি হচ্ছে তার খরচ যত কমবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন তত কমবে। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তখন বলেন, এটার সামাজিক উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ না হয়। সৌর বিদ্যুৎকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এই চেতনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাকে উনি বারবার বলতেন, শিল্পের উন্নতি দরকার, পাশাপাশি দরকার কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানো ও সবার মধ্যে শিল্পোদ্যোগ ভাবনাচিন্তা আনা। উদ্যোমী মনোভাবের মাধ্যমে আমরা তরুণ প্রজন্মকে মানসিক দৃঢ়তা ফিরিয়ে দিতে পারব। এর জন্য সঠিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, যাতে তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এখন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী। আমি জানি উনি প্রত্যক্ষবা পরোক্ষভাবে কস্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবহারিক প্রযোগে আনবেন। কারণ ওনার দূরদর্শিতা অনেক বেশি। কাজের ক্ষেত্রে খুব দক্ষ। শোভনদেব স্যার একবার তার বাড়িতে বসে আলোচনা সময় আমাকে বললেন, "সৌর শক্তির ব্যবহার অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং এর জন্য সচেতনতা আনা খুব দরকার। সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে এর প্রযোজনীয়তা, আর এর খরচটাকেও এমন জায়গায় কমিয়ে আনতে হবে যাতে সাধারণ লোক সহজেই গ্রহণ করতে পারে। এই ব্যাপারে আপনাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।"

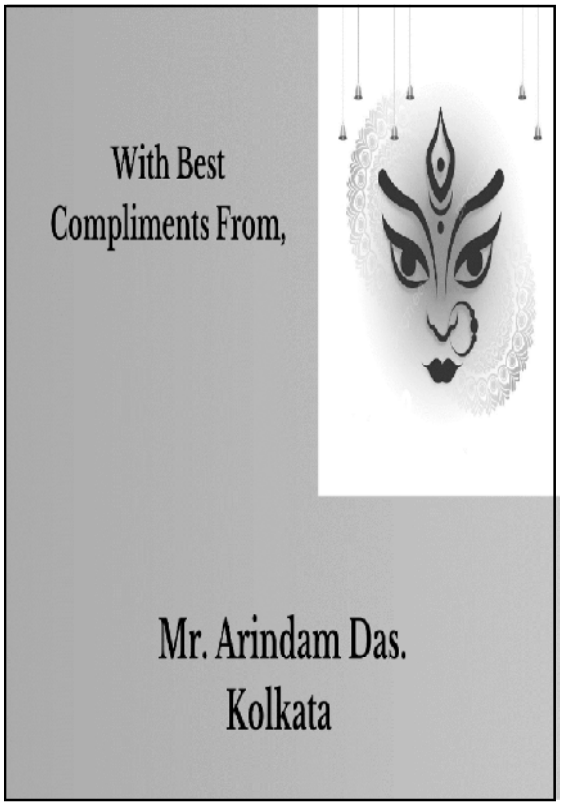

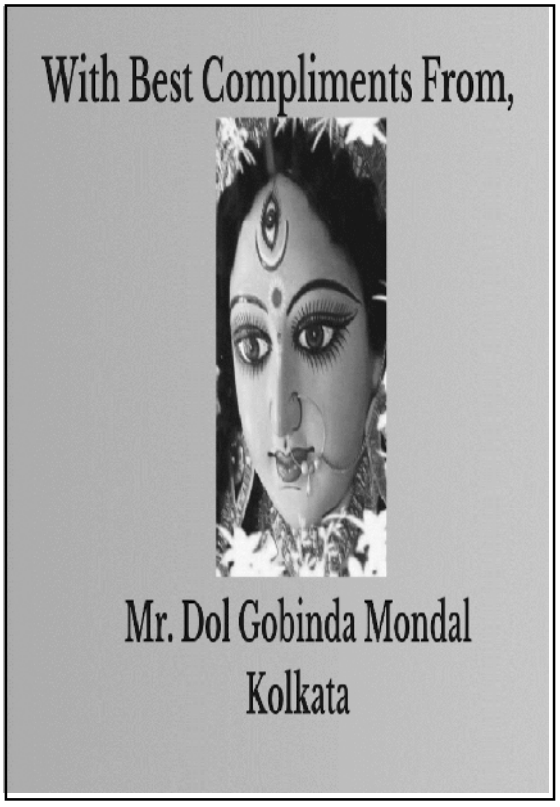

মুখোমুখি—

যতদিন বাঁচব ততদিন মনে বসন্ত থাকবে

পর্দার জনপ্রিয় শিল্পী। তাঁকে বেশি দেখা হাসির চরিত্রে। পর্দার মতো ব্যক্তিজীবনেও খুব রসিক। অভিনয়ের পাশাপাশি ছোটোগল্পও লেখেন। অভিনেত্রী তনিমা সেনের মুখোমুখি সৈকত হালদার

প্রশ্ন : সকলে বলেন তনিমা সেনের কানে হেমন্ত আর মনে বসন্ত। এটা কি ঠিক?

তনিমা সেন : একশো ভাগ ঠিক।

প্রশ্ন ঃহেমন্ত (মুখোপাধ্যায়) কেন এত প্রিয়?

তনিমা সেন : যদি বলেন কেন নয়, তা-ই ঠিক হবে। ছোটোবেলা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান তা সে রবীন্দ্রসঙ্গীত হোক বা আধুনিক কিংবা সিনেমার গান — সেসব শুনে বড়ো হয়েছি। বাড়ির সকলে তাঁর গানের ভক্ত ছিলেন। বাড়িতে একটা রেডিয়োগ্রাম ছিল, যেখানে ৬টা রেকর্ড বাজানো যেত। ছোটোবেলায় দুষ্টুমি করলে ওই যন্ত্রের সামনে আমাদের বসিয়ে দেওয়া হত। আমরা ভাবতাম ওই মেশিনের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বসে বসে গান গাইছেন।

প্রশ্ন ঃএত যাঁর ভক্ত, সেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার কোনোদিন দেখা হয়েছিল?

তনিমা সেন : হ্যাঁ, পাড়ার এক জলসায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে প্রথম দেখি। সেটা ১৯৭৩-৭৪ সাল হবে,তখন ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। ওই দিন তাঁকে আমরা রীতিমতো 'বিরক্ত' করি। ওই লম্বা মানুষটার হাত ধরে টানাটানি। সবাই মিলে একসঙ্গে হলে ঢুকে পড়ি। বড়োরা প্রতিবাদ করতে আসেন। তখন শিল্পী নিজেও বলেন আমাদের হলে ঢুকতে দিতে। বেশ মনে আছে, ওই জলসায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শুরুতে ধরেন 'এ ব্যথা কিযে ব্যথা, বোঝে কি আনজনে—'। তবে ওই সময়ের একটা কথা আজও ভুলতে পারব না। আমাদের সঙ্গে একটা ছেলে ছিল। বয়সে আমাদের চেয়ে ছোটো। তখন হয়ত ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ে। সে আচমকা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে বলে, আগের দিন ফাংশনে আপনার গান ভালো লাগেনি। বড়োরা শুনে তেড়ে আসেন। তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রাগ না করে বলেন, 'ও ঠিকই বলেছে। ওই ফাংশনে আমাকে ৫-৬ ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর ডাকা হয়। কারণ আমি গাওয়ার পর লোকে আর কারোর গান শুনবে না। ফলে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি ও ভালো গাইতে পারিনি।' ওঁর মহানুভবতা দেখে মুগ্ধ হই। আমি মনে করি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো গলা ও রোম্যান্টিক

গায়ক আর হবে না। ফলে, আমি সব সময়ের জন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের ভক্ত, কানে তাঁর গান বাজে।

প্রশ্ন ঃআর মনে বসন্ত?

তনিমা সেন : হ্যাঁ, আমি প্রেমের পূজারি। যতদিন বাঁচব ততদিন মনে বসন্ত থাকবে।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথম অভিনয় 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটকে তাই না?

তনিমা সেন : উত্তর কলকাতার গ্রে স্ট্রিটের (এখন অরবিন্দ সরণি) কাছে এক একান্নবর্তী পরিবারের মেয়ে আমি। অভিনয় জগতে আসব একথা কখনো ভাবিনি। বিয়ের পর উত্তর কলকাতার বাপের বাড়ি ছেড়ে সল্টলেকে বউমা হয়ে আসি। তো সেবার ঠিক হয় পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে 'মেঘে ঢাকা তারা' মঞ্চস্থ হবে। ঠিক হয় পাড়ার সকলে অভিনয় করবেন। নাটকের পরিচালক প্রেমাংশু সেনগুপ্ত আমাকে দেখে বলেন, মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা যদি কেউ করতে পারে তা তনিমাই পারবে। আমার অভিনয় এতই ভালো হয়েছিল যে যাঁরা প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখতে আসছিলেন তাঁরাও অভিনয় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন।

প্রশ্ন ঃ এরপর কি অফিস ক্লাবে 'রাজদর্শন' নাটকে অভিনয় করেন?

তনিমা সেন : শ্বশুরবাড়ির পাশে চ্যাটার্জিবাবু বলে একজন থাকতেন। তাঁর অফিসের নাটক হবে 'রাজদর্শন' (মনোজ মিত্রর লেখা)। সেখানে আমাকে অভিনয় করার অনুরোধ জানানো হয় ও অভিনয় করি। এই রাজদর্শন নাটক মঞ্চস্থ হয়

রঙমহল থিয়েটার হলে। সেখানে অনেককেই অভিনয়ের পর ফোন নম্বর দিই, তারপর ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়।

প্রশ্ন ঃ এরপর কি পেশাদার নাটকের জগতে আসেন?

তনিমা সেন : অফিস ক্লাবে বছর দেড়েক চুটিয়ে অভিনয় করার পর ১৯৮৫ সালে সুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে স্টার থিয়েটারে 'বালুচরী' নাটক অভিনয় করি। তখন সুপ্রিয়া দেবী একজন তারকা, আর আমি নবাগতা। তবু তাঁর কাছে যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা পেয়েছি তা ভোলার নয়। সুপ্রিয়াদি একবার বলেছিলেন, 'অভিনেতারা কেউ অভিনয় ছাড়েন না, দর্শকরা অপছন্দ করলে বা পরিচালক আর নিতে না চাইলে তখন বলি অভিনয় থেকে সরে এসেছি।' বালুচরী নাটক লিড চরিত্রে ছিলেন সুপ্রিয়াদি, আর আমি ছিলাম মেজবোনের চরিত্রে। একবার ব্যক্তিগত দরকারে সুপ্রিয়াদিকে দার্জিলিঙ যেতে হয় তখন তাঁর চরিত্রে আমাকে অভিনয় করতে বলা হয়। প্রথমে রাজি হইনি। কিন্তু, পরে পরিচালকের অনেক অনুরোধে রাজি হই। নাটকের শেষে দর্শকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করানোর

সময় বলা হয়, এই শোয়ের টিকিট রেখে দিতে ও সুপ্রিয়াদি আসার পর ওই টিকিটে নাটক দেখা যাবে। তখন এক দর্শক বলেন, আমি টিকিট ছিঁড়ে ফেললাম, আবার টিকিট কেটে নাটক দেখব। এই অভিনেত্রীর অভিনয় দেখার জন্য বারবার এই নাটক দেখতে রাজি। ওই দর্শকদের ভালোবাসায় ধন্য হই। আরো আশ্চর্য এর পরে ওই ভদ্রলোকের ভাইপোর সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁর কাকার কথা জানান। সুপ্রিয়াদি'ও আমার অভিনয়ের প্রশংসা করেন। বালুচরী স্টার থিয়েটারে ৫০০'র বেশি শো হয়।

প্রশ্ন ঃ আর কোন কোন তারকার সঙ্গে নাটক করেন?

তনিমা সেন : 'কাচের পুতুল'এ সাবিত্রী চ্যাটার্জির সঙ্গে, 'স্বীকারোক্তি' আর 'ঘরজামাই'তে চিরঞ্জিতের বিপরীতে। ঘরজামাই তো রাজ্যের নানা প্রান্তে মঞ্চস্থ হয়। আর যেখানেই হত, সেখানে যেত হত দলের সঙ্গে। এমনিতে আমি খুব একটা বাইরে বাইরে ঘুরে অভিনয় পছন্দ করি না। তবে চিরঞ্জিতদা সাফ জানিয়েছিলেন, যদি তনিমা না যায় তাহলে ঘরজামাইয়ের শো হবে না। এ ছাড়াও ওঁর 'কেঁচো খুঁড়তে কেউটে'তে অভিনয় করি,পরে তা সিনেমাও হয়।

প্রশ্ন ঃ শুনেছি আপনি নিজেও একটা নাটকের দল খোলেন?

তনিমা সেন : হ্যাঁ, ১৯৯৪ সালে 'শ্যামবাজার অপলক' নামে একটা নাটকের দল খুলি কিন্তু চালাতে পারিনি। দলের মধ্যে দলবাজি শেষ করে দেয় ওই দলকে। আমার লেখা নাটক 'স্বর্গের কাছে' রঙমহলে মঞ্চস্থও হয়। এই নাটক দেখে অভিভূত হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাঙালি অধ্যাপক। তিনি ২০ বছর পর কলকাতায় এসে এই নাটক দেখে আমাকে বলেন, '২০ বছরে কলকাতা অনেকটা বদলে গেছে। তবে এতদিন পর এখানে এসে সারা জীবনের জন্য বুকে একটা সঞ্চয় নিয়ে ফিরলাম।' তাঁর ওই কথা এখনো কানে বাজে।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে আর গ্রুপ থিয়েটারে দেখা গেল না কেন?

তনিমা সেন : গ্রুপিং করতে চাইনি বলে গ্রুপ থিয়েটারে আর আসিনি।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথম ছবি কী?

তনিমা সেন : তরুণ মজুমদারের 'পথ প্রসাদ' ছবিতে প্রথম অভিনয় করি।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে আর সেভাবে বড়োপর্দায় দেখা যায় না কেন?

তনিমা সেন : পরিচালকরা ডাকেন না তাই, আমি কাউকে অযাচিত হয়ে কাজের কথা বলি না।

প্রশ্ন ঃ কোন ছবিতে কাজ করে খুব খুশি হয়েছেন?

তনিমা সেন : অনেক ছবিতে কাজ করে আনন্দ পেয়েছি, তার মধ্যে 'বর আসবে এখুনি', 'প্রেম বাই চান্স'এ কাজ করে খুব মজা পেয়েছি।

প্রশ্ন ঃ বড়োপর্দার পাশাপাশি ছোটোপর্দায় প্রচুর কাজ করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কোনটা? আপনার বিচারে?

তনিমা সেন : বিচার দর্শকরাই করবেন। তবে এখনো লোকে 'ধ্যাৎতেরিকা' আর 'লাবণ্যের সংসার'এর কথা বলে। এই ২ সিরিয়ালই দারুণ জনপ্রিয় ছিল।

প্রশ্ন ঃ লাবণ্যের সংসারে এক শাশুড়ির চরিত্রে অভিনয় করেন, যেখানে বউমা ও শাশুড়ির মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক দেখানো হয়। আর এখন প্রায় সিরিয়ালে শাশুড়ি-বউমার ঝগড়া-কূটকাচালি দেখানো হয়। তাহলে কি দর্শকদের রুচি নেমে যাচ্ছে?

তনিমা সেন : কখনো না। কাহিনিকার-পরিচালকদের ওই সব দেখতে বাধ্য করছেন। আগে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিরিয়ালের চিত্রনাট্য লেখা হত। এখন সব কিছু বদলে গেছে। সব কিছুতে টিআরপি'র অজুহাত দেখানো হয়। আমি মনে করি ভালো কাহিনি দর্শকরা সবসময়ে পছন্দ করেন।

প্রশ্ন ঃ এখন কোন মেগায় অভিনয় করছেন?

তনিমা সেন : কালার্স বাংলায় 'রামকৃষ্ণ' সিরিয়ালে।

প্রশ্ন ঃ অভিনয়ের পাশাপাশি আপনার নতুন পরিচয় লেখক, কেমন লাগছে?

তনিমা সেন : অনেকদিন ধরে গল্প লিখছি। নানা শারদ সংখ্যায় বেরিয়েছে। নানা জায়গায় বেরোনো নানা স্বাদের ১৩টা গল্প নিয়ে এবার কলকাতা বইমেলায় ঘরে বাইরে পাবলিকেশন থেকে বেরিয়েছে আমার গল্প সংকলন 'সাঁঝের বেলায়'। পাঠকদের কাছ থেকে অভাবনীয় সাড়া পেয়েছি। শুধু চেনা লোক নয়, প্রচুর অচেনা লোক বই কিনেছেন। সকলে তাঁদের ভালো লাগার কথা জানিয়েছেন। দর্শকদের ভালোবাসায় ধন্য, এবার পাঠকের ভালো লাগায় মুগ্ধ।

প্রশ্ন ঃ পর্দায় আপনাকে দেখলে শোনা যায় তনিমা সেন এসে গেছেন। সকলের মুখে হাসি,টেনশন থেকে মুক্তি। এই ম্যাজিকের কী কারণ?

তনিমা সেন : দর্শকরাই বলবেন। বাড়ির পরিবেশ থেকে ছোটো থেকেই আমি হাসি-খুশি,সকলের সঙ্গে মজা করতে ভালোবাসি। রসিকতা আমার বোধহয় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। তাই পর্দায় যেখানেই সুযোগ পাই মজা করার চেষ্টা করি। পর্দায় হাসি হারিয়ে যাচ্ছে। দর্শকরা একটু হাসলে মন্দ কী!

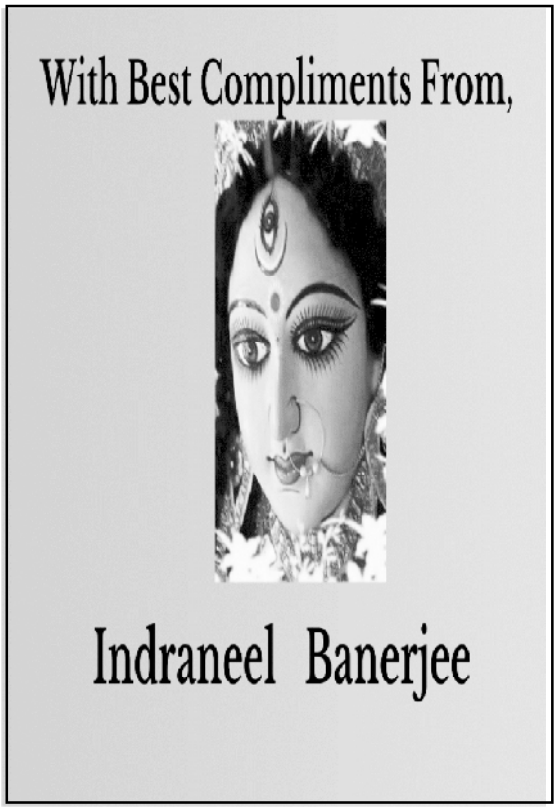

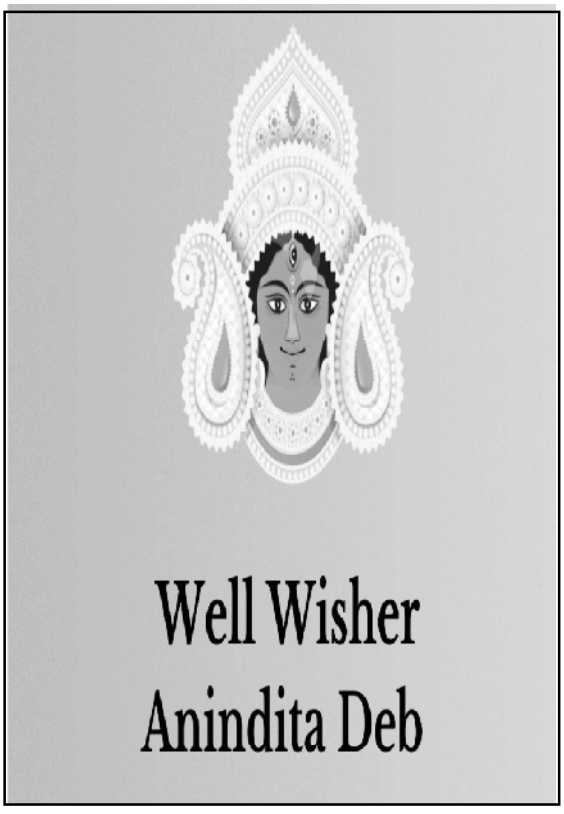

সঙ্গীত —

লোকসঙ্গীত গাইতে গেলে লোকজীবন ও খুব জরুরি

লোকসঙ্গীতের জনপ্রিয় শিল্পী স্বপন বসু। এবার তাঁর সঙ্গীত জীবনের ৩৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। নিজের ও এই সময়ের গান নিয়ে খোলামেলা সাক্ষাৎকার দিলেন সবুজ সেন

প্রশ্ন : এবার সঙ্গীত জীবনের আপনার ৩৫ বছর পূর্ণ হল। কেমন লাগছে?

● এককথায় বোঝানো যাবে না আমার আনন্দ অনুভূতি। এত বছর ধরে মানুষ আমার গান শুনছেন, ভালোবাসছেন, সুস্থ ও সমর্থ শরীরে গান করছি, আরো গভীরভাবে গানে রয়েছে। এর থেকে আর ভালো কী হতে পারে। দর্শক-শ্রোতাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

প্রশ্ন : পুরনো কথা মনে পড়ছে?

● আমি যখন আপনাদের সামনে প্রথম গাইতে এলাম, হাতে দোতারা,একতারা, ব্যাঞ্জো আর পরনে শহরের পোশাক। এই শহরেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা কিন্তু আমার ছেলেবেলা থেকেই মন পড়ে থাকত গ্রামবাংলার গানে উৎসবে। উত্তর পূর্বাঞ্চল আর পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান জোগাড় করতে করতে উপলব্ধি করেছি, গ্রামবাংলার এই হাজার হাজার অজানা লোকগান, যা ভাবের, রসের, কর্মের আর প্রতিবাদের — সেই গান কখনো এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, তার ব্যাপ্তি বৃহত্তর জায়গায়। এ গান শুধু কণ্ঠের নয়, এ গান বোধের চেতনার আর ভাবনার, তাই আজও পদে পদে পলে পলে আহরণ করে চলেছি। আপনারা এতকাল আমায় ভালোবেসেছেন, তাই বেঁচে বর্তে আছি, তাই এবার আমার কাজ এই বাঁচাটুকু নতুন করে ফিরিয়ে দেওয়া আর এবার আমার সঙ্গে কণ্ঠ মেলাবে আমার মেয়ে শিমলী। এই ৩৫ বছরটাকেই স্মরণ করার জন্য আমি ফিরে এসেছি আবার।

প্রশ্ন: একটু পুরনো কথা জানতে চাই। আপনার গান শেখার প্রেরণা কে?

● আমার মা সুধারানী বসু। মা প্রয়াত। আমার ইচ্ছে যদি কোনো গানের প্রতিষ্ঠান করি তা মায়ের নামে করব।

প্রশ্ন ঃ কার কার কাছে গানের তালিম নেন?

● প্রথাগতভাবে গানের তালিম নয়, যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছি তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রণেন রায়চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস,

কালীদাস গুপ্ত, নীহার বড়ুয়া ও দিনেন্দ্র চৌধুরী। অবশ্যই প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতজ্ঞ সলিল চৌধুরী।

প্রশ্ন ঃ সলিল চৌধুরীর কথা একটু বলুন?

● সলিলদার কথা বলে শেষ করা যাবে না। সলিল চৌধুরীর সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তখন আমি ২৭-২৮ বছরের। তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হই। তিনি আমাকে বলেন, তোমার বয়সি ছেলেরা যেখানে রকে বসে আড্ডা দিয়ে কাটায় সেখানে তুমি জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকগান জোগাড় করে গান করছ, এটা আমাকে বিস্মিত করেছে। সলিলদার সান্নিধ্যে আমার জীবনধারা বদলে যায়। তাঁর সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরেছি। সলিলদার সঙ্গে প্রথম অনুষ্ঠান করি হলদিয়ায়। সে এক ঘটনা। অচেনা আমার গান কেউ শুনতে চাইছেন না, সবাই চাইছেন সুবীর সেন আর অন্তরার গান শুনতে। সলিলদা শ্রোতাদের অনুরোধ করেন, আমার গলায় অন্তত একটা গান শোনার। তখন প্রচলিত একটা লোকগান করি আর দর্শকরা বাহবা দেন। আমার মতো এক অনামি শিল্পীকে সলিলদা গান গাওয়ার সুযোগ করে দেন। তাতে বোঝা যায় তাঁর মহানুভবতার কথা। এসব ঘটনা কি ভোলা যায়!

প্রশ্ন : এ পর্যন্ত কত গান গেয়েছেন?

● হিসাব করে দেখিনি, তবে ৩০০'র বেশি গান রেকর্ড। আমার সংগ্রহে রয়েছে কয়েক হাজার গান।

প্রশ্ন : এর মধ্যে কি সবচেয়ে হিট গান 'থাকিলে ডোবাখানা'?

● এ ছাড়াও আরো অনেক গান শ্রোতাদের খুব পছন্দের। তার মধ্যে রাখতে পারি, ছাতা ধরো হে দেওরা, মাথায় হাত দিয়া সই বল গো, তিন যুগ চলিয়া গেল, আমার কালো পাখি গেল উড়ে, নন্দলাল ও দেবদুলাল, আগে কী সুন্দর দিন, মোর মতন আর দেশপ্রেমিক নাই প্রভৃতি।

প্রশ্ন ঃ কিছুদিন আগে 'থাকিলে ডোবাখানা, স্বভাব তো কক্ষণো যাবে না', গানের সিকুয়েল মুক্তি পেয়েছে ইউটিউবে। নতুন ভাবনায়, নতুন কথায়, নতুন সুরে। এ নিয়ে কিছু বলুন।

● পুরনো সেই গানের সুর থেকে সরে গিয়ে নতুন একটা সিক্যুয়েল, বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, আশু চক্রবর্তীর সুরে এই নতুন গান হয়।

প্রশ্ন ঃআপনার গানে অনেক বাজনা দেখা যায়। ছোটো থেকেই কি আপনার বাজনার প্রতি আগ্রহ?

● ছোটো থেকেই অনেক বাজনার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। এখনো আছে। তার মধ্যে রয়েছে ব্যাঞ্জো, একতারা, দোতারা, গিটার ও আনন্দ লহরী। ফলে গানের সুরে বৈচিত্র্য আনতে এইসব যন্ত্র আমাকে বন্ধুর মতো সাহায্য করে। আমার গান মানুষের ভালোলাগার এটাও অন্য কারণ।

প্রশ্ন ঃএখন নতুন ছেলেমেয়েরা লোকসঙ্গীত গাইছেন। তাঁদের গানের শুদ্ধতা নিয়ে অনেক সিনিয়রদের অভিযোগ। আপনার কী মত?

● আমি সব কিছুর মধ্যে পজিটিভ দিক দেখতে চাই। ভালো-মন্দ বিচার করার আমি কে? শ্রোতারা বিচার করবেন। ওরা চেষ্টা করছে, এই চেষ্টাই আসল কথা।

প্রশ্ন ঃলোকগান গাইতে গেলে কি বিশেষ পোশাক পরতে হয় বা লোকযাপন করতে হয়?

● আমি স্টেজে কখনো নির্দিষ্ট পোশাক ব্যবহার করি না। এখানে শিল্পীর পরিচয় আসল। গেরুয়া পরলেইবাউল হওয়া যায় না। তবে লোকসঙ্গীত গাইতে গেলে লোকজীবন যাপন খুব জরুরি। আমি নিজে গান জোগাড়ের জন্য অনেক দিন দেশের প্রত্যন্তগ্রামে ঘুরেছি। নানা সম্প্রদায় আর আদিবাসীদের সঙ্গে মিশেছি। তাঁদের ভাষা ও আচরণের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়েছি।

প্রশ্ন ঃলোকগান নিয়ে কাজ করার জন্য আপনি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, তাই না?

● হ্যাঁ, ১৯৮১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে লোকসঙ্গীতের জন্য ন্যাশনাল স্কলারশিপ পাই। ১৯৮৪ সালে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া থেকে রিসার্চ ফেলোশিপ পাই। গবেষণার বিষয় ছিল এথনোমিউজিওলজি। এরপর ১৯৮৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ থেকে ন্যাশনাল ফেলোশিপ পাই পারফরমিং আর্টসে অসাধারণ দক্ষতার জন্য।

প্রশ্ন ঃ ৩৫ বছরের সঙ্গীত জীবন নিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের কী বলতে চান?

● আপনাদের ভালোবাসায় আমি কৃতার্থ। এভাবে আমার গান আর লোকগান ভালোবেসে যান।

রিয়েলিটি শোয়ে সুযোগ পাওয়ার জন্য ১ পয়সাও লাগে না

এই মুহূর্তে রিয়েলিটি শোয়ের জনপ্রিয় কোরিওগ্রাফার ও মেন্টর অ্যালেন প্যারিস। সবার কাছে অ্যালেন স্যার নামে পরিচিত। অন্তরঙ্গ আলাপনে— **সৈকত হালদার**

প্রশ্ন : কোনোদিন ভেবেছিলেন এত জনপ্রিয় কোরিওগ্রাফার হবেন?

অ্যালেন : জনপ্রিয় কিনা দর্শকরাই বলতে পারবেন। সকলের ভালোবাসা পেয়ে ধন্য। ছোটো থেকে ছবি আঁকতাম। নাচ শিখেছি তনুশ্রীশঙ্করের কাছে। উদয়শঙ্কর পুরস্কার পেয়েছি। ২০০২ সালে নাচের জন্য স্কলারশিপ পাই। ২০০৫ আর ২০০৭ সাল —এই ২ বছর দেশের প্রতিনিধি হয়ে ওয়ার্ল্ড ট্যুরে ইউরোপের নানা দেশে যাই।

প্রশ্ন ঃ কবে রিয়েলিটি শোয়ে এলেন?

উত্তরঃ ই টিভিতে প্রথম নাচের রিয়েলিটি শো হয়, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় 'ঋতুর মেলা ঝুম তারারারা'। ২০০৭ সালের এই অনুষ্ঠানে টলিউডের একগুচ্ছ তারকা অংশ নেন। আমি রিমঝিম মিত্রের গ্রুমার ছিলাম। তারপর জি বাংলায় ড্যান্স বাংলা ড্যান্স শুরু হয়। ২০০৭ সাল থেকে রিয়েলিটি শোয়ে মেন্টর ও কোরিওগ্রাফার হিসাবে কাজ করে চলেছি। নাচের জগতে আমার ২ দশক হয়ে গেল।

প্রশ্ন ঃ রিয়েলিটি শো নিয়ে এত ক্রেজ কেন?

উত্তরঃ এই মুহূর্তে নতুনদের প্রতিভা বিকাশের সবচেয়ে বড়ো প্ল্যাটফর্ম টিভির রিয়েলিটি শো। একবার মুখ দেখালে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া যায়। আরেকটা কথা, অনেকে জানেন না বাংলার রিয়েলিটি শোয়ের পথ ধরে হিন্দিতে রিয়েলিটি শো শুরু হয়।

প্রশ্ন ঃ রিয়েলিটি শোয়ে সুযোগ পেতে কি টাকা লাগে?

উত্তরঃ এক শ্রেণির অসাধু লোকের রটনায় এটা শোনা যায়। তাঁদের সঙ্গে চ্যানেল বা রিয়েলিটি শোয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রতিভার ভিত্তিতে সুযোগ পাওয়া যায়, তার জন্য চ্যানেল কারোর কাছ থেকে পাঁচ পয়সাও নেয় না। যাঁরা সুযোগ পান না তাঁরাই এসব গুজব ছড়ায়।

প্রশ্ন: অডিশন কীভাবে নেওয়া হয়?

উত্তরঃ অডিশন নেওয়ার সময় চ্যানেলে ঘোষণা করা হয়। তারপর নির্দিষ্ট দিনে অডিশনে ডাকা হয়। ৩টে পর্যায়ে অডিশন হয়। প্রথম পর্যায়ের অডিশনে দেখা হয় এই ৩ ধরনের নাচ — বলিউড নাচ, কনটেমপোরারি নাচ (যেখানে থাকতে হয় নতুন চমক) ও ক্ল্যাসিক্যাল নাচ। বাইরে থেকে বিচারক আসেন। এর ভিত্তিতেই প্রাথমিক স্ক্রিনিং হয়। এরপর থাকে সেকেন্ড রাউন্ড, যেখানে ওই ধরনের নাচের পাশাপাশি থাকে পছন্দের নাচ। চূড়ান্ত অডিশন হয় স্টুডিওতে।

প্রশ্নঃ কতদিনের গ্রুমিং হয়?

উত্তরঃ যতদিন শো চলে ততদিন গ্রুমিং চলে। সেখানে নাচের এ-টু- জেড শেখানো হয়। যাঁরা অংশ নেন তাঁদের ট্রেনিং, থাকা, খাওয়ায় যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয় চ্যানেল থেকে। এমনকী নাচের জন্য পোশাকও দেওয়া হয়।

প্রশ্নঃ কতক্ষন ধরে ট্রেনিং চলে?

উত্তরঃ গড়ে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ট্রেনিং হয়। আমি সকাল থেকে ট্রেনিং শুরু করি। রিয়েলিটি শো শুরু হওয়ার পর অনুষ্ঠানের জন্য মহড়া হয়। পুরো বিষয়টা খুব পরিশ্রমের ও ধৈর্য্যের।

প্রশ্নঃ আপনার হাত ধরে অনেক ছেলেমেয়ে উঠে এসেছেন। কাদের নাম করবেন?

উত্তরঃ অনেকে উঠে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছে দীপান্বিতা কুণ্ডু, সুদীপ্তা, শ্রীতমা, জিৎ, সৈকত ও আরো অনেকে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোরিওগ্রাফিতে সব সময় নতুন ভাবনা আনেন। আপনার পছন্দের ভাবনা কোনটা?

উত্তরঃ সব সময়ে নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি। দর্শকদের বিনোদনের মাধ্যমে সোশাল মেসেজ দিতে চাই। এমন ধরনের ভাবনা ভাবি যেখান থেকে কিছু শেখা যায়। গত ১৫ - ১৬ বছরে অনেক নতুন কনসেপ্ট এনেছি। দেখা হলে লোকে এখনও আমায় বলেন, কুমোরপাড়ার গোরুর গাড়ি, নকশী কাঁথা, সিন্ডেরেলার কথা বা বন্দে মাতরম এর ভাবনার কথা। অনেকে হয়ত গানের কথা ভুলে গেছেন কিন্তু কনসেপ্ট মনে রেখেছেন।

প্রশ্নঃ অনেকের অভিযোগ বাচ্চাদের নাচের ক্ষেত্রে ডিগবাজি বা জিমন্যাস্টিক নিয়ে। এর সঙ্গে নাচের কী সম্পর্ক?

উত্তরঃ এটার ভালো আর খারাপ ২টি দিক রয়েছে। দেড় থেকে ২ মিনিটের নাচের অনুষ্ঠানে দর্শকদের আটকে রাখার জন্য নতুন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যাকে বলে বাহহ ফ্যাক্টর। সেজন্য এইসব স্টান্ট বা চমক আনা হয়। তবে এক্ষেত্রে গ্রুমারের পরিমিতি বোধ থাকা দরকার। জানতে হবে কোন নাচে কতটা চমক দেখাব, মাত্রা বেশি হলে দৃষ্টিনন্দন হয় না।

প্রশ্নঃ ড্যান্স বাংলা ড্যান্সে বাচ্চাদের পোশাক নিয়ে অনেকের অভিযোগ শোনা যায়। আপনার কী মত?

উত্তরঃ মাচার অনুষ্ঠানেও বলিউডের গানের সঙ্গে বাচ্চাদের নানা ধরনের কম পোশাকে দেখা যায়। বাবা-মাও আপত্তি করেন না। যত আপত্তি রিয়েলিটি শোয়ের ক্ষেত্রে। এটা এক ধরনের ধ্যাস্টামি।

প্রশ্নঃ নাচের রিয়েলিটি শোয়ের বিচারক হিসাবে সিনেমার তারকারা থাকেন। কেন নাচের শিল্পীদের দেখা যায় না?

উত্তর ঃহিন্দিতে বিচারক হিসাবে বিশিষ্ট নাচের শিল্পীদের দেখা যায়। এখানে চ্যানেল কর্তাদের বক্তব্য, রিয়েলিটি শোয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক জেলার লোকজন। তাঁরা চান

পরিচিত মুখ।
যাঁদের পর্দায় দেখা যায়। । আর টিআরপি পড়ে গেলে শো বন্ধ হয়ে যায়। যা এখন সিরিয়ালের ক্ষেত্রে হচ্ছে। বাণিজ্যিক কারণে সিনেমার গ্ল্যামারাস মুখ রাখা হয়। তাছাড়া যাঁরা বিচারকের আসনে থাকেন তাঁদেরও নাচের দক্ষতা থাকে। আমরা মেন্টররা চাই বিচারকের আসনে তারকাদের পাশাপাশি নাচের লোকেরা থাক। সিনেমার তারকারা গানের সঙ্গে নাচের দৃশ্যায়নের কথা বলবেন আর নাচের শিক্ষকরা জানাবেন নাচের টেকনিক্যাল দিক।
প্রশ্নঃ নাচের রিয়েলিটি শো নিয়ে অনেক বিশিষ্ট শিল্পী ভালো ধারণা পোষণ করেন না। তা নিয়ে আপনার মত কী?
উত্তরঃ তা তাঁদের ব্যাপার। আবার রিয়েলিটি শোয়ে ডাক পেলে তাঁরাই চলে আসেন।
প্রশ্নঃএখন রিয়েলিটি শোয়ের ভাবনা কি বদলে যাচ্ছে?
উত্তরঃ হ্যাঁ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রিয়েলিটি শোয়ের কনসেপ্ট বদলে যাচ্ছে। আগে সিরিয়াস বা গুরুগম্ভীর ভাবনার নাচ হত। এখন চ্যানেলের বক্তব্য, সারা দিনের ক্লান্তির শেষে মানুষ আর সিরিয়াস বিষয় বা সমস্যা নিয়ে ভাবতে চান না। তাঁরা চান চটজলদি আনন্দ। তাই এখন মজার মোড়কে কনসেপ্ট তৈরি করা হয়। এখন ফোকফিউশনের খুব চাহিদা। নানা ধরনের লোক নাচের মিশ্রণে নতুন ধরনের নাচ। তবে মিশ্রণের ক্ষেত্রে জানতে হয় নানান লোকনাচের নানান আঙ্গিক বিষয়ে। না হলে হিতে বিপরীত হবে। বাংলায় ফোক ড্যান্সের চাহিদা সব সময়ের। এখন পুরনো জিনিস নতুন মোড়কে ফিরে আসছে। যে যত সুন্দর প্যাকেজিং করতে পারে তার কদর তত বেশি।
প্রশ্নঃ নাচের রিয়েলিটি শোয়ে অনেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েও পরে হারিয়ে যান কেন? অথচ গানের রিয়েলিটি শোয়ের বিজয়ীরা অনেকে থেকে যান।
উত্তর ঃ এর পেছনে প্রতিযোগীদের পাশাপাশি দায় রয়েছে অভিভাবকদের। একবার নাম করলে অনেকের মাথা ঘুরে যায়। মাচার শো থেকে ফিতে কাটায় মগ্ন থাকে। নাচের অনুশীলন থেকে দূরে সরে যায়, এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে। আর যাঁরা নাচ ধরে রাখেন তাঁরা উন্নতি করেন। নাচের রিয়েলিটি শো থেকে অনেক ছেলেমেয়ে বাংলা সিরিয়ালে কাজ করছেন, আবার অনেকে কোরিওগ্রাফার হিসাবে কাজ করছেন। সাফল্য পাওয়ার চেয়ে বেশি কঠিন কাজ তা ধরে রাখা।
প্রশ্নঃ রিয়েলিটি শোয়ে মেন্টর হিসাবে কাজের সূত্রে তারকাদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?
উত্তরঃ সব আগে বলি পরিচালক অভিজিৎ সেনের কথা। অভিজিৎদা কাজের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। কখনো নাক গলান না। নতুন নতুন কনসেপ্টকে স্বাগত জানান। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব কেয়ারিং। বাচ্চাদের সেফটি ও সিকিউরিটিতে নজর দেন। আমাদের সবসময়ে বলেন, বাচ্চাদের নাচের ক্ষেত্রে এমন কোনো ঝুঁকি নিও না যাতে তাদের ক্ষতি হয়। আর তারকাদের বিষয়ে কাকে ছেড়ে কার কথা বলব? মিঠুন চক্রবর্তী, গোবিন্দা, পদ্মিনী কোলাপুরী, উর্মিলা মাতণ্ডকর, জিৎ সকলেই আমার কোরিওগ্রাফির প্রশংসা করেছেন। মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর প্রশংসায় দারুণ অনুপ্রাণিত হয়েছি। শ্রাবন্তী ম্যাম (শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়) খুব মিষ্টি বিচারক, শুভশ্রী ম্যাম (শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়) বলেন, 'অ্যালেন স্যারের কাজে ম্যাজিক রয়েছে, সব সময়ে নতুন কিছু পাওয়া যায়।' যা আমার কাছে দারুণ কমপ্লিমেন্ট!
প্রশ্নঃ বিচারক থেকে প্রতিযোগী সকলের কাছে আপনি অ্যালেন স্যার। কথা শুনতে কেমন লাগে?
উত্তরঃ সেই ২০০৭ সাল থেকে নাচের রিয়েলিটি শোয়ে মেন্টর হিসাবে কাজ করে চলেছি। আমার হাত দিয়ে অনেকে তৈরি হয়েছে। সকলকে শেখাতে শেখাতে কখন যে অ্যালেন স্যার হয়ে উঠলাম কে জানে! এখন লোকে এই নামেই আমাকে বেশি চেনে।
প্রশ্নঃ আপনার নিজের তো নাচ শেখানোর প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কত বছর বয়স থেকে নাচ শেখান?
উত্তরঃ হ্যাঁ, টালিগঞ্জে আমার নাচের স্কুল রয়েছে। ৩ প্লাস বছর বয়স থেকে নাচ শেখাই।
প্রশ্নঃ নতুনদের কী পরামর্শ দেবেন?
উত্তরঃ ধ্যান দিয়ে নাচ শিখে অডিশনে অংশ নিতে হবে। পরিশ্রম ও নিষ্ঠা থাকলে সাফল্য আসবে। শুধু নামের কথা ভেবে আসলে হবে না, মন দিয়ে নাচের অনুশীলন করতে হবে। পারফর্ম করার পাশাপাশি নাচ নিয়ে লেখাপড়াও জরুরি।

সিনেমা—

মহানায়কের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে তাঁর ছবি সংরক্ষণ জরুরি

স্মৃতিচারণে তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য মহুয়া চট্টোপাধ্যায়

আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে উত্তমকাকুকে (উত্তমকুমার) দেখেছি। তিনি ছিলেন আমার বাবা ডাঃ লালমোহন মুখার্জির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সূত্রে উত্তমকুমার আর তরুণকুমারের আমাদের বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ছিল। আমাদের বাড়ি থেকে ওঁদের বাড়ি ছিল ঢিল ছোড়া দূরে। আমার বাবা শুধু উত্তমকুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাই নয়, তাঁর পারিবারিক ডাক্তারও ছিলেন। ওঁর জীবনের শেষদিনও বেলভিউ নার্সিং হোমের আইসিসিইউ'তে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মহানায়ক বাবাকে তাঁর হাতের পোখরাজ(আংটি) খুলে বাবার হাতে দিয়ে বলেন, গৌরীদেবী আর গৌতমকে দিতে আর তাঁদের দেখতে। বাবা ১৩ দিন ওই পোখরাজ গলার পৈতের সঙ্গে জড়িয়ে রাখেন আর মহানায়কের পারলৌকিক কাজ মেটার পর তাঁর ছেলে গৌতমকে দেন।

উত্তমকুমারের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য হওয়ার পর তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ হয়। পরিবারের খুব কাছের মানুষ হওয়ার পর উত্তমকুমারকে আমি বাবি বলে ডাকতাম। তরুণকুমারকে 'বু কাকু' আর গৌরীদেবীকে মাম্মি বলে ডাকতাম। বাবির জীবনের মূল মন্ত্র ছিল ৩ ডি — ডিসিপ্লিন, ডিভোশন ও ডেডিকেশন। অসম্ভব ডিসিপ্লিনড মানুষ ছিলেন। রুটিনমাফিক চলতেন। রোজ ভোর ৪টে'তে উঠে মর্নিং ওয়ার্কে যেতেন। ফিরে এসে ঠাকুরঘরে পুজোয় বসতেন, নিজে খুব ভালো চণ্ডীপাঠ করতে পারতেন। এরপর সামান্য কিছু খেয়ে রোজকার শিডিউল মেনে শুটিংয়ে যেতেন। সন্ধে ৬ থেকে ৭টার মধ্যে ফিরে সাউথ ক্যালকাটা ক্লাবে রোজ লন টেনিস খেলতে যেতেন। ১

ঘণ্টা খেলে বাড়ি ফিরে রাত সাড়ে ৯টায় মধ্যে শুয়ে পড়তেন। কোনোদিন এই রুটিনের নড়চড় হতে দেননি। বাড়ির কারোর ওপর রাগারাগী করতেন না। বরং কার কী ভুল হচ্ছে বুঝিয়ে দিতেন। বাড়িতে ইলেকট্রিকের সুইচ খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে, তা দেখে বলেন, সারাদিন বাড়ি থাকি না, এসবা একটু দেখতে পার না। বাড়ির ছোটোখাটো বিষয়ও তাঁর নজর এড়াত না।

বাবি নিজের কাজের ক্ষেত্রে ছিলেন খুব সিরিয়াস। যেকোনো চরিত্রে অভিনয় করার ক্ষেত্রে তার গভীরে ঢুকে যেতেন। চরিত্রের মেকআপ করার পর পরিচালক বা সহ পরিচালক ছাড়া কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। আগে থেকে চিত্রনাট্য পড়ে মুখস্ত করতেন না। মেকআপের সময় বা চূড়ান্ত পর্যায়ে চিত্রনাট্য শুনে নিতেন। তাঁর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। পরিচালকের নির্দেশমতো কাজ করলেও যেকোনো চরিত্রে নিজের মতো করে ইম্প্রোভাইজ করে অন্য রূপ দিতেন। তাঁর চরিত্রে মিশে যাওয়ার ছোট্ট একটা ঘটনা বলছি। সন্ন্যাসী রাজা ছবির শেষ দৃশ্য। যখন ইন্দুর মৃত্যু হয়েছে। সন্ন্যাসী মাথা নীচু করে চেয়ারে বসে রয়েছেন। পরনে ওই পোশাক, বড়ো চুল। এন টি ওয়ানে শুটিং হচ্ছিল। ওই সময় ভি বালসারা তাঁকে দেখে, ক্রস হাতে নিয়ে 'ও জেসাস' বলে ওঠেন। তখন গুড ফ্রাইডে চলছিল। এই ঘটনা পরে ভি বালসারা বাবি'কে বলায় তিনি সরি বলে বলেন, সেকি কখন এসেছিলেন আমি তো জানতে পারিনি। আসলে বাবি তখন ওই সন্ন্যাসী চরিত্রের মধ্যে ঢুকে যান গভীরভাবে। কোনোদিকে খেয়াল ছিল না। অভিনেতা হিসাবে সফল হওয়ার জন্য উত্তমকুমার নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন। মুখের জড়তা কাটানোর জন্য মুখে সুপুরি পুরে দিয়ে কথা বলার অভ্যাস করতেন। জোরে জোরে চণ্ডীপাঠ করতেন। শারীরিক ফিটনেস বজার রাখার জন্য যেমন নিয়মিত মর্নিং ওয়ার্ক করতেন। তেমনি ব্যায়াম করতেন। তার জন্য আজকের মতো জিমে যেতেন না। ব্যায়ামবীর মনোতোষ রায়ের কাছে শরীরচর্চা করতেন। কুস্তি লড়তেন।

না, পরিবারের সদস্যরা কোনোদিন ওর শুটিং দেখতে যাননি। অনুরোধ করার সাহসও হয়নি। তপন সিনহার ঝিন্দের বন্দির টানা ২৭ দিন শুটিং হয় উদয়পুরে। ওই শুটিংয়ে বাবির অনুরোধে আমার বাবা ও মা তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সে এক কাণ্ড!

বাবির অভিনীত কোন ছবির কথা ছেড়ে কোন ছবির কথা বলব? আজও আমার মনে দাগ কেটে রয়েছে — অগ্নীশ্বর, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, নায়ক, অপরিচিত, সন্ন্যাসী রাজা, জীবনমৃত্যু, যদুবংশ ও কাল তুমি আলেয়া। কাল তুমি আলেয়া ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন উত্তমকুমার। তাঁর সুরে গান করেন আশা ভোঁসলে। তাঁর গান গাওয়ার ইতিহাস সকলের কম বেশি জানা। উত্তমকুমারকে কেউ কেউ রোমান্টিক হিরো হিসাবে চিহ্নিত করতেন। কিন্তু ওই সব ছবি দেখলে বোঝা যায় তিনি কত বড়ো মাপের অভিনেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন ভার্সেটাইল অভিনেতা।

বাবির কাছে অভিনয় শুধুমাত্র পেশা ছিল না, ছিল প্যাশন। বেঁচে থাকার সময়, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি'কে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কলাকুশলীদের সুখ-দুখে পাশে থাকতেন। কত কলাকুশলীর যে উপকার করেছেন তার হিসাব নেই। একবার এক লাইটম্যানের সমস্যার কথা শুনে তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁকে শর্ত দেন, ডান হাত যেন বাঁ হাতের কথা জানতে না পারে। দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য জোকায় জমি কেনার কথা ভাবেন। তাঁদের জন্য তৈরি করেন শিল্পী সংসদ।

১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই উত্তমকুমারের মৃত্যু হয় মাত্র ৫৪ বছর বয়সে। একজন শিল্পীর জীবনে এটা কোনো বয়স নয়। যখন তিনি নিজেকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে নতুনভাবে তৈরি করেন, তখন আমরা তাঁকে হারাই। এই অকালে ও অসময়ে চলে যাওয়া কেউ মেনে নিতে পারেননি। সেই বেদনা আজও আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি। ২৪ জুলাই প্রতি বছর দূরদূরান্ত থেকে লোক আসেন আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে। গান গেয়ে ছবি এঁকে চোখের জলে সবাই প্রিয় মহানায়ককে শ্রদ্ধা জানান। কিন্তু ৩ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিনে সেই উন্মাদনা চোখে

পড়ে না। তার একটাই কারণ, মৃত্যু চির বেদনার। তার ওপর তিনি অকালে চলে যান।

১৯৮০ সালের ২৪ জুলাইয়ের স্মৃতি আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। তাঁর মরদেহ ঘিরে হাজার হাজার মানুষের আর্তনাদ। বুক ভাঙা কান্না। অল্প বয়সি ছেলেরা নিজেদের জামা-গেঞ্জি ছিঁড়ে চিৎকার করছে, গুরু ফিরে এস, গুরু ফিরে এস। বাড়িতে ভিড় সামলাতে না পেরে আমরা ওই সময়ের রাজ্য সরকারকে বাবির মরদেহ রবীন্দ্রসদনে রাখার অনুরোধ জানাই। ওই সময় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বাইরে ছিলেন। দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি আমাদের কথায় কান দেননি। বড়ো মাপের কোনো মন্ত্রী আসার সৌজন্য দেখাননি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেউ একজন এসে ফুল দিয়ে যান। অথচ ওই সরকারের জন্য অসুস্থ শরীরে উত্তমকুমার ক্রিকেট খেলে টাকা জোগাড় করে দেন, বন্যার ত্রাণ তোলেন। সেদিক থেকে আজকের রাজ্য সরকার উত্তমকুমারকে প্রাপ্য সম্মান দিয়েছেন। টলিউডের যে দুঃস্থ শিল্পী -কলাকুশলীদের জন্য বাবি কিছু করার কথা ভাবতেন, সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন মমতাদি। শিল্পী-কলাকুশলীদের জন্য চালু করেছেন হেলথ বিমা, চালু হয়েছে অবসরকালীন ভাতা। প্রতি বছর সরকারি উদ্যোগে পালন করা হয় উত্তমকুমারের মৃত্যু বার্ষিকী। এবার অনু'ান হচ্ছে ধনধান্যে। পরিবারের সদস্যদের সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

শিল্পীদের দেওয়া হয় উত্তমকুমার পুরস্কার। টালিগঞ্জে মহানায়কের মূর্তিতে সরকারি উদ্যোগে মালা দিয়ে মন্ত্রী শ্রদ্ধা জানান। এই সরকারের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

মহানায়কের অগণিত ভক্তের মতো আমরাও চাই নতুন প্রজন্মের কাছে মহানায়কের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে তাঁর সিনেমা সংরক্ষণ করা হোক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ৫০টা সিনেমা রেস্টোর করা হয়েছে। অন্য সব ছবির কথা ভাবতে হবে। অনেক সিনেমার প্রিন্ট পাওয়া যায় না।

অনেকে জানেন না উত্তমকুমারের 'চন্দ্রনাথ' ছবি মুক্তি পাওয়ার সময় মেট্রো সিনেমায় ওই ছবি দেখানো হয়। সেই প্রথম কোনো বাংলা ছবি মেট্রো সিনেমায় দেখানো হয়। শুধু তাই নয়, এই ছবির টিকিটও ব্ল্যাক হয়।

মৃত্যুর ৪৪ বছর পরও মহানায়ককে ঘিরে সাধারণলোকের উৎসাহ, উন্মাদনা আর সরকারি উদ্যোগে সাড়ম্বরে জন্মদিন ও মৃত্যুদিন পালন সারা বিশ্বে দেখা যায় না।

অনুলিখন : সৈকত হালদার

অঞ্জনদা দর্শকদের পালস খুব ভালো বুঝতেন

উত্তমকুমার চলে যাওয়ার পর বাংলা সিনেমার সুদিন ফিরে হাতে পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর হাত ধরে। ৩ দশকের বেশি সময় ধরে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী দিগ্বিজয় চৌধুরী নানান অভিজ্ঞতা শোনালেন।

১৯৭০ সালে 'চিকিৎসা সমাজ' নামে এক পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সাহিত্য সংবাদের পত্রিকা। সব ধরনের চিকিৎসার খবর বেরোতো। পত্রিকা বের করতেন এক বিশিষ্ট চিকিৎসক। আমার কাজ ছিল লেখা জোগাড় করা, সম্পাদনা ও ছাপার ব্যবস্থা করা। ছাপা হত স্কটিশচার্চ কলেজের পাশে ঈশ্বর মিশন বাইলেনে। ফেরার সময় ওয়েলিংটন এসে একটা চিপসের দোকান থেকে চিপস কিনে খেতে খেতে কার্জন পার্কে যেতাম, তারপর ধর্মতলা থেকে বাসে উঠতাম। এটাই ছিল আমার রোজকারের রুটিন। এভাবে একদিন ওয়েলিংটন মোড়ের চিপসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আচমকা এক স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা! সে আমাকে রীতিমতো পুলিশি জেরা করতে শুরু করে। আমি কী করি, কোথায় যাই এসব নিয়ে। প্রেসের কথা জানাতে ওই স্কুল বন্ধু তাঁর প্রেস থেকে ছাপানোর কথা বলে। এরপর ওর সঙ্গে যাই ৬০ নং লেলিন সরণীর ছাপাখানায়। সেই প্রথম একজন প্রেসের মালিককে দেখি শুট-প্যান্ট পরা। প্রথম আলাপে ওই মালিক আমাকে 'তুই' বলে ডাকায় একটু অবাক হয়েছিলাম। স্কুলের বন্ধুর আর কোনোদিন খোঁজ না পেলেও ছাপাখানার মালিকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। আর এই প্রেসের মালিক ছিলেন অঞ্জন চৌধুরী। তাঁর মাথায় নানা 'আইডিয়া' খেলতো। ততদিনে অঞ্জন চৌধুরী আমার কাছে 'অঞ্জনদা' হয়ে উঠেছেন। অঞ্জনদা ঠিক করলেন

ডেলি প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে একটা পত্রিকা বের করবেন 'যাত্রী' নামে। ২বি বাসের মধ্যে উদ্বোধন হয় 'যাত্রী'-র। প্রথম সংখ্যায় ছড়া লেখেন অমিতাভ চৌধুরী। পত্রিকার নানা প্রতিবেদনে ছিল নিত্যযাত্রীদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা। এরপর ঠিক করা হল পুজো সংখ্যা বের করা হবে। তার জন্য জোরদার প্রস্তুতি চলছে। আচমকা একদিন রাতে অঞ্জনদা আমাকে ফোন করে বলেন, পরেরদিন তাঁর জন্য একটা ঘর ভাড়া করতে হবে। স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে আসবেন। একদিনের নোটিশে অনেক চেষ্টায় বেহালার পাইকপাড়ায় তাঁর জন্য এক কামরার একটা ঘর ভাড়া নিলাম। অঞ্জনদার তখন আর্থিক হাল খুব খারাপ। একদিন লেলিন সরণীতে তাঁর প্রেসে গিয়ে দেখলাম তালা দেওয়া। তাঁর মেজভাই ঘরে তালা দিয়েছেন। অঞ্জনদা বাইরে বসে বলেন, কী করে বাইরে বসে ব্যবসা করা যায় ভাবছি। কারণ ঘর খোলা থাকলে খরচ বাড়ে আর ঘর বন্ধ থাকলে খরচ কমে! সংকট মুহূর্তেও তাঁর রসিকতা দেখে অবাক হয়েছিলাম। ওই সময়ে একদিন সাহিত্যিক বিমল মিত্রকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান অঞ্জনদা। তাঁর সামনে অঞ্জনদা বলেন, এই ছেলেটার জন্য খেয়ে-পরে বেঁচে আছি। তাঁর কথায় খুব লজ্জায় পড়ে যাই। সেদিন সাহিত্যিক বিমল মিত্র বলেছিলেন, এখন খাওয়াচ্ছ, পরে এই লোকটাই তোমাদের খাওয়াবে।

চুমকির আত্মপ্রকাশ

এরপর অঞ্জনদা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বেহালায় রায় বাহাদুর রোডে নিজে একটা ছাপাখানা করেন। আর সেখান থেকে বেরোয় 'চুমকি' (চুমকি তাঁর বড়ো মেয়ের নাম)। এটা ছিল সাহিত্য-সিনেমার বিনোদন পত্রিকা। একবার 'চুমকি' নিয়ে ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োয় অনুপ কুমারের শ্যুটিংয়ে যাই। ওই সময় তাঁর 'রাগ-অনুরাগ' ছবির শ্যুটিং চলছিল। আমাদের পত্রিকার ৪৯ নং পাতা দেখে অনুপদা খুব রেগে যান। সেখানে অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখার শিরোনাম ছিল 'এদের এ ঘুম ভাঙবে কবে'। লেখার শিরোনাম করেছিলেন অঞ্জনদা নিজে। শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে অনুপদাকে শান্ত করি। আসল ঘটনা হল, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় সাক্ষাৎকারের জন্য সময় দেন, সেদিন গেলে তাঁর বাড়ি থেকে বলা হয় তিনি ঘুমোচ্ছেন।

একদিন ভানুদার (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে 'চুমকি' নিয়ে যাওয়ার পর তিনি উলটে পালটে দেখে বলেন, এসব নায়িকাদের খাওয়া-শোওয়ার খবর তোদের পত্রিকায় কে পড়বে? বরং তোরা গালাগালি দিয়ে খবর কর। দেখবি সবাই পড়বে। এরপর সেই পথ ধরে 'চুমকি' এগোয়। রাম সরকারের টাকায় উৎপল দত্ত 'ঝড়' পরিচালনা করেন। এই সম্পর্কে পত্রিকায় লেখা হয় 'আসন্ন ঝড়ে রাজ্য সরকারের ক্ষতির আশঙ্কা'। একবার এনটিওয়ান স্টুডিওতে উত্তমকুমারকে দেখে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে 'চুমকি' তুলে দিই। উত্তমকুমার উলটেপালটে দেখে বলেন, যাক আমার বিরুদ্ধে কিছু নেই। এরপর বলেন, তোমরা পুলু'র (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) পেছনে কেন লাগলে? কী দরকার? ও যদি কেস করে? ওই সময় উত্তমকুমার 'আনন্দমেলা' ছবির শ্যুটিং করছিলেন।

আর এই পত্রিকার সূত্রে অঞ্জনদার সঙ্গে অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের পরিচয় হয় ও ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। 'চুমকি' পড়ে রঞ্জিত মল্লিক অঞ্জনদাকে বলেন, আপনার লেখার হাত এত ভালো, সিনেমার জন্য কেন চিত্রনাট্য লিখছেন না! রঞ্জিত মল্লিকের নানা সিনেমার শ্যুটিংয়ে অঞ্জনদা যেতেন ও কাজ দেখতেন।

চিত্রনাট্যকার থেকে চিত্রপরিচালক

অঞ্জনদা দীনেন গুপ্তর 'শঠে শঠ্যাং' ছবির চিত্রনাট্য লেখেন। যেখানে রঞ্জিত মল্লিক ডাবল রোলে ছিলেন। এরপর 'বোধন', 'বউমা', 'লালগোলাপ' ছবির চিত্রনাট্য লেখেন। এরমধ্যে 'লালগোলাপ' সুপারহিট হয়। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় অঞ্জনদার লেখা 'হব ইতিহাস' নিয়ে ছবি করার পরিকল্পনা করেন, এই ছবিতে উত্তমকুমারের অভিনয় করার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালে উত্তম কুমারের মৃত্যুর পর শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় সেই পরিকল্পনা বাতিল করেন। এরপর রবীন আগরওয়াল এই কাহিনি নিয়ে ছবি করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু অঞ্জনদার অন্যতম শর্ত ছিল। ছবির নায়ক করতে হবে রঞ্জিত মল্লিককে। কিন্তু প্রযোজক রাজি হন না। কারণ রঞ্জিত মল্লিকের তখন 'বাজার' ছিল না। অঞ্জনদা 'হব ইতিহাস'য়ের কাহিনি নিয়ে 'শত্রু' সিনেমাটি করেন। ছবি মুক্তি পায় ১৯৮৪ সালে ৭ ডিসেম্বর। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন রঞ্জিত মল্লিক। এই 'শত্রু' ছিল বাংলা সিনেমার এক মাইলস্টোন। সেই থেকে রঞ্জিত মল্লিকের লুক বদলে যায়, মুখে গোঁফ ব্যবহার হয়, তাঁর ইমেজ হয় প্রতিবাদী।

দারুণ বুঝতেন দর্শকদের পালস

অঞ্জনদার চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখার যেমন অসাধারণ

ক্ষমতা ছিল, তেমনি ছিল বাংলা সিনেমার দর্শকদের পালস বোঝার ক্ষমতা। অঞ্জনদা সবসময় যেকোনো ছবির মুক্তির দিন প্রথম শোয়ে সিনেমা দেখতে যেতেন। তাঁর সঙ্গী থাকতাম আমি। তাঁর সঙ্গে জিতের 'সাথী' ছবি দেখতে গেছি, হল থেকে বেরোনোর পর আমার কাছে জানতে চাইলেন, কেমন দেখলি ? বলেছিলাম, এই ছবি চলবে না। তার উত্তরে অঞ্জনদা বলেন, কিছুই বুঝিসনি। হল থেকে বেরিয়ে ফোন করে ছবির প্রযোজক শ্রীকান্ত মেহেতাকে বলেন, এই ছবি হিট করবে। ঠিক তাই হল। 'সাথী' সুপারহিট হয়। আবার 'চ্যাম্পিয়ন' ছবি দেখার পর অঞ্জনদা আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়ায় বলেছিলাম, ছবি হিট করবে। জবাবে অঞ্জনদা বলেন, সুপার ডাব্বা। সেবারও হল থেকে বেরিয়ে প্রযোজকদের হতাশ করে ফোনে বলেছিলেন, এই ছবি চলবে না। ঠিক তাই ! চ্যাম্পিয়ন ফ্লপ করে। অঞ্জনদা চিত্রনাট্য লিখতেন ডায়মন্ড হারবারের সাগরিকা হোটেলের ৭ নং ঘরে ও পরে লিখতেন কলকাতার পিয়ারলেস ইন-এ। একবার এক প্রযোজক তাঁকে দক্ষিণ ভারতীয় ছবির ভিডিয়ো ক্যাসেট দিয়ে সেই আদলে একটা ছবির চিত্রনাট্য লেখার অনুরোধ করেন, যেখানে জিৎকে নায়ক করার কথা ভাবা হয়। অঞ্জনদা ভিডিয়ো দেখে চিত্রনাট্য লিখতে রাজি হননি, তার সঙ্গে বলেন, এই ছবির নায়ক হলে জিতের কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে। একবার তপন ভট্টাচার্য (কুমার শানুর দাদা) অঞ্জনদাকে একটা ছবির চিত্রনাট্য লিখতে বলেন। যার নায়ক করার কথা ভাবা হয় কুমার শানুকে। ১০ হাজার টাকা অগ্রিমও দেওয়া হয় কিন্তু অঞ্জনদা রাজি হননি, ওই টাকাও ফেরত দেন। অঞ্জনদা 'দেবতা'র চিত্রনাট্য লেখেন ৩ দিনে। শুধুমাত্র বড়োপর্দায় নয়, ছোটোপর্দাতেও তিনি দুর্দান্ত সফল হন। তাঁর জন্য এটিএন বাংলা জনপ্রিয় হয়। দর্শকদের পালস মতো ভালো মানুষও চিনতে পারতেন। একসময় সোহমের বাবা এসেছিলেন তাঁর শ্যালিকাকে (সোহমের মাসি) অভিনয়ে সুযোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু অঞ্জনদা সোহমকে বেছে নেন শিশু শিল্পী হিসাবে। পরে সোহম টলিউডের স্টার হন।

অঞ্জনদার ছবির বিশেষত্ব

অঞ্জনদা যখন খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার মধ্যগগণে তখন ব্যক্তিগত মান-অভিমানে আমাদের দু'জনের মধ্যে সাময়িক দূরত্ব তৈরি হয়েছিল কিন্তু শেষে অঞ্জনদাই ফের আমাকে কাছে টেনে নেন। তাঁর চলে যাওয়ার শেষদিন পর্যন্ত সহকারী ছিলাম। চিত্রনাট্য লেখার পর প্রথম আমাকে পড়তে দিতেন। মতামত নিতেন। তিনি আমাকে চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি তাঁর সঙ্গে থাকতে বলেন। কিন্তু আমি কখনো সরকারি চাকরি ছেড়ে সিনেমার জগতকে পেশা করার আগ্রহ দেখায়নি। কারণ বাবার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। আমার বাবা ছিলেন মোহিনী চৌধুরী। বিখ্যাত গীতিকার। তাঁর লেখা 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে'। এছাড়াও বাংলা সিনেমায় তাঁর লেখা অনেক কালজয়ী গান রয়েছে। তাঁর ছবির অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সবসময়ে কাহিনিকে প্রাধান্য দিতেন। থাকত বাঙালিয়ানার ছাপ। পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে সিনেমা দেখতে পারতেন। তিনি বলতেন, সিনেমা করে প্রযোজকদের টাকা ফেরত না দিলে কেন তাঁরা ছবিতে লগ্নি করবে। তাই, প্রযোজকরা তাঁর পেছনে লাইন দিয়ে থাকতেন। এখন বাংলা সিনেমার চরম দুঃসময়। বাংলা ছবিকে বাঁচাতে অঞ্জনদার ঘরানার ছবি করা দরকার।

Name : Tradeco Ranchi

C/o : Prakash Agrawal

Well Wisher

শুধু থিয়েটারের জন্য বেঁচে থাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ থিয়েটার ভালোবেসে থিয়েটারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন নটী বিনোদিনী। বাংলা রঙ্গমঞ্চ চিরদিন তাকে মনে রাখবে। সময় বদলে গেলেও একালেও বিনোদিনীরা রয়েছেন। যারা লেখাপড়ায় কৃতী হয়েও উজ্জ্বল কেরিয়ার ছেড়ে শুধুমাত্র ভালোবেসে অনিশ্চিত জেনেও থিয়েটার কে আকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। তেমনি ৪ মঞ্চ কন্যার কথা তুলে ধরা হল:

*** মঞ্চে নিজেকে খুঁজে বেড়ায় সৃজিতা ***

সৃজিতা বান্টি ভদ্র থিয়েটার ভালোবেসে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে থিয়েটার নিয়ে পড়াশোনা করতে আসেন। পড়তে পড়তে কলকাতার মঞ্চে প্রথম অভিনয় ষড়ভূজ-র প্রযোজনায় 'ডাকঘর' নাটকে। । ২০১৬ সালে মাস্টার ডিগ্রি পাশ করে বাড়ির বাধা ও লোভনীয় চাকরির হাতছানি ছেড়ে অভিনয় কে পেশা হিসাবে বেছে নেওয়ার কথা ভাবেন সৃজিতা বান্টি ভদ্র। ১ যুগ ধরে মঞ্চ ও পর্দায় সমানভাবে কাজ করে চলেছেন। যদিও মঞ্চ তাঁর প্রথম প্রেম। সৃজিতার কথায়, নাটকে অভিনয় করব বলে সিরিয়ালের অনেক কাজ ছাড়তে হয়েছে। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে- দেবীগর্জন, সিঠু কানু ডাকে, দ্য টাইম, মরমিয়া মন, শাস্তিকার, প্রেমকুঞ্জ, মিসফিট, নটীর পুজো, লবাণ উৎসব, শিখন্ডি প্রভৃতি। পরিচালনায় হাতেখড়ি 'দেবীগর্জন' নাটকে। পেশাদার অভিনেত্রী হিসাবে বিভিন্ন দলে কাজ করলেও তাঁর নিজের ও প্রাণের দল 'নাট্যিক কোলকাতা'। আজীবন নাটক নিয়ে থাকার অঙ্গীকারে ওই দলের কর্ণধার-অভিনেতা তথা নির্দেশক প্রতাপ

কুমার মন্ডল কে এ বছর বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী। নিয়মিত অভিনেত্রীর পাশাপাশি দলের তিনি দলের সহ-সম্পাদক ও। সৃজিতা জানান, 'থিয়েটারের জীবন অনিশ্চিত জেনেই থিয়েটার করতে এসেছি। এখন আর আপেক্ষের কিছু নেই। যতদিন বাঁচব থিয়েটার কে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই। কারণ থিয়েটার আমার কাছে শুধু পেশা নয় প্যাশন। মঞ্চের প্রতিটা চরিত্রে মধ্যে নিজেকে খুঁজে বেড়াই ও আগামীদিনে দর্শকদের নতুন কিছু দেওয়ার অপেক্ষায় থাকি'।

*** দর্শকদের প্রতিক্রিয়া শোনার অপেক্ষায় থাকে পারোমিতা***

পারোমিতা ঘোষের নাটকের সঙ্গে সখ্যতা স্কুলে পড়ার সময়

থেকে। মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ থেকে ডিগ্রি কোর্স পাশ করার পর 'ক্যাট' এ স্কোর করেও শুধুমাত্র নাটকের জন্য আর ম্যানেজমেন্টের পেশায় যাওয়া হয়নি। পারোমিতা এখন সবুজ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পুরো সময়ের নাট্যকর্মী। অভিনয়ের পাশাপাশি দলের মেক-আপ শিল্পী। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক- রবিঠাকুরের ২ নারী চরিত্র, লেডি ম্যাকবেথ, ওয়েটিং ফর ইউ, আজাদী, গালি দিবেন নি কাকা, আন্তিগোনে, রাজাওয়াদিপাস, লুপ প্রভৃতি। তাঁর পছন্দ ধূসর চরিত্র। পারোমিতার কথায়,' মানুষ পুরোপুরি সাদা নয় আবার কালো নয়। মাঝামাঝি গ্রেবা ধূসর। আমার পছন্দ এই ধরনের চরিত্র। আমি নিজেও ধূসর।' অভিনেত্রী জানান,' প্রতিটা শোয়ের শেষে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া শোনার অপেক্ষায় থাকি। ভালো বা মন্দ দুটোকে সমানভাবে নিয়ে থাকি। তখন মনে হয় অন্য কোনো পেশায় গেলে এভাবে মানুষকে কাছে পেতাম না'।

*** বাচ্চাদের নিয়ে নাটকের স্বপ্ন দেখেন অন্তরা ***

টানা ৭ বছর ধরে থিয়েটার করে চলেছেন বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মেয়ে অন্তরা মুখার্জি। ইতিহাসের ছাত্রী কিন্তু ধরাবাঁধা চাকরি করতে মন বসেনি। স্নাতক হওয়ার পর অর্নব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'দেবীপক্ষ' এ অভিনয় করে রঙ্গমঞ্চ কে জীবনের ধ্রুবতারা করার কথা ভাবেন অন্তরা। নাটকের জন্য নিজের জেলা ছেড়ে কলকাতায় থাকেন। অভিনয় করেছেন দেবীগর্জন, পটের বিবি, খিদে, অথ হিড়াম্ভা কথা, ফেরার, ছিতেছু (হিন্দি), মহুয়া সুন্দরী পালা প্রভৃতি নাটকে।

অন্তরা মুখার্জি জানান, থিয়েটার আমার কাছে বেঁচে থাকার প্রেরণা। এক মুহূর্ত থিয়েটার ছাড়া বাঁচতে পারব না। আর জেনেশুনে 'বিষ নয়' থিয়েটারের মধু পান করেছি। তাই থিয়েটারে থাকতে চাই। আমার স্বপ্ন গ্রামের বাচ্চাদের নিয়ে নাটকের দল গড়া ও তাদের নিয়ে নাটক করা।

থিয়েটারে জীবনের দিশা খুঁজে পান সঙ্গীতা*

কমার্শিয়াল আর্ট-র ছাত্রী সঙ্গীতা মজুমদার। এক বন্ধুর মাধ্যমে সবুজ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নির্দেশকের সঙ্গে পরিচয় ও নাটকে সুযোগ পাওয়া। টানা ৫ বছর ধরে এই দলে নাটক করে চলেছেন। অন্য দলে কাজ করেন না। দলের প্রযোজনায় গালি দিবেননি কাকা, মিরর, অ্যান্তিগোনে, অয়াদিপাস, দ্য লাইট প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন। এখন ব্যস্ত পুজোর সময়ে কলকাতার ৩ বড়ো মণ্ডপে দলের লাইভ পারফরম্যান্সের মহড়া নিয়ে। সঙ্গীতার পছন্দ থ্রিলিং চরিত্র। দুঃসাহসিক চরিত্রেও অভিনয় করতে ভয় পান না। নিজেকে ভার্সেটাইল অভিনেত্রী হিসাবে গড়ে তুলতে চান। সঙ্গীতা জানান, থিয়েটার ও মডেলিং ২টো পেশায় অনেক পুরুষ মেয়েদের কাছ থেকে সুযোগ নিতে চায়। সেক্ষেত্রে খুব বুদ্ধির করে চলতে হয়।

মঞ্চের পাশাপাশি সঙ্গীতা মডেলিং ও করেন। শিল্পের সব মাধ্যমে কাজ করতে চাইলেও তাঁর প্রথম পছন্দ থিয়েটার। কারণ এখানে হয় লাইফ পারফরম্যান্স। সরাসরি দর্শকদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। থিয়েটারের অনিশ্চিত রোজগার নিয়ে সঙ্গীতার সাফকথা- কোনো পেশাকে একশো ভাগ দিতে পারলে তার থেকে তেমনি রির্টান পাওয়া যায়।

শারদীয়া শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনসহ

দক্ষিণ কলকাতা কলাকুশলী

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত নাট্য সংস্থা)

৩৮, রাইফেল ক্লাব, কলকাতা- ৭০০০৭০

নাট্য প্রযোজনা

স্বল্প দৈর্ঘের নাটক : সুন্দর (মোহিত চট্টোপাধ্যায়), রক্তের টান (সুমনা দাস)

পূর্ণাঙ্গ নাটক : উড়োপাখী (গৌতম রায়), দৃষ্টিদান (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দিন বদল (গৌতম রায়), নতিস্বীকার (সুদর্শন দাস)

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পথনাটক : উন্নত শির ও মোক্ষলাভ (সুদর্শন দাস)

যোগাযোগ

দূরভাষ : 98302 31630 | 90079 99169 ইমেল : dakshinkolkatakalakushali19@gmail.com

খেলা—

নতুন প্রজন্মের কাছে অনলাইন গেমিংয়ের গুরুত্ব

সৃঞ্জয় ঠাকুর

অনলাইন গেমিং আজকের যুগে তরুণ প্রজন্মের কাছে এক জনপ্রিয় বিনোদনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তবে বিনোদনের বাইরে, এর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং কার্যকলাপ রয়েছে যা এই প্রজন্মের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে। যে কোনো গেম বা খেলা যদি নিজের সময়, সামর্থ্য ও পরিস্থিতি বিচার করে ব্যবহার করা যায় তবে সেই খেলায় ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি হতে পারে।

অনলাইন গেমিংয়ের গুরুত্ব যেখানে : মানসিক দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বাড়ে : অনলাইন গেমিং নব প্রজন্মের মধ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান ও কৌশলগত চিন্তাভাবনা উন্নত করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন ধরনের গেম, যেমন ধাঁধা, অ্যাডভেঞ্চার ও স্ট্র্যাটেজি গেম এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও উন্নত করে।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং দলগত কাজের দক্ষতা : অনলাইন মাল্টিপ্লেয়ার গেমগুলো সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং দলগত কাজের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। এসব গেমে দলগতভাবে কাজ করে জয় হাসিল করতে হয়, যা তাদের মধ্যে সহযোগিতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলী গড়ে তোলে।

প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি : অনলাইন গেমিং প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাড়াতেও সাহায্য করে। বিভিন্ন গেমের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং সফটওয়্যার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারে, যা তাদের ভবিষ্যতের কেরিয়ারেও সহায়ক হতে পারে।

মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক : অনলাইন গেমিং মানসিক চাপ কমানোরও একটি মাধ্যম হতে পারে। এটি তাদের মনকে চাপমুক্ত করে এবং বিনোদনের মাধ্যমে ভালো অনুভূতি এনে দেয়, যা দৈনন্দিন জীবনের চাপ থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে।

সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তি বাড়ে : বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ এবং ফ্যান্টাসি গেম সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তি বাড়াতে সহায়ক। এসব গেমে তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নতুন নতুন চরিত্র, জগৎ এবং কাহিনি তৈরি করে, যা তাদের সৃজনশীল দিককে আরও সমৃদ্ধ করে।

ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ : বর্তমান সময়ে অনলাইন গেমিং শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি একটি

ক্যারিয়ার গঠনের মাধ্যমও হতে পারে। গেম ডেভেলপমেন্ট, গেম স্ট্রিমিং এবং ই-স্পোর্টসে কেরিয়ার তৈরি করছে, যা সম্ভাবনাময় পেশা হতে পারে।

দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং রিফ্লেক্স উন্নয়ন : অনলাইন গেমিং ছেলেমেয়েদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং তাদের রিফ্লেক্স উন্নত করতে সাহায্য করে। ফাস্ট-পেসড গেমগুলি তাদের চোখ-হাতের সমন্বয় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায়।

সতর্কতা : অনলাইন গেমিংয়ের অনেক ইতিবাচক দিক যেমন রয়েছে নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা, আসক্তি এবং শারীরিক স্বাস্থ্যগত সমস্যার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাই অনলাইন গেমিংয়ের ক্ষেত্রে সময়ের সীমা নির্ধারণ আর ভারসাম্য রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

সব মিলিয়ে অনলাইন গেমিং নতুন প্রজন্মের কাছে উপকারী মাধ্যম হতে পারে যদি এটি সঠিকভাবে এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

নতুন প্রজন্মের জন্য অনলাইন গেমিংয়ের অসুবিধা

অনলাইন গেমিং এই প্রজন্মের কাছে কিছু ক্ষেত্রে উপকারী হলেও এর বেশ কিছু অসুবিধাও রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অনলাইন গেম যত বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি নেশার মতো বিষক্রিয়া তৈরি করছে সুতরাং এই খেলার নিয়ন্ত্রণ কম বয়সীদের পক্ষে প্রয়োগ করা সার্বিকভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং এই খেলা অভিভাবকরা প্রত্যক্ষবা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে যুব সমাজের অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

অনলাইন গেমিংয়ের কিছু প্রধান অসুবিধা ও তার সম্ভাব্য প্রভাব (শতকরা হারে) :

আসক্তির সম্ভাবনা (৪০%-৬০%) : অনলাইন গেমিং এই প্রজন্মের মধ্যে তীব্র আসক্তি তৈরি করতে পারে। গেমের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক অনেক সময় ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, পড়াশোনা এবং সামাজিক জীবনের প্রতি উদাসীন করে তোলে।

স্বাস্থ্যগত সমস্যা (৩০%-৫০%) : দীর্ঘ সময় ধরে অনলাইন গেমিংয়ের ফলে শারীরিক সমস্যা, যেমন চোখের সমস্যা, পিঠে ব্যথা, ওজন বেড়ে যাওয়া আর ঘুমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া, শারীরিক সক্রিয়তা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি (২০%-৪০%) : অনলাইন গেমিংয়ের আসক্তি ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতার কারণ হতে পারে। বিশেষ করে, প্রতিযোগিতামূলক গেমিংয়ে পরাজয়ের কারণে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা (২৫%-৪৫%) : অনলাইন গেমিং এই প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ কমিয়ে দিতে পারে। তারা বাস্তব জীবনে বন্ধু পরিবারের সঙ্গে কম সময় কাটায়, যা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

শিক্ষা ও কাজের প্রতি উদাসীনতা (৩৫%-৫৫%) : অনলাইন গেমিংয়ের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার কারণে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা এবং কাজের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ার প্রবণতাও দেখা যায়। তাদের অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্স খারাপ হতে থাকে, কর্মজীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে সরে যেতে পারে।

অর্থ ব্যয় ও আর্থিক সমস্যা (১৫%-৩০%) : অনলাইন গেমিং বিশেষ করে ইন-গেম কেনাকাটা অনর্থক ব্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এই ধরনের কাজে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

নেতিবাচক আচরণ (১০%-২০%) : অনেক অনলাইন গেমে সহিংসতা এবং নেতিবাচক আচরণ প্রদর্শিত হয়, যা তরুণ সমাজে তাদের মানসিকতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই আচরণগুলোলি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে, যা সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ডেকে আনতে পারে।তাই, অনলাইন গেমিংয়ের সময় এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

With Best Compliments from....

Debjani Rakshit

MUKHERJEE ASSOCIATES
PROFESSIONAL TECHNICAL
9836625765, 9339101709

SERVICES – GST & INCOME TAX, AUDIT & RETURN, SOCIETY, ROC, TDS, 12A, 80G, PROFESSIONAL TAX RETURN, ACCOUNTS, PARTNERSHIP AND APPEAL ETC.

REGISTRATION – GST, ROC, MSME, SOCIETY, TRADE LICENSE (MUNICIPAL & PANCHAYET), FOOD LICENSE, DRUG LICENSE, IMPORT-EXPORT & ALL OTHER LICENSE

অর্জুন সীডস্

প্রোঃ গৌরব ব্যানার্জী

এখানে সমস্ত প্রকার দেশি ও বিদেশি কোম্পানীর বীজ, সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

এছাড়া মালচিং পেপার, কোকোপিট, ট্রে পাওয়া যায়

বীজের দোকান

Up To DISCOUNT 30%

স্থান ঃ- রথবাড়ী মালদা Mob.- 9732744122

SS MARBLE
GRANITE & TILES

Suppliers of Exclusive Quality
Marble -Granite Slabs & Tiles

KRISHNA RAM
7997404020

NARSHA RAM
8329946409

E-mail : ssmarblegranite2022@gmail.com

Moyna, Barasat , Near Kalyani Public School,
Kolkata 125, 24 pgs (N) Krishnanagar Road

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
Trasco®
সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
ORMACOMIN
TRICHOSTAR
BEAUVO ROYAL
HARZINA GOLD
PLANT GUARD
Bio-Bact
NEEMAZIN
Bactisol-D
IMO control
lacon QUALITY
Super Agro India Pvt. Ltd.
An Iso 9001, 14001 & 18001 Certified & IMO Certified Company
168/2, LENIN SARANI, KOLKATA - 700013
PHONE - 033-22127867/22126809
E-mail - superagro@trascoworld.com
Visit us at - www.trascoworld.com

Home Away from Home
STAY AT DIGHA
Mira
Mira International
MIRA INTERNATIONAL
24 Hrs. Silent Genarator Back
Car Parking
A.C. Sea View Confe Roo
With 200 Packs Capa
A.C. Multi Cuisine Restaurant
Forest Banglow Road, P.O.+P.S. Digha (Old Digha), Dist. Purba Midnapore, PIN - 721428
Ph. : (03220) 267027, Mob : 8001211717, E-mail : mirainn.international@gmail.com
Kolkata Booking, Mobile : 8584833128

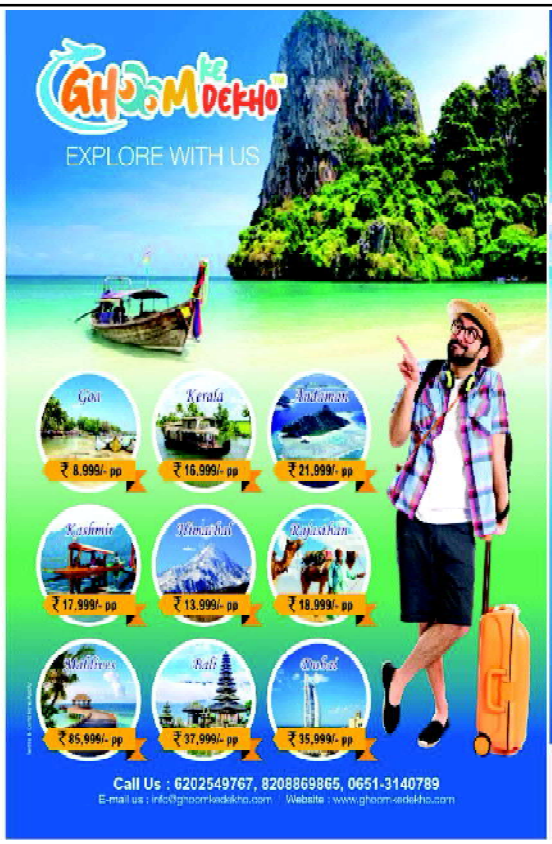
GHOOMKEDEKHO
EXPLORE WITH US
Goa
₹ 8,999/- pp
Kerala
₹ 16,999/- pp
Andaman
₹ 21,999/- pp
Kashmir
₹ 17,999/- pp
Himachal
₹ 13,999/- pp
Rajasthan
₹ 18,999/- pp
Maldives
₹ 85,999/- pp
Bali
₹ 37,999/- pp
Dubai
₹ 35,999/- pp
Call Us : 6202549767, 8208869865, 0651-3140789
E-mail us : info@ghoomkedekho.com | Website : www.ghoom-kedekho.com

GHOOMKEDEKHO
EXPLORE • EXPERIENCE • INSPIRE
FLIGHTS
HOTELS
HOLIDAYS
TAXI
CRUISE
VISA
BOOK NOW
GHOOMKDEKHO TRIPS PLANNER PVT. LTD.
Kolkata | Goa | Ranchi | Mumbai
Call Us : 6202549767, 8208869865, 0651-3140789
E-mail us : info@ghoomkedekho.com | Website : www.ghoomkedekho.com
GeM
TOA
ATOAI
ALLIED

NEW TOWN KOLKATA
শারদীয় শুভেচ্ছা
ENROLL TODAY 080 6274 1414
GOLD'S GYM, UG, THE TERMINUS, BG 12, (PRIDE PLAZA HOTEL),
ACTION AREA 1, NEW TOWN, KOLKATA, WEST BENGAL 700156

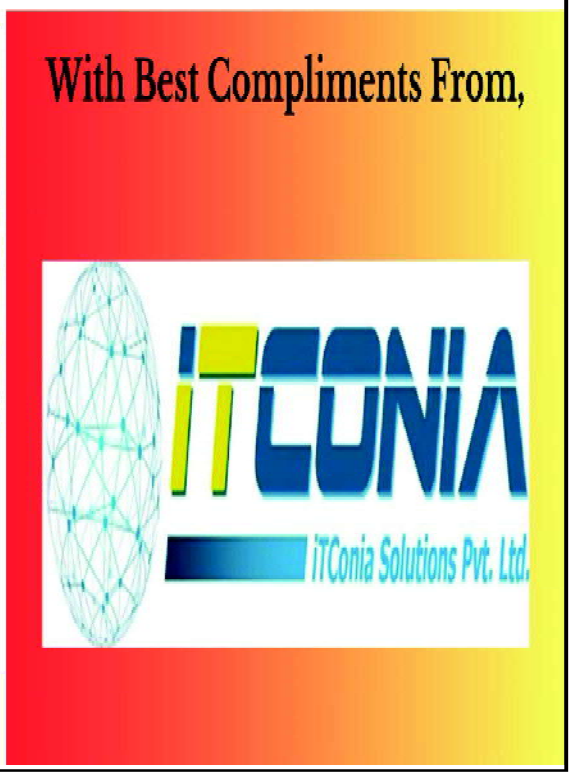
With Best Compliments From,
ITCONIA
ITConia Solutions Pvt. Ltd.

Advertisement Note

With Best Compliments From
M/S Ramdo Mishra
Labour Contractor, Civil Contractor
& Trasporter
Po- Marar, Dist - Ramghar
(Jharkhand)
Mob - 9934417995

With Best Compliments From,

Standard Group

With Best Compliments From,

SILIGURI COMMODITIES PRIVATE LIMITED
&
Tirupati Food Products.

MATIX
FERTILISERS
Driven by Growth
Defined by Excellence
Fulfilling responsibilities for a better tomorrow
through impactful societal projects
Shakti
(400 women)
Empowering women through skill based training for additional household income
Saksham
(165 women)
Offering livelihood to women by imparting knowledge on animal husbandry activities
Dhadkan
(26,000 lives touched)
Setting of community health clinics offering free medical treatment to the less fortunate
To know more,
visit www.matixgroup.com
Registered Office
Panagargh Industrial Park,
Panagarh, West Bengal 713148
Corporate Office
5th Floor, Poonam Chambers,
Worli, Mumbai 400018

INSTITUTE OF SKILLS

Under Management Control of Manasi Research Foundation

JOIN NOW

Our Courses:

Vocational Training: A

- Smart Accountant
- Hospitality Management
- E- Commerce , KPO -LPO- BPO
- Supply Chain Management

Skill Taraining: B

- Entrepreneurship Development
- SAP Use

Through the Experts & Experience Teachers

Faculties:

- CMA Bidyut Chakraborty. MCom, MBA(Finance &Risk Management FCMA
- Mr.Debojoty Ghosh. MCom, MBA Finance
- CMA Shrinjoy Thakur. MCom, ACMA
- CMA RUP Biswas

Mentor:

- CMA Manas Kr Thakur. FCMA, ICPA(Switzerland)
- Chairman Institute of Skills
- Former President of The Institute of Cost Accountants of India

Contact Us:

22/4 Verner Lane, Belgharia, Kolkata - 56
7980272019/9804360309

Website - https://manasiresearch.org